BIPLAB BIDRAHA BHALOBASA

by Maxim Gorky

Translated into Bengali by Asit Sarkar

[] প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৮

[] প্রকাশিকা : লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

[] মুদ্রণ : অসীমকুমার সাহা দি প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী (ব্লক কে-১)
কলকাতা-৭০০০০৬

[] প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত। ৪, পীতাম্বর সরকার লেন, কলকাতা-৭০০০২৩

আকৈশোর রাশিয়ার বিস্তীর্ণ পথে-প্রান্তরে যিনি মুসাফিরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, বহুবিচিত্র সেইসব অভিজ্ঞতা, দুচোখ মেলে দেখা নানা ধরনের মুখ আর অজস্র চরিত্র বারবার আনাগোনা করেছে যাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোট গল্পে, যা আজও সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের এক দুলর্ভ সম্পদ, তাঁর সম্পর্কে আজ নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই ম্যাক্সিম গর্কির জীবন বা সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু কেন এই সংকলন আর সংকলিত কাহিনীগুলির খুবই সংক্ষিপ্ত একটা পটভূমি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই, যাতে তৎকালীন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় কাহিনীগুলোর মূল্যোন্নয়ন কিছুটা সুগম হয়ে ওঠে।

বহুকালের স্বপ্ন ছিলো বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ম্যাক্সিম গর্কির অজস্র ছোট আর দীর্ঘ কাহিনীগুলো থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি খণ্ডে সুন্দর একটি সংকলন বাংলায় প্রকাশ করার। ১৯৭৪ সালে অবশ্য 'গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প' নামে বিভিন্ন পর্যায় থেকে নেওয়া তেত্রিশটা গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো। ওই সময়েই দীর্ঘ সাতটি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম, একক গ্রন্থাকারে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় যার দুটিকে বাদ দিয়ে এই বর্তমান সংকলন, বিপ্লব বিদ্রোহ ভালোবাসা।

প্রকৃত নাম আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ হলেও আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে ম্যাক্সিম গর্কি নামে যিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তাঁর জন্ম ১৮৬৮ সালে নিঝনি নভগোরদের এক শ্রমিক পরিবারে। সাত বছর বয়েসে বাবা-মাকে হারান। এর দু বছর বাদে নিজের রুটির সংস্থানের জন্যে একটানা তিন বছর তাঁকে জুতো তৈরির একটা দোকানে কাজ করতে হয়। পরে সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে এই জুতো তৈরির দোকানে থাকাকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি আশ্চর্য নিপুণতায় রূপ দিয়েছেন 'আলো-ছায়া' গল্পটিতে।

১৮৮৪ সালে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চলে আসেন কাজানে। এখানকার [illegible] নিচের একটা চোরা-কুঠরিতে সেমিয়নভের রুটি তৈরির কারখানায় শুরু করেন [illegible] 'বহুরূপী' গল্পটিতে।

[illegible] এসে

[illegible] 'অকাল-বসন্ত'।

১৯০১ সালে গর্কি যখন সেণ্ট পিটার্সবার্গে, সারা শহর জুড়ে ঘনিয়ে ওঠে বিপ্লবের ঘন কালো মেঘ, যার একটুকরো সহসাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর 'হঠাৎ-কুয়াশা'-য়।

বিপ্লবের স্বপক্ষে সোচ্চার শিল্পীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে দাবী ওঠে তাঁর মুক্তির। জার সরকার গর্কিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেও নির্বাসনে পাঠান। ক্ষুব্ধ

লেনিন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে এভাবে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯০৫ সালের বিক্ষুব্ধ রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-শ্রেণী তখনও সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। এমনই এক অসতর্ক মুহূর্তে সেন্ট পিটারসবার্গে বিরাট একটি শ্রমিক-মিছিলের ওপর পুলিস বর্বর আক্রমন চালায়। গর্কি একে 'উন্মুক্ত রাজপথে সুপরিকল্পিত নরহত্যা' আখ্যা দেন। ফলে ১১ই জুনে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এবার সারা ইউরোপ জুড়ে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ঢেউ। এবারেও জার সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

গর্কি মস্কোয় ফিরে এসে বিপ্লবের কাজে মন দেন। আবার গ্রেফতারি পরোয়ান বের হয় তাঁর নামে। ১৯০৬ সালে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি ইতালিতে পালিয়ে যান। এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আত্মসমালোচনামূলক কাহিনী 'কারামোরা' তাঁর এক অনন্য সৃষ্টি।

এই পাঁচটি দীর্ঘ কাহিনী ছাড়া অন্যান্য বড় গল্পগুলোকে নেবার ইচ্ছে আছে অন্য একটি সংকলনে। আর অনুবাদ প্রসঙ্গে যে কটা কথা বিশেষ ভাবে বলা দরকার—গর্কি এমনই এক মহান শিল্পী, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ভাবনাকে চলতি ভাষায় রূপ দেবার জন্যে সারা জীবন যিনি মননের গহন তুলিতে কেবল একটাই মাত্র রঙ ব্যবহার করেছেন—কলজের টকটকে লাল তাজা রক্ত, যার প্রকৃত অনুরণন শুধু বাংলায় কেন, অন্য আর যেকোনো ভাষাতেই প্রায় অসম্ভব। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাঁর শিল্প-মানসকে এই সংকলনে ধরে রাখতে। কতটা ব্যর্থ হয়েছি সে বিচারের ভার রইলো পাঠক আর বিদগ্ধজনের ওপর।

অসিত সরকার

কারামোরা

আমার বাবা ছিলেন তালাওয়ালা। লম্বা-চওড়া পেল্লাই চেহারার মানুষ। যেমন হাসিখুশি তেমনি মায়ামমতা। সবকিছুই অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখতেন, সবার দিকে তাকিয়েই মুচকি মুচকি হাসতেন। আমাকে ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশি, আদর করে ডাকতেন কারামোরা বলে। প্রত্যেকের অদ্ভুত অদ্ভুত সব নামকরণ করাটা ছিলো তাঁর প্রধান কৌতুক। সাধারণত মাকড়শার মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং এক ধরনের মশাকেই বলা হয় কারামোরা। ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুব লম্বা আর রোগা লিকপিকে, ছোটদের সঙ্গে মারামারি করতে ভালো-বাসতাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় শখ ছিলো ফাঁদ পেতে পাখি ধরা।

আজ আমাকে কয়েক রিম কাগজ দেওয়া হয়েছে সেইসব ঘটনা লেখার জন্যে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? যেভাবে হোক ওরা যে আমাকে খুন করবেই।

আকাশ ঝমরে বৃষ্টি পড়ছে। যেন অঝর বৃষ্টিধারাগুলো কাঁপতে কাঁপতে মাঠ পেরিয়ে চলেছে শহরের দিকে। বৃষ্টির ভিজে ভারি যবনিকা ভেদ করে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। জানলার ওপারে অশান্ত বর্ষণ আর মেঘগর্জনে যেন সবকিছু কেঁপে উঠছে, অথচ কারাগারের এপারটা নিস্তব্ধ, নিঝুম। আর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হচ্ছে আমি যেন জালে আটকানো কোনো মাছ…

ঝাপসা হয়ে আসছে চারদিক। তাছাড়া লিখবোই বা কি? আমার বুকের মধ্যে বাস করে যে-দুটো মানুষ, তারা যে পরস্পরে কেউ কাউকে আঘাত করতে চায় না। সেইটেই সব। হয়তো কথাটা ঠিক নয়। তবু সে যাই-ই হোক না কেন, আমি লিখবো না। আমি তা চাই না। সবচেয়ে বড় কথা কি করে লিখতে হয় আমি তাই-ই জানি না। তাছাড়া আঁধার ঘনিয়ে উঠছে। না, কারামোরা, বরং নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাও, তারপর সবকিছু একটু একটু করে ভাবতে শুরু করো।

তাতে ওরা যদি তোমায় খুন করে তো করুক।

* * *

সারা রাত আমি ঘুমতে পারলাম না। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে। আকাশে কাস্তের মতো সরু বাঁকা চাঁদটাকে দেখে আমার পোপভের লালচে গোঁফজোড়াটার কথা মনে পড়ে গেলো। সারারাত আমি আমার অতীত জীবনটাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলাম। এখন আর কি-ই বা করার আছে? এ যেন সংকীর্ণ কোনো ফাটলের মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখা, যার ওপারের আয়নায় অস্পষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছে আমার জমাট অতীত। আমার প্রথম শিক্ষক, লিওপোল্ডকে মনে পড়ে গেলো। ছোটখাটো ক্ষুধার্ত চেহারার একজন ইহুদি ছাত্র। আমার বয়েস তখন উনিশ, উনি আমার চেয়ে আরও দু-তিন বছরের বড়। ক্ষয় রোগাক্রান্ত, দৃষ্টিশক্তি কম, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। থমথমে নির্বিকার ছোট্ট একটু মুখ,

বাঁকানো একটা নাক আর প্রচণ্ড ভীতু। সব মিশিয়ে ওঁকে আমার কেমন যেন মজাদার একটা চরিত্র বলে মনে হতো।

অথচ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো উনি অদ্ভুত সাহসী আর কি নিপুনভাবেই না প্রবঞ্চণার মুখোশগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতেন, বাইরের সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে উন্মুক্ত করে দিতে পারতেন মানুষের অগণন বিশ্বাসঘাতকতার নগ্ন সত্যকে।

জ্ঞানী বলতে যা বোঝায় উনি ছিলেন তাদেরই একজন। সামাজিক মিথ্যায় কোথাও কোনো অশুভ চিহ্ন দেখলে উনি বলগা-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো দুরন্ত ক্রোধে থরথর করে কেঁপে উঠতেন। আর আমাদের কাছে জীবনের কথা যখন বলতেন, ওঁর ভঙ্গি দেখে মনে হতো যেন সিঁদের চোরটাকে হাতেনাতে ধরতে পারায় খুশি হয়ে বিজয়গর্বে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছেন।

যৌবনে আমি ছিলাম খুব উচ্ছল, ওঁর কথা শুনতে তেমন একটা ভালো বাসতাম না। জীবন সম্পর্কে মোটামুটি খুশিই ছিলাম, তাকে যেমন হিংসে করতাম না, তেমনি অভিযোগও কিছু কম ছিলো না। মোটামুটি একটা সচ্ছলতার মধ্যে সামনের পথটাকে মনে হতো যেন স্বচ্ছ একটা প্রবাহের মতো বহে গেছে। হঠাৎ এই ইহুদি শিক্ষকটা এসেই আমার সেই স্রোতধারাকে ঘুলিয়ে দিলেন। আমার মতো ভালো স্বাস্থ্য একজন রাশিয়ান তরুণের তুলনায় ছোটোখাটো ভঙ্গুর চেহারা এই বিদেশীর নানান নির্দেশ আমাকে বিরক্ত, কিছুটা উত্যক্তও করে তুললো। তা বলে আমি ওঁর বিরোধিতা করতাম না, তাছাড়া এটা স্পষ্ট—লিওপোল্ড যা বলতেন তা সত্যি। তবু ওঁর মুখে মুখে তর্ক করতেও ছাড়তাম না।

'সত্যি দিয়ে আমার কি হবে? আমার নিজস্ব অনেক ভাবনা আছে।'

একদিন ওঁকে বলেছিলাম আমার সারাটা জীবন চলবে অন্য একটা পথ ধরে। আজ বুঝতে পারি সেদিন আমি ভুল বলেছিলাম। হয়তো সেদিন বলিষ্ঠ চারজন তরুণের মাঝখানে নিঃস্ব রিক্ত ছোট্ট একটা দাঁড়কাকের মতো ওঁকে বসে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম। হয়তো সেদিনের সেই বিরক্তিটাই ছিলো আমার একমাত্র যুক্তি।

আমাদের শহরটার যা কিছু ব্যবসাপাতি তার প্রায় সবটাই ছিলো ইহুদিদের হাতে, ফলে কেউ তাদের বড় একটা ভালোও বাসতো না। অন্য আর পাঁচজনের মতো আমারও ওঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার কোনো কারণ ছিলো না। লিওপোল্ড চলে গেলেই আমি শিক্ষক নির্বাচনে বন্ধুদের রুচি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। কিন্তু ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম বিক্রেতা, জোতভ, যে ওঁকে প্রথম ঠিক করে দিয়েছিলো, একদিন আমাকে খুব করে ধমক দিলো। অন্য কয়েকজন বন্ধুও তাতে সায় দিলো। তারপর থেকে আমি নীতি-প্রচারকের কাছে নতিস্বীকার করে নিলাম, কিন্তু মনে মনে আমার উদ্দেশ্য রইলো সবার চোখের সামনে লিওপোল্ডকে কি করে হেয় করা যায়। উনি শুধু ইহুদি বলেই নয়, ছোটখাটো এমন ভঙ্গুর একটা চেহারার মধ্যে কেমন করে এত সত্য গোপন রাখা সম্ভব একথা আমার কাছে বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো বলেই আমি তা চাইতাম। চাইতাম নন্দনতাত্ত্বিকতার জন্যে যতটা না, তার চেয়েও বেশি গায়ের জোরে।

এই খেলায় দিন দিন আমি জড়িয়ে পড়লাম এবং নিজেকে হারিয়েও ফেললাম। কয়েকবার দীর্ঘ আলোচনার পর সমাজতন্ত্রের সত্যটা হঠাৎ আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে

উঠলো, যেন আমি তাকে নিজেই আবিষ্কার করতে পারলাম। আজ পেছনে তাকিয়ে বুঝতে পারি সেদিন যৌবনের ভরা কৌতূহলে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাকেই উপেক্ষা করে গেছি। যুক্তিতথ্যের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে কোনো ধারণার জন্ম হয় নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। যুক্তি দিয়েই সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে আমি সত্যি বলে মেনে নিলাম। কিন্তু যেসব ঘটনা সেই ধারণাকে জন্ম দেয়, তা আমার আবেগকে জাগিয়ে তুলতে পারলো না, বরং এই অসমতাই আমার কাছে স্বাভাবিক কারণ হয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে আমার তখন লিওপোল্ডের চেয়ে অনেক ভালো আর বন্ধুদের চেয়ে অনেক চালাক বলে মনে হতো। প্রায় বাচ্চাদেরই মতো সবার ওপর হুকুম করতাম, আর হুকুম তামিল করতে দেখলে খুশি হতাম। আমার কাছে সেইটেই ছিলো সবচেয়ে সহজ কাজ। আসলে সমাজতন্ত্রী হতে গেলে অপরিহার্য যে গুনটার দরকার, যাকে বলে মানবিকতা, আমার সেইটাই ছিলো না। সত্যি বলতে কি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র এত সংকীর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত প্রশস্থ যে আমার সঙ্গে ঠিক খাপ খেতো না। অথচ আমি এ রকম অনেক সমাজতন্ত্রীকে দেখেছি, যাঁদের কাছে সমাজতন্ত্রবাদ যেন জলভাত। ওঁরা যেন এক একটি যোগফল কষে দেওয়ার যন্ত্র—কোন্ সংখ্যা ওঁরা টিপছেন সেটা বড় কথা নয়, যোগফলটা কেবল মিললেই হলো। হৃদয় বলতে ওঁদের কিছু নেই, কেবল নিরস অঙ্কে ঠাসা। 'হৃদয়' বলতে আমি মহত্তম কোনো ধারণার কথা বলতে চাই যা আজীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত। আমার ধারণা আমার জীবনে ওই ধরনের কোনো হৃদয় ছিলো না, এমন কি সে-সম্পর্কে আমার কোনো চেতনাও ছিলো না।

অন্যান্য তরুণদের তুলনায় আমি ছিলাম অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, প্রচারপত্রের মধ্যে থেকে নানান পন্থা খুঁজে বার করতাম, অন্য অনেকের চেয়ে লিওপোল্ডকে যখন তখন প্রশ্ন করতাম। ওঁর প্রতি শত্রুতা আমাকে বহুলাংশে সাহায্যও করেছে। সেই সময়ের ধারণা অনুযায়ী ওঁর যেসব জবাব আমার মনোমতো হতো না বা ভ্রান্ত বলে মনে হতো, আমি তা নিজেই খুঁজে বার করার চেষ্টা করতাম, চেষ্টা করতাম ওঁর চেয়ে বেশি জানার। এই অনুসন্ধিৎসা আমাকে এমন দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেলো যে আমি অচিরেই দলের প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠলাম এবং যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম নিজের হাতে-গড়া জীবটিকে দেখে লিওপোল্ড গর্ব অনুভব করছেন। উনি আমার প্রতি অনুরক্ত এ রকম একটা ইচ্ছাও প্রায় প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

'মনেপ্রাণে তুমি একজন সাচ্চা বিপ্লবী, পিটার।' মাঝেমাঝে উনি প্রায়ই বলতেন। ছেলেরা খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলো কি করলো না, তার জন্যে উনি বিশেষ কিছু মনে করতেন না। দীর্ঘস্থায়ী সর্দি কাশিতে ভুগতেন। পোড়া কাঠের মতো শীর্ণ কালো শরীর, ঘন ঘন ধূমপান করতেন আর শব্দগুলোকে ছুঁড়ে দিতেন এক একটা জ্বলন্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো। জোতভ বলতো, 'উনি তো বাঁচেন না, উনি কেবল তুষের আগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলেন। চোখের নিমেষে একদিন দেখবে কোথায় উবে গেছেন।'

আমি যেমন ওঁর প্রতিটা কথা গভীর আগ্রহে মন দিয়ে শুনতাম, তেমনি আবার ওঁকে আঘাত করার জন্যেও মুখিয়ে উঠতাম। যেমন, আমি বলতাম, 'আপনি যে ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের কথা বলছেন, মনে হচ্ছে যেন ইহুদিদের কথা ভুলেই গ্যাছেন?'

ভ্রু কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে উনি তাকিয়ে বলতেন, 'পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিক, তবু ল্যাসালি, মার্কসের মতো মানুষদেরও গুণগত বৈশিষ্ট পুঁজীবাদীদের চেয়ে ইহুদিদের সঙ্গে মেলে বেশি।'

যখন আমরা কেবল দুজন থাকতাম, ইহুদি-বিদ্বেষের জন্যে উনি আমাকে ভৎর্সনা করতেন। আমিও ইহুদি-প্রীতির জন্যে ওঁকে আক্রমণ করতে ছাড়তাম না। হ্যাঁ, কথাটা, মিথ্যে নয়।

আমাদের পরিচয়ের প্রায় মাস আষ্টেক পরে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে উনিও ধরা পড়লেন। এক বছরেরও বেশি কারাবাসের পর ওঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো উত্তরে, সেখানেই উনি মারা যান। অন্ধের মতো যারা বাস করে, খোলা চোখ নিয়েও নিজেরা যা বিশ্বাস করে তার বাইরে আর কিছু দেখে না, সেইসব মানুষের মধ্যে উনিও ছিলেন একজন—খুব সহজ সাধারণ একটা জীবন। আর ওঁদেরই উত্তরাধিকার-সূত্রে-পাওয়া মূল্যধনকে সম্বল করে শুরু হয়েছিলো আমার যাত্রা।

* * *

কারাগারে ওরা একদিন একজন সৈনিককে ধরে নিয়ে এলো। ওঁকে দেখতে ঠিক আমার বাবার মতন, মানে বাবা যখন মারা যান ঠিক সেই সময়ের মতো—টাক মাথা, পাকা দাঁড়ি, চোখদুটো গর্তে বসা, ম্লান দুঠোঁটে জড়ানো ছোট্ট এক টুকরো বিহ্বল হাসি।

উনি আমাকে জিগেস করেছিলেন, 'আচ্ছা পিটার, কারুর মৃত্যুর পর একদল শয়তান যদি তাকে নিতে আসে, তাহলে কি হবে ?'

ওঁর সেই অদ্ভুত হতাশার কারণটাকে আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, আসলে উনি জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন নিবিড় করে। অথচ একই সঙ্গে তিনজন চিৎসককে দিয়ে দেখানো হয়েছিলো—বিখ্যাত ডাক্তার তুর্কিন, একজন মেয়ে-ওঝা আর এক স্থানীয় যাজক, নানা ধরনের গাছগাছড়ার শোকড়-বাড়ক দিয়ে যিনি সব রকমের রোগ সারাতে পারতেন। আমাকে নিয়ে যাঁরা উদ্বিগ্ন বোধ করতেন, যাজক ছিলেন তাঁদেরই একজন। মাঝে-মধ্যে উনি বলতেন, 'এসব খেয়াল ছেড়ে দাও, পিটার। এটা তো আর তোমার ত্রুটি নয় যে লোকের যেভাবে বাঁচা উচিত সেভাবে তারা বাঁচতে পারছে না—তাহলে তুমি কেন তাদের নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাতে যাচ্ছো ? নিজের গুলোকে না সামলিয়ে আপরের হাঁস চরিয়ে কি লাভ ?'

এ ধরনের স্থূল ভাবনার মধ্যে যে সত্যই থাক, মানুষ পরস্পরের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে বাঁধা। অর্থনৈতিক বস্তুবাদের কাছে কল্পনার যে কোনো স্থান নেই, সেটা আমি ভালো করেই বুঝতাম। আমার একটা সুবিধে ছিলো—আমি লোভী ছিলাম না, ফলে জীবনের জন্যে তেমন কিছু আঁকড়ে রাখারও প্রয়োজন হতো না।

আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলো কল্পনাপ্রবণ, গীতিধর্মী একটা নরম মন নিয়ে মানুষকে ভালোবাসার কথা বলতো। তাদের অধিকাংশই বেশ ভালো, সরল প্রকৃতির, আমি তাদের নিশ্চয়ই প্রশংসা করি। কিন্তু আমি জানি মানুষের প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা যতটা না ব্যবহারিক, তার চেয়ে অনেক বেশি কাব্যিক। নিশ্চয়ই, এ যেন জীবনের নির্দ্দিস্ট স্থান থেকে সরে গিয়ে শূন্যে নিজেকে ঝুলিয়ে রাখার মতো। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্যে উৎকণ্ঠা যতটা না ভালোবাসার মধ্যে থেকে আসে, তার

চাইতে অনেক অনেক বেশি আসে সহমর্মীতা-বোধ থেকে—যে পারিপার্শ্বিকতায় তারা পরস্পরে বাস করে, পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। আমি জানি কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে তাঁদের যৌবনে, মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধরে নেন তাদের ভালোবাসেন। কিন্তু সেটা প্রকৃত ভালোবাসা নয়, নিতান্তই একটা যান্ত্রিকতা—এ যেন জনতার প্রতি একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এঁরা যখন পরিপূর্ণতার কেন্দ্রে পৌঁছোন, এঁদেরই মধ্যে অনেকে হয়ে ওঠেন একঘেঁয়ে, বাঁধাধরা জীবনের বিষণ্নতম যত শিল্পী আর জ্ঞানী-গুণী। মানুষের প্রতি উৎকণ্ঠা তখন ওঁদের ভালোবাসাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, উদ্ভাসিত করে দেয় ওঁদের নিতান্তই সাধারণ একটা সামাজিক যান্ত্রিকতা।

শেষ রাতে শহরে গুলি চালানোর শব্দ পেলাম। ভোরবেলায় আমার ওপরের তলার কারা-কুঠরিতে কে যেন বিলাপের সুরে কঁকিয়ে কঁকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, তারপরেই স্খলিত একটা পতনের শব্দ পেলাম। কোনো নারী বলেই মনে হলো।

*　　*　　*

সকাল বেলায় কমরেড বাসভ এসে জিগেস করলেন আমি কিছু লিখেছি কি না।

হ্যাঁ, লিখেছি।

আমার প্রথম প্রশ্নেই আতঙ্কিত হয়ে উনি ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। 'সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না, কেমন করে এটা সম্ভব যে আপনি ছিলেন একজন পুরনো পার্টি সদস্য, বিপ্লবের একজন সংগঠক, আমাদের অন্যতম একজন সক্রিয় কর্মী…' এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথাগুলো উনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, যেন শব্দগুলো দাঁতে জড়িয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই তাকে জিভ দিয়ে ঠেলে বার করে দিতে পারছেন না। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ধরনের মানুষ, তবু এক কথায় বলা যায় উনিও এ পৃথিবীর অন্যতম 'ইন্ধনিক'। ওঁর এই বিশৃঙ্খল খাম-খেয়ালির জন্যে বহুবার ধরা পড়েছেন। স্থূল-বুদ্ধি বলতে যা বোঝায়, উনি হলেন সেই ধরনের। মুখটা কেমন যেন নিরীহ অপরাধী গোছের, ধরা পড়লেই নির্যাতীত হন বিশ্রীভাবে। বুদ্ধিজীবী মহলেও কিছু কিছু মানুষ আছেন ঠিক এই ধরনের—যেন চরম দুঃখ-দুর্দশার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। এঁদের বিশেষ করে লক্ষ্য করা যেতো ১৯০৫ সালের পর। এঁরা এমন ভাবে চলাফেরা করতেন যেন পৃথিবীর মূল্য এঁদের কাছে এক কানাকড়িও নয়।

সম্ভবত ওরা বিশ্বাস করে, মৃত্যু-ভয় আমার বুককে আতঙ্কে কাঁপিয়ে তুলবে, আর আমি এমনই নীচ ইতর যে বর্ষায় ভরা-নালার মতো গড়গড় করে স্বীকারোক্তি দিয়ে যাবো। জঘন্য পশু ছাড়া এদের আর কি বলবো ?

হ্যাঁ, আমি লিখতে শুরু করেছি। কারাগারে আরও কিছু দিন থাকতে হবে বলেই যে লিখতে শুরু করছি তা নয়, লিখছি তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছানুসারে। আমি আগেই বলেছি আমার মধ্যে বাস করে দুটো মানুষ, যারা পরস্পরে কেউ কাউকে আঘাত করে না। কিন্তু তৃতীয় আর একজনও আছে, যে এই দুজনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, দ্বন্দ্বগুলোকে চোখে অঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যা আমি সবসময়ে ঠিক বুঝতে পারি না—কখনও কখনও সে কি অন্য দুজনকেই প্ররোচিত করে, একজনকে কি আর একজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, নাকি যে শুধু ওদেরকে বুঝতে চায় ? কিন্তু কেন ? কেমন করেই বা বেঁধে ওঠে এই দ্বন্দ্ব ?

হ্যাঁ সে-ই আমাকেই লিখতে বাধ্য করিয়েছে। হয়তো সে-ই প্রকৃত আমি যে সবকিছুর অর্থ উপলব্ধি করতে চায়, অন্তত কিছু না হলেও কোনো কিছুর। যদি সেই তৃতীয় পক্ষ আমার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু হয় তাহলে কি হবে ? এটা কিন্তু চতুর্থ পক্ষের নিতান্তই অলীক সন্দেহপ্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দুটো মানুষ বাস করে ঃ একটা যে নিজের সম্পর্কে সচেতন, অন্যটা ছুটে যায় আর সব মানুষের দিকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে বাস করে কম করেও চারটে স্বতন্ত্র সত্তা এবং তারা আপদেই কেউ কারুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, কেননা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা করে। যখনই একটার কোনো কিছু ঘটে, দ্বিতীয়টা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে, অমনি তৃতীয়টা অনুসন্ধানের কাজে লেগে পড়ে ঃ এত হৈচৈ করছো কেন ? নিজেদের মধ্যে মিছি মিছি ঝগড়াঝাঁটি করে কোনো লাভ আছে ? হ্যাঁ, তবু বলবো চতুর্থ একটা সত্তা আছে, তৃতীয়টার চেয়ে যে আরও গভীর ভাবে নিজেকে গোপন রাখে, সর্তক বন্য পশুর মতো যে আড়ালে ওত পেতে থাকে। হয়তো এমনও হতে পারে সারা জীবন সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে উদাসীনভাবে যাকিছু বিশৃঙ্খলা শুধু লক্ষ্যই করে যায়।

আমার বিশ্বাস মানুষ তার যৌবনে, বিশেষ করে তার নৈতিক চরিত্র যখন একটা রূপ নিতে শুরু করে, একটা ছাড়া, যেটা সবচেয়ে ভালো কেবল সেইটা ছাড়া, তার সুপ্ত ব্যক্তিত্বের বাকি সবকটা ভ্রূণকে সে দূষিত করে ফেলে। কিন্তু সবচেয়ে ভালোটাকে সে যদি দূষিত করে ফেলে, তখন কি হবে ? সবচেয়ে ভালো কোনটে এ পৃথিবীর কে বলতে পারে ?

কেন, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তো বেশ ভালোই আছে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ওদের হয়ে কাজ অনেকটা গুছিয়ে দিচ্ছে, অবাঞ্ছিতদের ধরে ধরে খুন করা হচ্ছে, আর আমরা—যারা সবকিছু জানার তৃষ্ণায় ছটফট করছি, সবকিছুকে উলটে-পালটে দেখার চেষ্টা করছি, প্রতিটা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসছি, সংগ্রাম তাদের কাছে দিন দিন হয়ে উঠছে কঠিন থেকে কঠিনতর। কুড়িতে পা দিয়ে আমার মনে হয়েছিলো আমি মানুষ নই, কেবল একপাল শিকারী কুকুর, যার-তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি, যেকোনো নির্দেশের পেছনে ছুটছি, প্রতিটা পথে গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনুসরণ করছি, খরগোশের ওপর থাবা বসাচ্ছি, বাসনা চরিতার্থ করছি, আর সত্যি বলতে কি বাসনারও বুঝি কোনো অন্ত নেই।

এটা ভালো, ওটা মন্দ—যুক্তি দিয়ে যাচাই করার কোনো বালাই ছিলো না, যেন এটা যাচাই করে দেখার মতো কোনো ব্যাপারই নয়। বাচ্ছাদের মতো কৌতূহলটাই আমার যুক্তি, ভালো-মন্দ সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ উদাসীন—এই উদাসীনতা ঘৃণার যোগ্য কিনা আমি তাও জানি না। সত্যিই আমি তখন তা জানতাম না। এই প্রসঙ্গে কমরেড তাসির মজার উক্তিটা না করে পারছি না ঃ "খুব চালাক মানুষ দেখলেই জানতে হবে তার মধ্যে বেমানান একটা কিছু আছেই।"

হ্যাঁ, তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছানুসারেই আমি লিখতে শুরু করছি। ওদের জন্যে নয়, লিখছি নিতান্তই আমার নিজের জন্যে আর লিখছি যেহেতু এখানে আমার অসম্ভব একঘেয়ে লাগে। তাছাড়া নিজের কাছে নিজের জীবন-কাহিনী উন্মোচিত করার

মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে। নিজেকে তখন কেমন যেন অজানা অচেনা একজন আগন্তুকের মতো মনে হয়, আর সবচেয়ে মজা লাগে সে যখন তার প্রকৃত ভাবনাগুলোকে সতর্ক প্রহরী, সেই চতুর্থ সত্তার কাছে গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এতো শুধু প্রদীপ নিয়ে খেলা নয়, এ যেন বহ্ন্যুৎসব—ভস্মরাশি ছাড়া আর কিই বা তার অবশিষ্ট থাকবে ? না, আমার এ লেখা ওদের হাতে পড়ুক তা আমি চাই না, সময়ে এগুলোকে হয় নষ্ট করে ফেলতে হবে, নয়তো গোপনে এখান থেকে পাচার করতে হবে।

আমার ঠিক পাশের কারা-কুঠরিতেই রয়েছে তিনজন চোর, তিনজনেই যেমন হাসিখুশি তেমনি উচ্ছল। সবচেয়ে বড়টার বয়েস এখনও কুড়ি পেরোয়নি, নৌ-বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। মুখে মুখে ছড়া কাটতে ওস্তাদ। ছোটটা প্রচণ্ড ডানপিটে। ওই বয়েসে আমিও ছিলাম ঠিক ওর মতন। কমরেড তাসি যেমন চকলেট খেতে ভালোবাসতেন, আমি ঠিক তেমনি ভালোবাসতাম বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং তাতে রীতিমতো উত্তেজনা অনুভব করতাম। দুরন্ত বাতাসের ঝাপটায় ভাসমান বরফের চাঁই নিয়ে জেলেরা যখন মুমূর্ষু অবস্থায় সমুদ্রের দিকে ভেসে যেতো, আমি তখন কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের সাহায্য করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারতাম ঠাণ্ডায় রীতিমতো জমে যাচ্ছি, তবু কখনও লগি দিয়ে কখনও দড়ি ছুঁড়ে এক এক করে ওদের ওপরে টেনে তুলতাম—তখন হয়তো দেখা যেতো নজনের মধ্যে কেবল একজন বৃদ্ধ বরফের নিচে কোথায় তলিয়ে গেছে, তবু আটজনকে তো মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছি, এইটেই আমার আনন্দ। বরাবরই আমি লক্ষ্য করেছি, বিপদের মুখে আমার হিমেল রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠতো, ভেতরের সুপ্ত শক্তি আমার সিংহের মতো ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁশে উঠতো, বুদ্ধি হয়ে উঠতো তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর, আর তা আমায় বিপদকে অতিক্রম করে আসতে সাহায্য করতো। হ্যাঁ, ছোটবেলায় ছিলাম ঠিক এমনই ছটফটে আর দুরন্ত, যেন কোনো দড়ির ওপর নিজেকে ঝোলাতে পারলেই সবচেয়ে খুশি হতাম।

একবার একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে ঃ সেবার কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে ছোটখাটো একটা সংগঠন গড়ে তোমার জন্যে ধরা পড়েছিলাম, তারপরেই সোজা হাজতবাস। কয়েকজনে মিলে ঠিক করলাম পালাতে হবে। ঝোপ বুঝে বেরিয়েও পড়লাম। কিন্তু একজন বৃদ্ধ প্রহরী আমাদের দেখে ফেললো, ধরার জন্যে আমার ওপরই পরপর চারবার রিভলভারের গুলি চালালো, কিন্তু দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার পর আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা হঠাৎ আমার কাছে কেমন যেন অপমানকর আর অদ্ভুত মনে হলো। আমাকে ধরে ফেলার পর প্রহরীটি আবার গুলি করলো, বুলেটটা আমার বুটে আঘাত করে পায়ের ছাল-চামড়া তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। এবার সে সোজা আমার বুকের ওপর রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করলো—কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। আমি চকিতে রিভলভারটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে বললাম, 'সত্যিই তোমার দুর্ভাগ্য বুড়ো শিয়াল।'

ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে কোনোরকমে ফিসফিস করে সে বললো, 'আচ্ছা শয়তান তো, এখানে দাঁড়িয়ে মিছিমিছি অপেক্ষা করছো কেন, সোজা পালাও না ?'

আমার বিশ্বাস জীবনে আমি একবারই মাত্র ভয় পেয়েছিলাম, তাও স্বপ্নে, যখন আমি

সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়ে ছোট্ট একটা প্রাদেশিক শহরে বাস করছি। এটাকে অনেকটা সমাপতনও বলা যায়। জ্যোর্তিবিদ্যার ওপর কয়েকটা বই পর পর শেষ করেছি, সবে তখন টাইফয়েড থেকে আরগ্য লাভ করেছি, ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে দুর্বল দেহটাকে কোন রকমে টেনে টেনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় ছোটখাটো অদ্ভুত একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হলো।. অদ্ভুত না বলে বরং করুণ বলাই ভালো. সম্ভবত বিকৃত মস্তিষ্ক, তবে নিঃসন্দেহে ধনী মহিলাদের স্নেহপুষ্ট কোনো সাধারণ তীর্থযাত্রী নয়, বরং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কেউ হওয়াই স্বাভাবিক। শীর্ণ দীর্ঘ চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালের দুপাশে চুলে অল্প অল্প পাক ধরেছে, অথচ বয়েস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের একটুও বেশি নয়। প্রেমে-পড়া মেয়েদের মতো উজ্জ্বল, নীল, স্বচ্ছ দুটো চোখ। রোদ পোহাতে পোহাতে পার্কের বাইরের একটা বেঞ্চিতে বসে আমি তখন ঝিমুচ্ছি। হঠাৎ ও আমার সামনে এসে হাজির হলো এবং বেশ শোভন ভঙ্গিতে কুশল বিনিময়ের পর যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো, তাঁর সম্পর্কে বলতে শুরু করলো। লক্ষ্য করলাম খ্রিস্ট না বলে বারবার ওই শব্দটিকে ব্যবহার করছে এবং এমন সরলভাবে ওঁর সম্পর্কে বলছে যেন ও নিজে খ্রিস্টের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করেছে।

আমিও তর্ক করতে ছাড়লাম না। এক সময়ে ও কিছু খেতে চাইলো, আমি ওকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। সেখানে তর্ক আরও জমে উঠলো। ও কিন্তু খুব একটা বেশি কথা বললো না, বাইবেলের পাতা উলটে উলটে কবিতার অংশগুলো পড়লো আর মাঝে মাঝে করুণ ঠোঁটে হাসলো। অবশেষে প্রায় শেষ রাত্রের দিকে আমি ওকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে যাঁরাই একটু আধটু চিন্তা করেন তাঁরা ভালো করেই জানেন যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এক কথায় খ্রিস্ট এক ধরনের কাব্যিক ভাবনা, অলীক একটা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে অজ্ঞতার ভয়ে, অভ্যেসে কিংবা জেদে, কেউ বিশ্বাস করে ধর্মের তুলো গুঁজে বুকের শূন্যতাকে ভরাবার উদ্দেশ্যে। ঈশ্বর সম্পর্কে কারো কারো মনোভাব আবার অনেকটা মেয়েদের সম্পর্কে মনোভাবের মতো, স্পষ্টতই ছলনা করেছে, প্রতারনা করছে জেনেও যেমন তাদের ছেড়ে দিতে পারে না, ঠিক সেই রকম। মোটের ওপর—ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

ওকে শোনানোর চেয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে নিজের মতামতকেই যাচাই করার ভঙ্গিতে আমি কথাগুলো বললাম, আর ও জানলার সামনে বসে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সারাক্ষণ সরল হাসি-হাসি মুখে কথাগুলো শুনে গেলো। শেষ পর্যন্ত আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম—আমি বিছনায়, ও মেঝেতে।

মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখলাম ও জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত লম্বা যে মাথা পৌঁচেছে প্রায় ছাদের কাছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে ও বিড়বিড় করে বলছে, 'একে রক্ষা করো, একে তুমি বাঁচাও!' নিজের শক্তি সম্পর্কে এমনই সচেতন, যেন ও কাকে আদেশ করছে। যাই হোক, ওর এই নাটকীয় ভঙ্গি আমার ভালো লাগলো না, তবু মুখে কিছু না বলে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপরেই সেই বিশ্রী স্বপ্নটা দেখলাম। যেন দিগন্ত-রেখার বিস্তীর্ণ একটা বৃত্তের ওপর দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি, মাথার ওপরে গুহার মতো চারদিক-ঢাকা ধূসর আকাশ।

কঠিন মাটির বুকে আমার পায়ের কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ঘষা আয়নার মতো ধূসর আকাশে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আমার সারাটা শরীর, বীভৎসভাবে বিকৃত, মুখটা তুবড়ে গেছে, হাতদুটো কাঁপছে, ধনুকের মতো বিশ্রী বাঁকানো আঙুল, এমন শক্ত হয়ে গেছে যে আমি কিছুতেই তাকে সোজা করতে পারছি না। হঠাৎ কি ব্যাপার, মাথামণ্ডু আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ভয় পেয়ে আমি ছুটতে শুরু করেছি, একই বৃত্তে বারবার ঘুরছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে আমারই বিকৃত বীভৎস সেই কুৎসিত ছায়াটা। আর আমি যত দ্রুত ছোটার চেষ্টা করছি গুহার মতো চারদিক-ঢাকা ধূসর ছাদটা ক্রমশ ছোট হতে হতে আমাকে চেপে ধরেছে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, অসহ্য ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম···

অদ্ভুত লোকটা আমাকে জাগিয়ে দিলো। শ্বাসরুদ্ধ-করা একটা দুঃসহ আতঙ্ক থেকে জেগে উঠতে দেখে আমি নিজেও খুশি হলাম, এত খুশি হলাম যে বিছনা থেকে লাফিয়ে ওঠে ওর হাত জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু সেই স্বপ্নটার চেয়ে ভয়ঙ্কর আজ আমার আর কিছুই মনে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে বলি—যা অতলান্ত তাই-ই ভয়ঙ্কর, এ ধারণা কিন্তু ভুল। উদাহারণ স্বরূপ বলি, জ্যোতির্বিদ্যা তো খুবই সহজ, কিন্তু সে কি কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর ?

শহরে রীতিমতো গোলমাল আর গুলি চলছে। একটাও সিগারেট নেই—যাচ্ছেতাই !

* * *

আগ্রহ আর প্রবল কৌতূহল নিয়ে কাজ করতাম, মনে মনে গর্ব অনুভব করতাম। অধিকাংশ মানুষের মতো আমিও পছন্দ করতাম সবাই আমার আদেশ মতো কাজ করুক, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীমহল। ওঁরাও তা চাইতেন, কিন্তু ওঁরা জানতেন না কেমন করে হুকুম করতে হয়। লোকে কি বলবে, তাতে যদি কিছু এসে না যায়। অবশ্যই, মানুষের ওপর নিজের মতামত বিস্তার করার মধ্যে একটা প্রচণ্ড তৃপ্তি আছে বইকি। মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করা এবং নিজের ইচ্ছানুসারে তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা মানেই এই নয় তাদেরকে আড়াল করে রাখা। না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মতো তারও নিজস্ব একটা মূল্য আছে। উচ্চ কোনো ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। আদেশ করতে চাইলেও, ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে কখনও প্রভুত্ব করতে চাইনি, তাছাড়া আমি সু-সংগঠকও ছিলাম না।

প্রথম যেবার গ্রেফতার হলাম, নিজেকে কেমন যেন নায়ক-নায়ক মনে হলো, এবং খালি-হাতে ভাল্লুকের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মতো আমাকেও নানান জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হলো। কারাজীবনের সঙ্গে তেমন করে কোনো পরিচয় না থাকায় প্রথম প্রথম খুবই অস্বস্তি বোধ করতাম। অস্বস্তিটা অন্য ব্যাপারে। যেমন আমার ধারণা ছিলো জেলখানায় কোনো রকম স্বাধীনতা নেই, কিন্তু ওরা আমাকে পড়াশোনার প্রথম সুযোগ দিলো, এমন কি বিপ্লবীদের সম-মর্যদাও দিলো, ফলে ওদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ যেসব মানুষ তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশার যথেষ্ট সুযোগ পেলাম।

আমার শ্রেণী-শত্রুর তাঁবেদার, আরক্ষীবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, গোলগাল চেহারা, সম্ভবত মাতাল, মুচকি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। 'পিটার কারাঝিন, ওরফে কারামোরা, সত্যিই আপনি কিন্তু ভারি চমৎকার মানুষ। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে একদিন দক্ষ কর্মী হয়ে উঠতে পারবেন।'

আমার কোনো শত্রুর মুখ থেকে ঠিক এই ধরনের কোনো প্রশাংসা আমি আশা করিনি। তাই মনে মনে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে উদ্ধত স্বরে কথা বলার জন্যে আমি প্রস্তুত হলাম, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা বিশ্রী রকমের হাস্যকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উনি যে শুধু আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছেন বলেই নয়, হঠাৎ মনে হলো আমি একটা চড়ুইয়ের মুখোমুখি বসে রয়েছি, নিতান্ত ভীরু বা মূর্খ না হলে রাইফেলটা তুলে নেবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। তাই আমি যখন বেশ শোভন ভঙ্গিতে শান্ত স্বরে কোনো রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে অস্বীকার করলাম, উনি নাক কুঁচকে ঘোত ঘোত করে উঠলেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই। আজকাল আপনারা দেখছি সবাই এক রকম, কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে চান না। ঠিক আছে—কয়েকদিন হাজতবাস করুন।'

উনি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন আমার অনমনীয় সিদ্ধান্তে উনি বরং খুশিই হয়েছেন। এ কথা আমার একবারও মনে হলো না যে নৈশভোজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতেই উনি হয়তো এমন তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। এর চেয়ে যদি অন্য কোনো ধরনের মানুষ, মানে—পুলিসের উর্দিপরা দুর্দান্ত কোনো পশুর মুখোমুখি হতে পারতাম, বোধহয় ভালো হতো। কেননা কারুর সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষকও যখন তার শ্রেণীশত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তখন এখানের এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো সবকিছু ভালো লাগবে কেন?

যাই হোক, ১৯০৫ সালের পর থেকে আমাকে তিনবার কারাবাস করতে হয়েছে আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে নিদেনপক্ষে দশবার। কিন্তু কোনোবারেই এমন কোনো শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়নি যখন আমি প্রচণ্ড ক্রোধে বা ঘৃণায় ভেঙে পড়েছি। শুধু একবার ওসিপভ নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রোগা লিকলিকে চেহারা, কর্কট রোগাক্রান্ত, আমার দিকে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'নাঃ, আপনার ভাগ্য ভালো যে আপনার বিরুদ্ধে তেমন কোনো জোরালো প্রামাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আপনি এমনই বিপজ্জনক যে আপনার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।'

না, ওঁর এই কথার মধ্যে ছল-চাতুরী কিছু ছিলো না, উনি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলেন, তবু আমার কাছে তা স্তুতি-বাক্য ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি।

উনি একজন প্রাতিভাসম্পন্ন মানুষ এবং মানুষের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সেবার উনি এমন একটা বিশ্রী মন্তব্য করলেন যা ওঁর করা উচিত ছিলো না। চশমার ফাঁক দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আমার ধারণা, কারাঝিন, হয় আপনি নির্বোধ, নয়তো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলেছেন।'

এ কথায় আমি রীতিমতো অপমানিত বোধ করলাম এবং তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনাকে আমি আদৌ আঘাত করতে চাইনি, মানুষ হিসেবে শুধু আপনার কাছে আমার ধারণার কথাটাই প্রকাশ করেছি। আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা খেলছেন এবং আমার মনে হচ্ছে একজন বিপ্লবীর পক্ষে যতটা প্রয়োজন আপনি ততটা হিংস্র নন—ক্ষমা করবেন। আসলে আপনি অত্যন্ত চালাক।'

আমি আগেই বলেছি, মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা অপরিসীম, এবং আর একবার সেটা হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেলো। সেবার বাড়িওয়ালির ছেলে, নিতান্ত

কিশোর, স্কুলে পড়ে, আমার ছাত্রও বটে. আমার সঙ্গে ধরা পড়লো। আমি সরাসরি ওসিপভকে বুঝিয়ে বললাম যে আমাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ও কোনোভাবেই জড়িত নয়, ওকে যেন অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয় থেকে যেন বরখাস্ত করা না হয়।

'ঠিক আছে, ওকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে উনি ওকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। আমি যখন ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম, উনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, 'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, আমাদের স্বার্থেই ওকে ছেড়ে দিয়েছি. আমরা চাই না আপনার মতো বিপ্লবীদের সংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলতে। পক্ষান্তরে ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বলার পেছনে আপনারও যথেষ্ট স্বার্থ আছে, নিশ্চয়ই আপনি চান না এখন থেকেই ওর জীবনটা তিক্ততায় ভরে উঠুক···।' মনে হলো ছোট্ট এই একটি কথায় উনি যেন আমাকে বৈপ্লবিক আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন। তাই আমি শুধু বললুম, 'আপনার এই উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।'

সম্ভবত ওঁরও মধ্যে রয়েছে সেই দ্বৈত-সত্তা। নিঃসন্দেহে মানুষকে এই ভাবে ভাগ করা যায় - এক, যারা কাজ করে ; দুই, যারা অন্যের কাজের ওপর বাঁচে – সর্বহারা শ্রমজীবী আর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। কিন্তু এই বিভাজনটা বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণভাবে মানুষকে সব শ্রেণীতেই ভাগ করা যায়—তাদের একক আর বিরুদ্ধ সত্তার বৈশিষ্ট্যে। একক সত্তার অধিকারীরা নিতান্তই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ছাড়া আর কিছু নয়, কেউ যদি তাদের সম্পর্কে একঘেয়ে বিরক্তি অনুভব করেন তো কিছুই করার নেই। আমার বিশ্বাস আত্মরক্ষার খাতিরে তারা আত্ম-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য। ডারউইনও এই মত পোষণ করেছেন। মানুষ এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যখন তার অহং-এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য শুধু অপর্যাপ্তই নয়, তার পক্ষে বিপজ্জনকও হয়ে ওঠে— তখন তার ভেতরের বা বাইরের শত্রুরা সুযোগ নিতে পারে। এই-ভাবে যে কেউ তার নিজের একক সত্তাকে সচেতনভাবে পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপে ঃ এ পৃথিবীতে কেন একজন বিপ্লবী করুণা ভিক্ষা করে, আবেগ অনুভূতি বা কল্পণাপ্রবণ হয়ে উঠে ? প্রত্যেক বিপ্লবীরই হওয়া উচিত অনুসন্ধিৎসু আর আত্ম-বিশ্বাসী। অবশ্য জীবনের সর্বস্তরের কৌতূহলটাও আবার তার পক্ষে বিপজ্জনক, সেটা হবে অনেকটা কাঁটাঝোপে বাচ্চাদের হারিয়ে ফেলার মতো।

দুই বিরুদ্ধ-সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকটা ডানা-মেলা পাখির মতো। নিঃসন্দেহে একক-সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, দ্বিতীয় ধরনের সত্তা আমার কাছে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। জটিল চরিত্রের মানুষ অনেক বেশি কৌতূহলদ্দীপক। কেননা অনেক কিছু তুচ্ছ জিনিস দিয়ে আমাদের জীবন সাজানো। আজ পর্যন্ত এমন কোনো নির্বোধ আমার চোখে পড়েনি যারা হাতুড়ি, পুরনো কলকব্জা আর সাইকেল গাড়ি দিয়ে তাদের ঘর সাজাতে চায়। অবশ্য এমন কোনো ধনী জোতদারের কথাও জানি না যে পাঁচশো তালা ঝুলিয়ে তার গুদোমঘরটা চাবি দিয়ে রেখেছে। আসলে আমি প্রাযুক্তিক কলা-কৌশিল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি মানুষের মনের প্রতিটা অভিব্যক্তি, তা সে যে কোনো আকারেরই হোক না কেন।

* * *

১৯০৮ সালের গোড়ার দিকে বিপ্লবের সবচেয়ে বলিষ্ঠতম মানুষগুলোই ধ্বংস হয়ে

গেছেন। কয়েকজন কর্মীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সাইবেরিয়ায়, অন্যেরা গতানুগতিকতার শিকার হয়ে ভয় পেয়ে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। খুশিমতো বাঁচার ইচ্ছায় কেউ কেউ আবার ডাকাত-দলে পরিণত হয়েছেন। খুশিমতো বাঁচার প্রবণতা এমনই একটা জিনিস, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা হতে বাধ্য। আমাদের বুদ্ধিশীল কমরেডদের মধ্যে সহযোদ্ধাদের পাশ থেকে সরে দাঁড়ানো প্রবণতাটাই সবচেয়ে বেশি করে দেখা গিয়েছিলো। হ্যাঁ, আমাদের সময়ে সেটা সত্যিই একটা জঘন্যতম অধ্যায়।

সে সময়ের কথা কিছু বলা বা চিন্তা না করাই ভালো। তবু, কিছু না বলে পারছি না, বিশেষ করে আমার লক্ষ্য, আমার নিজস্ব চিন্তাধারার কথা।

সে সময়টা আমার জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণ, এক কথায় বলা যায় আমাকে আমার নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিলো। সংগ্রামের জন্যে অস্ত্র-সুসজ্জিত আমাকে এমন ভাবে বাঁচতে হবে যে, আমি কে—সেটুকু ভাবারও পর্যন্ত কোনো অবকাশ ছিলো না। পারস্পরিক স্বার্থে পার্টির সংহতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে আমাকে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো। কিন্তু খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা আমাকে সম্পূর্ণ তন্ময় করে রাখতে পারেনি। সংহতির ব্যাপারটা আমাকে কেমন যেন দোদুল্যমানতায় ভরিয়ে তুললো, তাছাড়া পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলার বিধিনিষেধও সুস্পষ্ট ভাষায় কাগজে-কলমে কোথাও লেখা নেই…এবং একই সময়ে কয়েকটি প্রশ্ন আমাকে রীতিমতো মর্মাহত করে তুললো ঃ জনতা কেন এমন ভঙ্গুর, কেন এত দ্বিধাগ্রস্ত, কেনই বা এত সহজে বিশ্বাস হারিয়ে নিজেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে? এইসব প্রশ্ন আমাকে যেন একটা ঢিলেমির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। নিঃসন্দেহে এটা একটা জঘন্যতম নোংরা প্রতারণা। অকপটেই আমি স্বীকার করছি, খুব সহজ করে বলা যায়, সে সময়ে আমি কাজ করছি ভালোবেসে, সউল্লাস, আত্ম-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। এক কথায় বলা যায়, আসল কাজ কিছু না করে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে স্রেফ ঘুরে বেড়াচ্ছি। না, তার মানে এই নয় যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি বা কোথাও যেতে পারি না—আসলে, আমি তা চাইতাম না। তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি ঃ তিতিবিরক্ত হয়েছি জনতার ঘাড় ধরে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে টেনে আনার জন্যে নয়, বরং বলা যায় যতটা না টানা-পোড়েনের জন্যে, তার চাইতে অনেক বেশি আমার একগুঁয়েমির জন্যে—ওদের ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমি সবাইকে সবকিছু প্রমাণ করে দিতে চাইতাম, যা তখনও পর্যন্ত আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিলো না।

আমার বৈপ্লবিক কর্মধারার মধ্যে অভিপ্সার এই দৈন্যতা সম্পর্কে আমি আশ্চর্য সচেতন ছিলাম। বিপ্লব সম্পর্কে জনতার ধ্যানধারণাগুলো তখনও নষ্ট হয়ে যায়নি, কিন্তু তাদের উৎসাহ যেন অন্য কয়েকটি ধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে চলেছে। শান্ত, স্থবির এই অবস্থাটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সত্যিই খুব কঠিন, কিন্তু দুর্দমনীয় বিপ্লব, চিন্তাধারা আর অনুভূতির মধ্যে এনে দিলো একটা শিথিলতা, উন্মুখ হয়ে উঠলো নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। হয়তো এটাকে বলা যেতে পারে দুঃসাহিক অভিযানের বিপ্লব।

আরও সহজ ভাবে বলতে গেলে, আগে আমি জনগণের সঙ্গে বই থেকে ধার-করে-নেওয়া কথাগুলোই ওদের বোঝাতে চাইতাম, আর ওরা যে ভাষায় কথা বলতো আমি তা আদৌ মন দিয়ে শুনতাম না। পরে যখন বুঝতে পারলাম আমার বুকের মধ্যে বাস করছে

এমন কোনো অযাচিত অবাঞ্ছিত অতিথি যে আমার প্রতিটা শব্দ মন দিয়ে শুনছে, সন্দেহের চোরা-চোখে খুব কাছ থেকে আমাকে অনুসরণ করছে, তখন আমি সর্তক হয়ে উঠলাম। সেই দিন থেকে আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, যা আগে আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিলো, বিশেষ করে কমরেড সাশাকে, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞা, ভারি চমৎকার মহিলা। উচ্ছল ছিমছাম, ছোটখাটো চেহারা। প্রায় বছর খানেক ধরে ওর সঙ্গে আমার আলাপ। 'আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি নীল রঙটা ও বেশি ভালো বাসে—নীল মোজা, নীল ব্লাউজ, নীল ফিতে, এমন কি দেওয়ালে হাতে আঁকা ছবিগুলে পর্যন্ত নীল রঙের। সুন্দর আয়ত দুটো নীল চোখ, ঠোঁটে সব সময়েই জড়িয়ে রয়েছে স্নিগ্ধ এক টুকরো হাসি।

রাজনীতির ওপর তেমন একটা ঝোঁক কিছু ছিলো না, উপন্যাস পড়তেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো, তাও আবার গরুগম্ভীর ধরনের কোনো বই নয়।

১৯০৬ সালে সৈন্যবাহিনী যখন গণঅভ্যুত্থানকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বিধ্বস্ত করে দিয়েছে আমাদের সংগঠন, পুলিস যখন কাতারে কাতারে সভ্যদের ধরে জেলে পুরছে, ঠিক সেই সময় শান্ত স্বভাবের সাশা আমাকে স্তম্ভিত করে দিলো। তার কাকার বাড়িতেও আমাকে লুকোবার ব্যবস্থা করে দিলো, উনি তখন একজন উচ্চ পদস্ত সরকারী কর্মচারী। বিদায় নেবার সময় সাশা আমার হাত ধরে হাসতে হাসতে বললো, 'জুতোর কাঁটা ভেবে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এখন দেখছেন তো মাঝে মাঝে আমরাও কত কাজে লাগতে পারি ?'

কথাটা আমার ভালো লাগলো। পরে আমি ওকে ভালোও বেসে ফেলেছিলাম, আমি ওকে মুখ ফুটে কিছু বলিনি, ও নিজেই ব্যাপরটা লক্ষ্য করলো—ব্যাপার বলতে অবশ্য খুবই সাধারণ। একদিন সন্ধ্যেবেলায় ওর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ, যেন ক্রুদ্ধ স্বরে ও আমাকে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, আমাকে যে ভালোবাসো সে-কথাটা কবে মনস্থির করে জানাবে বলোতো ?'

ব্যাস, এইটুকুই। আমি অন্য ধরনের কিছু আশা করেছিলাম, কেননা আমার ধারণা ছিলো প্রকৃত ভালোবাসা গভীর, অতলস্পর্শী ধরনের কিছু, যার মধ্যে অভিনয়-অভিনয় একটা ভাব থাকবে। কিন্তু সাশার আড়ম্বর বর্জিত এই সরলতার মধ্যে আমি নাটকীয়তার কোনো গন্ধই পেলাম না। মনে পড়ছে, বিয়ের পর পোশাক ছাড়ার সময় ও কখনও ঘুরেও দাঁড়াতো না, বরং আমার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে গর্ব করে বলতো, 'তোমার কি মনে হয় আমাকে দেখতে ভালো নয় ?'

এমনি ভাবেই ব্যাপারটার শুরু। কিন্তু সত্যিকারের আনন্দ বলতে যা বোঝায়, এর মধ্যে তেমন কিছু ছিলো না। এ যেন এক ধরনের ব্যবসায়িক-ভালোবাসা, কেননা এর গভীরে আমি কোনোদিনই প্রবেশ করতে পারিনি।

* * *

কমরেড পোপভ, শহরে তখন সদ্য এসেছে, সাশার পেছনে হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতো। বেশ ভালো দেখতে, সব সময় ধোপদুরস্ত, গোলাপী চিবুক, একটু ভোতা নাক, লালচে গোঁফ, বিশ্বস্ত কুকুরের মতো সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাতো, সব সময় কিছু না কিছু করার জন্যে ছোটাছুটি করছে। 'বিপদ সম্পর্কে কোনো রকম সচেতন না হয়ে সব ব্যাপারে

ওর অহেতুক কৌতূহলটাকে প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি তরুণিমা। কিন্তু খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম ওটা ওর ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও হাসির কবিতা বা ইহুদি গাথাগুলো খুব ভালো পুনরাবৃত্তি করতো, তবু বিপ্লবীর মতো না দেখিয়ে ওকে আমার কেমন যেন হোটেলের নৈশ-আসরে সংগীত-গায়কের মতোই মনে হতো। কিন্তু ওর চেহারা ছিলো বুদ্ধিদীপ্ত, কথা বলতো অত্যন্ত ধারালো। সাশার জন্যে ও প্রায়ই মিষ্টি, বই, নানান টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসতো, এক কথায় সাশার প্রণয়-প্রার্থনার জন্যে ও রীতিমতো খরচা করতো। একদিন আমি সাশাকে জিগেস করেছিলাম, 'ওর কি ব্যাপার বলো তো ?' ও বলেছিলো, 'রোস্টভে পোপভের নাকি এক বড়লোক ভাই আছে।' এই যুক্তি আমার ধারণাকে যথেষ্ট খুশি করতে পারিনি। হতে পারে আমি পোপভের ওপর কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়েছিলাম, কেননা আমি জানতাম আমার স্ত্রী যৌন-চেতনা সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী। কিন্তু মানুষের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলো না বলে আমার সন্দেহটা ছিলো খুব সাধারণ ধরনের, কেননা প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন বাস করছি গুপ্তচর পরিবেষ্ঠিত হয়ে। তাছাড়া কিছু দিন ধরে একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, পোপভ এই শহরে আসার পর থেকে পুলিসি-তৎপরতা যেন আরো বেড়ে গেছে। ওকে আবিষ্কার করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। প্রথম চোটেই কয়েকজন পার্টি-সমর্থকদের ঘর অনুসন্ধান করা হয়ে গেছে। একবার এক পার্টি-সমর্থকের পড়ার ঘরের সোফার নিচে কিছু গোপনীয় কাগজ-পত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, এক ঘণ্টা পরেই পুলিস এলো, অন্য কোনো ঘরে না গিয়ে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে সোফার নিচেটা খুঁজলো, কোনো কিছু না পেয়ে সোফার গদিটা ফাল ফাল করে চিরে ফেললো। অবশ্য তখন সেখানে আর কিছু ছিলো না।

তরুণ সহকর্মীদের ছোট দলটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি তখন প্রায় একাই শহরে বাস করছিলাম, ওই ঘটনার পর ঠিক করলাম কুড়ি কিলোমিটার দূরে আমাদের এক কসাক বন্ধুর খামারবাড়িতে একাই বাস করবো।

যাবার আগে পোপভের সঙ্গে দেখা করলাম। ও থাকতো শহরতলির এক প্রান্তে, ফল-বাগিচার এক মালিকের বাড়ির চিলেকোঠায়। ওকে দেখে কেমন যেন বিধ্বস্ত আর ম্লান মনে হলো। নিশ্চয়ই, ও জানতো বইকি এই অনুসন্ধানের পরিণাম কি দাঁড়াবে। ও যে ধরা পড়ে গেছে সেটা পোপভ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলো। আমাকে দেখে ও খুশি হতে পারলো না, বরং বাড়িওয়ালার একটা উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে বলে ব্যস্ততার ভান করলো। সত্যিই নিচে থেকে তখন অ্যাকর্ডিয়ানের মিষ্টি সুর, উদ্দাম কলোচ্ছ্বাস আর পা-ছুঁড়ে নাচার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

আমার জীবনে সবচেয়ে জঘন্যতম তিন-চার ঘণ্টা সময় কাটালাম পোপভের সেই চিলে কোঠায়। আমি ওকে জিগেস করলাম, 'পুলিসের হয়ে তুমি কতদিন একাজ কোরছো ?'

পোপভ চমকে উঠলো, হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়লো মাটিতে, নিচু হয়ে কুড়তে কুড়তে ও বললো, 'এ-এ আপনি কি বলছেন !'

কিন্তু সোজা হয়ে বসতেই আমার হাতে রিভলভার দেখে ও আর একবার চমকে উঠলো। বিস্ময়ে ভ্রূদুটো কুঁচকে গেছে, গোঁফজোড়াটা ঝুলে পড়েছে, সরু হয়ে কুঁচকে যাওয়া চোখের মনিদুটো স্থির। প্রচণ্ড ক্রোধে ওর চুলের মুঠি ধরে বারকয়েক ঝাঁকুনি

দিতেই দেখলাম সপ্রতিভ মুখটা একতাল থলথলে জেলির মতো হয়ে গেছে, কেবল আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখের মণিদুটো কাঁপছে তিরতির করে। মুঠিটা ছেড়ে দিতেই নড়বড়ে কাঁধের কাছ থেকে মাথাটা ঝুলে পড়লো বুকের ওপর।

তারপর সে যে কাহিনী বললো সেটা খুবই সাধারণ। ১৯০৩ সাল থেকে ও পার্টির সক্রিয় কর্মী, দুবার জেল খেটেছে। ১৯০৮ সালের সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছে এবং ধরাও পড়েছে। 'আমি শপথ করে বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন, পুলিসের কয়েকজনকে আমি গুলি করেও মেরেছি। কিন্তু কাউকে কোনো না কোনো ভাবে তো বাঁচতে হবে, আপনিই বলুন…এছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় ছিলো না…'

একটা হাতে ও হাঁটুটা চেপে ধরছিলো, অন্য হাতে মুঠোর মধ্যে খুব সন্তর্পণে কি যেন একটা পাকাচ্ছিলো। আমি চকিতে মুঠোর মধ্যে থেকে ওটা ছিনিয়ে নিলাম—এক চিলতে কাগজ। কাগজটাকে সমান করে মেলে ধরতেই নিজের নামটা দেখতে পেলাম, তার নিচে লেখা রয়েছে, "কারাঝিনকে এখনই সরিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না, একাতেরিনোস্লাভায় তার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে, উনি এখন সেখানেই যাচ্ছেন।"

পোপভের কাহিনী আমাকে কোনো দিক থেকেই নাড়া দিতে পারিনি, যদি কোথাও কিছু নাড়া দিয়ে থাকে তো সে তার ভীরুতা! কিন্তু এটা পড়ার পর প্রচণ্ড ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠলো, সেই মুহূর্তে মনে হলো আমি যেন আমার নিজেকেই চিনতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। 'ঠিক আছে, একটা কাগজে লিখে দাও যে আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

'মৃত্যু!' এবার ও ভয়ের চাইতে অবাক হলো আরও বেশি। 'এ আপনি কি বলছেন?'

'খুব সহজ', চাপা ক্রোধে আমি গর্জন করে উঠলাম। 'যদি না লেখো, আমি তোমায় গুলি করবো। আর যদি লেখো—আমার সামনে তোমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে। সবাই বুঝতে পারবে তুমি আত্মহত্যা করেছো।'

'আমার আত্মহত্যার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বুঝতে পারবে আমাকে খুন করা হয়েছে, এবং কারুর বুঝতে কোনো অসুবিধে হবে না…আপনি ছাড়া এখানে আর কেউ আসেনি…' কথা বলতে বলতে মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে এসে ও আমার পাদুটো জড়িয়ে ধরলো, অস্ফুষ্ট স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন…মানবিক দিক থেকে আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন…'

ব্যাপারটা মিটতে মিটতে অনেকটা সময় কেটে গেলো। প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ বুঝি এসে পড়বে, কিন্তু উদ্দাম কলোরোলের মধ্যে কোনো শব্দই নিচে গিয়ে পৌঁছলো না। নিজেকে ঝুলিয়ে পোপভ পা দিয়ে স্টোভটা ঠেলে না দেওয়া পর্যন্ত আমি ওর হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম।

না, এখন আর লিখতে ভালো লাগছে না। তাছাড়া মিছিমিছি লিখেই বা কি লাভ?

* * *

কিন্তু না লিখেও কোনো উপায় নেই, আমার বিহ্বল অবস্থাটা সম্পর্কে সত্যিই কিছু বলা উচিত।

গভীর রাত্রে শহরের বাইরে রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি, মাথার ওপরে স্বচ্ছ হিমেল

আকাশ, রাস্তার দুপাশে কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারিসারি স্তব্ধ মহীরুহ। তারই একটা ছায়ায় হেলান দিয়ে বসে রাতটা কাটিয়ে দিলাম, নিশান্তিকায় ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে গরুর গাড়ির চাকার শব্দে ঘুম ভাঙলো। বুকের মধ্যে একটা বোবা নির্জনতা অনুভব করলাম, কেমন যেন অসুস্থ লাগছে। কি যেন আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে—এমনি একটা প্রত্যাশা নিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। পোপভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রোধাশ্রিত ঘৃণারও অপমৃত্যু ঘটেছে। যদিও বুঝতে পারলাম এটা নিতান্তই একটা নীরস ধারণা, তবু তা আমাকে উত্যক্ত করে তুললো না, কেননা নিজেকে আমার আদৌ অপরাধী-অপরাধী মনে হচ্ছে না।

কিন্তু বুকের অতল থেকে হঠাৎ যখন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ালাম, তখনই বিব্রত বোধ করলাম—আচ্ছা, কেন এমন অপ্রত্যাশিতভাবে, কেন এত দ্রুত পোপভকে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য করালাম ? তখন কি ওর চেয়ে আমি নিজেই ভয় পেয়েছি আরও বেশি ? যেন আমি কোনো অপরাধকে সরিয়ে দিইনি, মুছে দিয়েছি আমার পক্ষে বিপজ্জনক কোনো সাক্ষীকে, যাকে আমি কোনো না কোনো কারণে ভয় করি।

এমনি একটা প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে পরের দিন ধরা পড়লাম।

পুলিস-বিভাগের প্রধান সিমনভ রুক্ষ স্বরে আমাকে বললেন, 'শুনুন কারাঝিন, মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী করলেও পোপভকে এমন অবস্থায় পাওয়া গ্যাছে, বিশেষ করে ওর দু কব্জির কাছে এমন চিহ্ন পাওয়া গ্যাছে, যা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ও আত্মহত্যা করেনি, ওকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করানো হয়েছে। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হয়ে গ্যাছে, মৃত্যুর দিন অনেক রাত পর্যন্ত আপনি ওর ঘরে ছিলেন এবং পোপভের মৃত্যুর সময়ের সঙ্গে সেটা সম্পূর্ণভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও কাঁচের ছাইদানীতে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গ্যাছে, আমরা সেটাকে পরীক্ষাগারে পাঠিয়েছি, এখনও ফলাফল পাইনি, তবে আমি নিঃসন্দেহ ওটা আপনার আঙুলের ছাপের সঙ্গে অবশ্যই মিলে যাবে। সুতরাং ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন···পোপভ ছিলো আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ওর মৃত্যুর জন্যে আপনাকেই তার মূল্য দিতে হবে। তাছাড়া ওর মৃত্যুর পেছনে আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আছে—সেটা হলো আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওর প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে ঈর্ষা। আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন—আলেকসেন্দ্রা ভারভারিনাও এই খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন।'

আমি চুপচাপ শুনে গেলাম। নিশ্চয়ই বলবো না যে আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অ-রাজনৈতিক অভিযোগ নিঃসন্দেহে সুখকর নয়। সাশা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে, এটাও ভাবতে আমার বিশ্রী লাগছে।

সিমনভ দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজেরই মুখ-নিঃসৃত ধূম্রজালের মাঝখানে, পাকা-খেলুড়ের ভঙ্গিতে উনি বলে চললেন, 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। আপনি বরং পোপভের স্থান অধিকার করুন। আপনি যদি রাজি থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ আমি তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করবো। ভেবে দেখার জন্যে দুঘণ্টা সময় দিলাম, কিন্তু তার বেশি দেরি করবেন না।' কারা-কুঠরির বাইরে গিয়ে উনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। 'এ ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই।'

না, মনস্থির করতে আমার কয়েক মুহূর্তও সময় লাগেনি! যদিও মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম—দড়ির ফাঁসটা আমার গলার চারপাশে ক্রমশ চেপে বসছে, তবু 'পোপভের স্থান অধিকার করুন' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, এ যেন একটু হেঁটে বেড়ানো কিংবা এক গেলাস জল খাওয়ার মতো নিতন্তই স্বাভাবিক। অন্ধকার এক কোণে চুপচাপ বসে বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছি আর আমার মধ্যে কারা যেন পরস্পরে কথা কইছে।

'কি ব্যাপার, এমন শান্ত আর চুপচাপ কেন? গতকাল পোপভের ঘরে যে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছিলে, সেই ক্রোধ আজ কোথায় গেলো?' গতকাল বিশ্বাসঘাতকটাকে যেসব কথা বলেছিলাম, মনে মনে সেগুলো পুনরাবৃত্তি করলাম, কিন্তু ভালো বা মন্দ—কোনো রকম অনুভূতিই কাজ করছে না। কেবল মনে হচ্ছে, যে লোক আরও অনেকের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারতো সে যেন কোথায় আত্মগোপন করে আছে, আর যে একজন ওর কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়, শিখতে চায়, আজ সে বিহ্বলের মতো চুপচাপ বসে কিসের জন্যে যেন প্রতীক্ষা করছে, অপরাধীটাকে ওর গোপন আস্তানা থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু টিকি তো দূরের কথা, ওর ছায়াটাকে পর্যন্তও সে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। কেবল চিন্তার পোকাগুলো অদ্ভুত উত্তেজনায় মাথার মধ্যে কিলবিল করছে।

'বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সত্যিই আমি পুলিসের হয়ে কাজ করবো?'

না, ভেতর থেকে এর কোনো জবাব পেলাম না, কেবল তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো কতকগুলো কৌতূহল, নিজের সম্পর্কে যে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলো।

সিমনভ যখন ফিরে এলেন, এক কথায় সরাসরি ওঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। সেই মুহূর্তে উনি কোনো জবাব দিলেন না, সিগারেট ধরিয়ে আবার ধূম্রজাল বিস্তার করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি অবশ্য জানতাম, আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে আইনানুসারে যে ব্যবস্থা করা দরকার তাই-ই করা হবে।'

এ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গেও আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক দুজনে কথাবার্তা বললাম। এমন নিপুণ ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম এবং স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম আমার অনমনীয় মনোভাবে সিমনভও কম বিস্মিত হননি। অন্য দিকে আবার আমার শান্ত স্থির মূর্তি ওঁকে প্রায় বিব্রতই করে তুললো, অনেকটা পোপভের ঘর থেকে ফিরে আসার পর আমার মানসিক বিহ্বল অবস্থারই মতো। আসলে উনি চেয়েছিলেন কোনো না কোনো ভাবে আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না দেখে হঠাৎ বললেন, 'কর্নেল ওসিপভ বরাবরই আপনার প্রতিভার দারুণ প্রসংশা করতেন।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'কেন, উনি কি মারা গ্যাছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ভারি চমৎকার মানুষ ছিলেন।'

'নিশ্চয়ই!'

এক মুখ গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে সিমনভ অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'একজন স্বপ্নদর্শী। আপনাদের ভাষায় যাকে কল্পনাবিলাসী না কি যেন বলে?'

'হ্যাঁ।' শেষ পর্যন্ত বললাম, 'দেখুন, পোপভ নিজে হাতেই গলায় দড়ি দিয়েছে, অবশ্য নিঃসন্দেহে এতে আমার প্ররোচনা ছিলো।'

ফিরে যাবার আগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উনি শুধু ছোট্ট করে বললেন, 'জানি।'

'তাহলে কারামোরা,' আমি নিজেই নিজেকে বললাম, 'এবার শক্ত হয়ে দাঁড়াও।'

আমি তখনও আশা করছি, কেউ বুঝি এখুনিই চিৎকার করে উঠবে, 'আরে থামো, থামো। যাচ্ছো কোথায়?'

কিন্তু না, কোথাও কারুর কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

*　　　　*　　　　*

শুরুতেই, মাসখানেক কি মাস দুয়েক বাদে, সিমনভ একাই যেন সাম্ভব্য সব রকম ঘটনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বছর পঞ্চাশ বয়েস, মাঝামাঝি উচ্চাতায় বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, খুব সাধারণ ছোট্ট একটু গোঁফ, কেমন যেন ঘুম-ঘুম জড়ানো হালকা ধূসর চোখ, মোটের ওপর অত্যন্ত সাধারণ একটা চেহারা, যা মাঠে-ঘাটে সব জায়গাতেই চোখে পড়ে। এমনই সাধারণ যে প্রথম প্রথম অবাক হবে ভাবতাম এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে কেমন করে আসীন থাকা সম্ভব, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট আছে। অথচ উনি যা বলতেন তাতে ওঁর আমলাতান্ত্রিকতার মনোভাবই প্রকাশ পেতো, যা আমার কাছে আদৌ অপরিচিত মনে হতো না। ওঁর কাজের প্রাথমিক এবং মূল লক্ষ্যই হলো—হয় বশ্যতা স্বীকার করা, নয়তো বোধাতীতভাবে নিজেকে তুলে ধরা। ইতিহাস এবং রাজনীতির ওপর বিশ্রীভাবে নানান ধরনের প্রশ্ন করতেন, অথচ যাদের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন, সেই রাজতন্ত্র বা জার সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন আর কায়েমী-স্বার্থান্বেষীদের অভিযুক্ত করতেন, গালাগালি দিতেন প্রাণভরে।

মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করতাম, 'এই ধরনের ঝামেলার কাজ নিতে গেলেন কেন?'

'আমার কাছে এ কাজে অবশ্যই যথেষ্ট আনন্দ আছে,' মৃদু হেসে উনি জবাব দিতেন। 'ঠিক যেমন বিপ্লবী হিসেবে আপনার আনন্দ আছে আপনার নিজের কাজে। আপনাদের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের খুঁজে বার করা, তাদের ধরা…রীতিমতো একটা উত্তেজনার ব্যাপার।

প্রথমে ভাবতাম এর মধ্যে কোথাও একটা ত্রুটি, একটা নির্মম নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু পরে মনে হোলো তাঁর স্বাভাবিক ভাবনাগুলোকে, তা সে যত তুচ্ছ বা সাধারণই হোক না কেন, উনি আমার কাছে গোপন করে রাখতে চান। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওঁকে এ পৃথিবীর নানান অসমতা, দৈনিন্দন জীবনের নানান দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম আর উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধূম্রজালের মধ্যে থেকে শান্ত স্বরে জবাব দিতেন, এ ব্যাপারে আমার কি করার আছে বলুন? আমি তো আর পৃথিবীটাকে এভাবে গড়িনি, আর তার জন্যে আমি মাথাও ঘামাই না। আপনারও ঘামানো উচিত নয়। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আপনাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অন্য কোনো বই পত্তর না পড়ে আপনার ব্রেহেমের 'পশুর জীবন' বইটা পড়া উচিত।'

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বলতে উনি যে পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতি কটাক্ষ করলেন,

সেটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হোলো না। পরপর ধোঁয়ার কয়েকটা কুণ্ডলী ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'খেলা আর শিকার—এ দুটোর চাইতে ভালো কাজ আর কিছু নেই। আমার যদি অনেক টাকা থাকতো, সাইবেরিয়ায় গিয়ে ভাল্লুক শিকার করতাম, চাই কি আফ্রিকাতেও চলে যেতাম। মেরে ফেলাটাই সবচেয়ে আনন্দের নয়, উদ্ধত রাইফেলের মুখে শিকারকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ানোর মধ্যে প্রচণ্ড একটা উন্মাদনা আছে, তখন আপনি মানুষের শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারবেন নিজের মধ্যে। কেউ কাউকে খুন করে নিতান্ত প্রয়োজনে, ক্রোধে কিংবা ঘৃণায় অন্ধ হয়ে, আনন্দের জন্যে নয়।'

ওঁর এই কথাতেই সেদিন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওঁর মনের অন্ধকার কোণে কোথায় যেন একটা মানসিক বিচ্ছিন্নতা যন্ত্রণার কঠিন আবরণে লুকিয়ে রয়েছে। কেননা খেলা আর শিকারই যদি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মানুষের জীবনের স্বপক্ষের কেমন করে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলা সম্ভব ?

সিমনভের নিজের ধারণা উনি একজন 'ভালো' মানুষ। ওঁর যত ত্রুটিই থাক না কেন এবং সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করাটা যদিও এক ধরনের বৃথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়, তবু আমার প্রতি ওঁর মনোভাবের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো, যা আমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারতাম না। কেমন যেন একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুলতেন, কোনো বিশেষ একটা কথায় বা আচরণে নয়, দায়িত্ব এবং পদমর্যাদার বাইরে সামগ্রিক একজন মানুষ হিসেবে। উনি কখনও আমার সঙ্গে সেনাধক্ষ্য যেমন নিম্নপদস্থ সেনানীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তেমন কোনো রূঢ় আচরণ করেননি, বরং প্রবীন যেমন তরুণদের সঙ্গে আচরণ করেন, ঠিক তেমনি ব্যবহার করতেন। কখনও আদেশ বা হুকুম করতেন না, বরং অনুরোধ করতেন কিংবা উপদেশ দিতেন ঃ

'আপনি কি ভাবেন, এর থেকে আমরা এত সহজে মুক্তি পাবো ?'

আমি যখন হাসতে হাসতে বলতাম, 'এই তো সবে সূচনা !' আর তর্ক না করে উনি আমার সঙ্গে একমত হতেন।

মাঝে মাঝে আমার একাকীত্বে উনি বিব্রত বোধ করতেন। হয়তো এমন হতে পারে—ভালো জাতের শিকারী কুকুরের প্রতি শিকারীর ভালোবাসার মতো এটা এক ধরনের সমবেদনাবোধ। তাই আমিও বিদ্রূপ করতে ছাড়তাম না, তিক্ত স্বরে বলতাম, 'সেই প্রবাদটা মনে আছে তো—'সবচেয়ে রূপসী মেয়ে কেবল সেইটুকুই দিতে পারে সেটুকু তার নিজের।'

শুধু ওঁর জন্যে নয়, এই প্রবাদ আমার বুকের গভীর ক্ষতেও একটা কোমল স্পর্শ বুলিয়ে যেতো।

* * * *

ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে আমার কমরেডদের মধ্যে সত্যিকারের এমন একজনও কেউ নেই যার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি—তা হলো আমার নিজের সম্পর্কে। এ নিয়ে মনে মনে বহুদিন তর্কের ঝড় তুলেছি, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। বুকের ভেতরের ফাটলগুলোকে আমি কোনো ভাবেই ভরিয়ে তুলতে পারিনি। এ কথা যারা বলে এ পৃথিবীতে যাকিছু দেখা সম্ভব প্রত্যেকেরই

ছায়া আছে, এমন কি যাকিছু সত্য আর ধারণারও, তারা নিতান্তই সাধারণ। ছায়া থেকে জন্ম নেয় সন্দেহ, যেমন প্রত্যয় থেকে পবিত্রতা। আর সন্দেহ, যদিও তাকে কোথাও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়নি, তবু তা নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য ও অবিশ্বাস্য। আর অবিশ্বাসী মানুষ সবসময়ই জাগিয়ে তোলে একটা সন্দেহ—আমি একে ছায়াবিহীন একটা সত্যেরই মতো মনে করি। দোদুল্যমান চিন্তাধারা, খামখেয়ালিপনা আর ভাবালুতার জন্যে পার্টি-কমডেদের মধ্যে আমার বদনাম সবচেয়ে বেশি।

'একজন বিপ্লবীকে সবার আগে হতে হবে বস্তুবাদী—বস্তুবাদই ইচ্ছার অভিব্যক্তি। যাকিছু যুক্তিহীন, অসংগত, তা থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে।'

মাঝে মাঝে কমরেড বাসভ আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন। হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। শুধু ওঁকে ভালো লাগতো না বলে বিরুদ্ধাচারণ করে কখনও ওঁর সামনে স্বীকার করতাম না।

পক্ষান্তরে সিমনভ এমনই এক ধরনের মানুষ, যাঁর সঙ্গে সব রকমের কথা বলা যায়। সব সময় মন দিয়ে শুনতেন, কখনও বুঝতে না পারলে কোনো রকম দ্বিধা না করে তখনই সরাসরি প্রশ্ন করতেন, কখনও বা মুখের ওপর স্পষ্টাস্পষ্টই বলতেন, 'আমার এটা বোঝার কোনো দরকার নেই।'

উনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না জেনে প্রথমে খুব অবাক হয়েছিলাম। সিমনভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ছিলেন, 'এতে এত অবাক হবার কি আছে? আর যদি ঈশ্বর থেকেও থাকে—তার জন্যে উট ভেড়া শুয়োর রয়েছে, তারা ভাববে। তার জন্যে আপনার মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। নাঃ, বুদ্ধিজীবীরা দেখছি আপনার মাথাটা একেবারে খেয়ে বসে আছে।'

'আচ্ছা, ওরা যদি আমার মাথাটা না খেতো, আমার কি পরিণতি হতো বলে আপনার মনে হয়?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে, হয়তো মৌলিক কিছু উদ্ভাবন করতে পারতেন। আপনি কিন্তু সত্যিই ভারি অদ্ভুত মানুষ।'

মোটের ওপর উনি প্রাণশক্তিবিহীন, বিচ্ছিন্ন ধরনের মানুষ, সম্ভবত অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। অথচ সিমনভ এমন ভঙ্গিতে কথা বলতেন, হঠাৎ দেখলে মনে হবে মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে বুঝি সম্পূর্ণ উদাসীন। একটু অলস প্রকৃতির, সম্ভবত ওটা ওঁর ক্লান্তি। আমি খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম—খেলা আর শিকার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেটার আবিষ্কারক উনি নিজেই, আমার কাছে নিজেকে আড়াল করে রাখার ছলনা মাত্র। মানুষ শিকার করে উনি কখনও উল্লাসিত হতেন না, যাকিছু করার করতেন গুপ্তচরদের মাধ্যমে, তাতেই খুশি থাকতেন, নিজের কাজে বড় একটা দক্ষতা দেখাবার চেষ্টাও করতেন না। পার্টির মূল তথ্যের চেয়ে পার্টি-জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনীগুলো, বিশেষ করে আমার জীবনের নানান অভিজ্ঞতা উনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন! আমি লক্ষ্য করেছি সে সময়ে প্রচণ্ড একটা হতাশায় ওঁর মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিতো।

ওঁর বিশ্রী একটা স্বভাব ছিলো, যা মাঝে মাঝে আমাকে অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিতো—আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ টেবিলের ওপর ঝুঁকে ফ্যাল ফ্যাল করে এমন অদ্ভুত আর বিহ্বল ভঙ্গিতে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন, যেন

আমাকে সম্মোহন করছেন। আমি বুঝতে পারতাম উনি ভয়ঙ্কর ধরনের অন্য একটা কিছুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সেই সঙ্গে টেবিলের নিচে হাতদুটোকে নিয়ে এমন ভাবে নাড়াচাড়া করতেন, যেন আমাকে গুলি করার জন্যে রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

এরপর থেকে আমি ভাবতে লাগলাম নিশ্চয় সিমনভের মধ্যে এমন একটা উল্লেখযোগ্য কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে, যার জন্যে উনি মানুষকে ভয় করেন। সেই রহস্যটা উদ্ভাসিত হবার প্রতীক্ষায় আমি উদগ্রীব হয়ে থাকতাম।

প্রতিটা ধর্মগ্রন্থে যেমন সততার নানান তত্ত্ব থাকে, তেমনি যাকিছু অশুভ বা নীচতাতারও সুনির্দিষ্ট একটা তত্ত্ব থাকা উচিত, কিংবা এমন কোনো পদ্ধতি যা দিয়ে সব, সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা যায়—নাহলে কেউ বাঁচবে কেমন করে ?

লিখে কি হবে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, কেননা আমার মধ্যে কোনো কিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি। নিজেকে বারবার চাবকিয়ে অপরাধসুলভ একটা প্রতিক্রিয়াকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি, যে সোচ্চার কণ্ঠে চিৎকার করে বলবে, 'খুনী, তুমি খুনী, তুমি একটা জঘন্য অপরাধী !'

কেবল একটা কৌতূহল ছাড়া—না ঘৃণা, না দুঃখ, না ভয়, কিছুই আমাকে উত্তেজিত করতে পারেনি। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করেছি, 'এতই যদি সাধারণ, তাহলে আর লিখে নিজেকে নায়ক বানাবার প্রয়োজনটা কি ?'

না, অতীতে হয়তো একদিন নায়ক ছিলাম, আজ নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ, মনের অন্ধকার ছোট্ট একটা সমস্যা নিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছি—কেন আমার মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না ?

সবকিছুই যদি কাল্পনিক আর মিথ্যে হয়, এছাড়া যদি আর কিছু না থাকে, তাহলে আমিই সেই মিথ্যের মুখোশটাকে খুলে দোবো, আমি মানুষের সামনে ঘোষণা করবো—জীবন পশুর নগ্ন সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায়ও নেই। এটা একটা প্রতারণা। তাছাড়া সংগ্রামে নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রশ্নই আসে না। আমিই প্রথম আবিষ্কার করবো যে নিজের মধ্যে নীচতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে মানুষ অসহায়, আর তার তা করা উচিত এমনও কোনো কারণ নেই—কেননা পারস্পারিক এই সংগ্রামে এটা একটা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

রূপকথায় আছেঃ কিছু লোক তাদের সম্রাজ্ঞীর অতুল লাবণ্য, তাঁর সাজসজ্জা দেখে বিমোহিত হয়ে গেলো, কেবল একজন অর্বাচিনই চেঁচিয়ে উঠলো, 'উনি ল্যাংটো কেন ?'

সত্যিই তাই, সবাই অবাক হয়ে দেখলো তাদের সম্রাজ্ঞী শুধু নগ্নই নয়, কুৎসিতও বটে !

আমাকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সেই অর্বাচিনের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে হবে।

এই ভাবনা আমার মধ্যে দানা বাধালো ১৯১৪ সালে, বিশেষ করে যখন যুদ্ধের সেই

জঘন্য দামামাটা বেজে উঠেছে আর পচা-গলা মাছের গা থেকে আঁশগুলো যেমন খসে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের গা থেকেও মানবিকতার আবরণগুলো খসে খসে পড়ছে।

* * * *

যতটা লিখেছি সেই পর্যন্ত পড়ার পর দেখলাম যেভাবে লেখা উচিত ছিলো সেভাবে লেখা হয়নি, আসলে কাহিনীটাকেই ঠিক ভাবে উপস্থিত করতে পারিনি। নিজেকে এমন ভাবে চিত্রিত করেছি যেন একজন মানুষ যে ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, দার্শনিকতার ভারে নুয়ে পড়েছে, মানবিক উপাদানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে– এবং সবকিছুই বেশ ভালো আর কোমল মনে হচ্ছে। না, ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়।

আধিক্য থাকা সত্ত্বেও ভাবনা আমাকে কোনোদিনই বিভ্রান্ত বা প্রলুব্ধ করতে পারেনি। ওগুলোকে আমার মনে হয়েছে আবেগের মুখে কয়েকটা বন্ধুদের মতো – এসেছে, মিলিয়ে গেছে, আবার এসেছে। কেবল সেইসব ভাবনাগুলোকেই আমার প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, যেগুলো আমার আবেগের বোঝাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তখন আমি মনে মনে সবচেয়ে বেশি সতর্ক হয়ে ওদের লক্ষ্য করেছি, আর ওগুলো মানুষের সক্রিয় আঙুলের মতো অনবরত কাজ করে গেছে--ঘটনাগুলোকে ওরা উলটে-পালটে দেখেছে, তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, আঁকড়ে ধরেছে. মূলোৎপাটিত করেছে, উর্বরা করেছে, তারপর আবার নতুন করে আবেগের জন্ম দিয়েছে। এই উর্বর অনুসন্ধিৎসাবিহীন ভাবনা মানুষের সঙ্গে বারাঙ্গনাদের সম্পর্কের মতো, যা তার ভেতরের কোনো কিছুকেই পালটে দিতে পারে না। বারাঙ্গণাদের অবশ্য কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভালোবাসতে পারে, কিন্তু তখন আবার চুরি বা রোগ-সংক্রামন সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হবার প্রয়োজনও দেখা দেয়।

উনিশ বছর আমি ভাবনাবিহীন মানুষের মধ্যে কাটিয়েছি ধারণার রঙিন-উর্দিপরা একটা পরিবেশের মধ্যে। তাদের বিশেষ অভিব্যক্তি আমাকে খুশি করতে পারেনি, শরতের বিষণ্ন দিনেরই মতো নিরানন্দ আর একঘেয়ে মনে হয়েছে।

অথচ আমি দেখেছি এইসব মানুষই তাদের প্রিয় ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদেরকে এমনভাবে কষে বেঁধেছে যে তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেছে, সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এটা কোনো বুদ্বুদ নয়, বরং তাদেরই শক্তির ওপর মুষ্টিবদ্ধ একটা বাহু।

১৯০৭ আর ১৯১৪ সালে জনতাকে এত সহজে তাদের বিশ্বাস হারাতে দেখে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম, নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কিছু একটার অভাব আছে, যে অভাবটা ওদের মধ্যে বরাবরই ছিলো। সেটা কি ? প্রাকৃতিক কোনো বিচ্যুতি যা ওদের মনগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, নাকি সৎভাবে বাঁচার প্রবৃত্তি ?

মনে হলো, হ্যাঁ, এটার মধ্যে যেন একটা সত্যের আভাস পাচ্ছি। সৎভাবে বাঁচার প্রবৃত্তি এমনই একটা জিনিস যার অভাব জনগণ অনুভব করতে পারে। আমার সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যেও এই অভাবটা লক্ষ্য করেছি। ওদের প্রত্যয়, ওদের যে মুখ্য উদ্দেশ্য— পার্টির প্রতি গভীর আনুগত্য, এর সঙ্গে ওদের জীবনে একটা অসংগতি রয়েছে। এই অসংগতিটা বিশেষভাবে নগ্ন হয়ে প্রকাশ পেলো পার্টি-জীবনের নিয়মশৃঙ্খলা আর একই প্রত্যয়ে বিশ্বাসী জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমে, অবশ্য ভিন্ন পথে, নানান ভঙ্গিতে। এর সবচেয়ে যেটা জঘন্য সেটা হলো ভণ্ডামী।

হ্যাঁ, এরপর আমার আর বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না কারণটা কি। অবশ্য আমি জানি, ওদের অনেকেরই সৎভাবে বাঁচার প্রবৃত্তির অভাবটাকে পালটানোর কোনো সুযোগ ছিলো না, আজও নেই। কিন্তু যাঁদের লক্ষ্য ছিলো জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলা, জনগণকে সুশিক্ষিত করে তোলা, তাঁরা যদি ভেবে থাকেন যে সংগ্রামে সবরকম নীচতারই স্থান আছে, তাহলে ভুল করেছেন। না, এই ধরনের কোনো প্রবৃত্তি জনগণকে সসম্মানে বাঁচার ইচ্ছাকে কখনই উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে না।

* * *

অন্যদিকে, হতে পারে, এমন একটা সময় আসে যখন সর্বাকিছু নীচতা, যাকিছু অন্যায়, এ পৃথিবীর যাকিছু অশুভ, তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় থাকে না—নিদেনপক্ষে হতাশা, আর আতঙ্ক থেকে ফিরে আসার একটা উপায়। কিন্তু আশ্চর্য, কোনোকিছু কিংবা অন্য কারুর সঙ্গে আমার নিজের কোনো যোগাযোগ-সেতু গড়ে তুলতে পারিনি। পারিনি এ কথা সত্যি, ফলে যাকিছু বলতাম সবটাই কেমন যেন নিষ্পাপ জবাবদিহির মতো মনে হতো।

তাসত্ত্বেও আমি জানি নিজেকে ক্ষমা করার মতো সামান্যতমও কোনো কারণ নেই। না, এটা আমার গর্ব নয়, বরং একজন মানুষের হতাশা, যে তার জীবনকে দুঃসাধ্যভাবে বিধ্বস্ত করেছে। তার মানে এই নয় আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাইঃ হ্যাঁ, আমি অন্যায় করেছি, আমিঅপরাধী, কিন্তু তোমরা ? তোমরা তো আমার চেয়ে শক্তিশালী, তাহলে যাও, গিয়ে খুন করো ! আমি কাঁদার কোনো তাগিদই অনুভব করছি না, কাঁদার মতো এখানে কেউ নেইও। জনগণকে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই, ওদের জন্যে আমার কোনো অনুভূতিই কাজ করছে না। সততা প্রমাণ করার এইসব অবচেতন প্রচেষ্টা আমাকে আসল জিনিসটা আবিষ্কার করতে কেবল বারবার বাধাই দিয়েছে, যা আমি উদগ্রীব হয়ে খুঁজছিঃ কেন আমার বুকের মধ্যে কোনো শব্দ নেই, না চিৎকার না কোনো কান্না, কিংবা এমন কিছু যা বিদ্রোহের মাঝপথে আমাকে এমন স্তব্ধ করে দিয়েছে ? কেন আমি নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে পারছি না ? যদিও আমি অপরাধীর স্তরেই নিজেকে নামিয়ে এনেছি, তবু কেন সত্তার গভীরে আমি অপরাধের ভারি বোঝাটাকে অনুভব করতে পারছি না ?

আমার এই লেখাটুকুর যদি কোথাও কোনো উদ্দেশ্য থাকে তা কেবল একটা প্রশ্নেরই সমাধান করাঃ সেটা কি যা অপুনঃ বুদ্ধভাবে আমাকে এমন ভেঙে দু-টুকরো করে দিলো ? আগেই বলেছি কি নির্মমভাবেই না আমি এর জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি ! পুলিসের বিশ্বাসঘাতকতায় বিভ্রান্ত হয়ে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমি ধরিয়ে দিয়েছি, তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে ঠেলে দিয়েছি, দুর্লভ নৈতিক চরিত্রের জন্যে যাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ, তার অক্লান্ত উদ্যম, তার উৎসাহ আর উচ্ছল হাসি-খুশি স্বভাবের জন্যে যাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করতাম। সেবার কারাগার থেকে পালিয়ে তৃতীয়বারের জন্যে গোপন অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছিলো। আমি তার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে ওঠে কিনা দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছি। না, তেমন কিছুই হয়নি।

সেদিন সিমনভ বললেন, 'আপনি কি মস্কো কিংবা পিটারসবুর্গে বদলি হয়ে যেতে চান ? এখানকার জল তো দেখছি দিন দিন শুকিয়ে আসছে। আমি সম্ভবত খুব শিগগিরই ওই দুটো শহরের কোনো একটায় বদলি হয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, পিওতর ফিলিপোভিচ, আপনি কেন ভাবছেন যে এখানে ভালোভাবে কাজ করতে আমার অসুবিধে হচ্ছে ?'

স্বভাবতই সেই মুহূর্তে উনি কোনো জবাব দিলেন না। প্রথমে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ছাদের দিকে মুখ তুলে সারা ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার করে ছাড়লেন।

'আমি কিছুই ভাবিনি। আপনি যেমন অর্থ-লোলুপ নন, তেমনি আপনার মধ্যে উচ্চাশা বলেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কারুও ওপর প্রতিশোধ নিতে চান বলেও তো মনে হচ্ছে না। মোটের ওপর আপনার মনটা খুব ভালো,' নিজের কথাগুলো ওজন করে দেখার ভঙ্গিতে উনি মুচকি মুচকি হাসলেন। 'সত্যিই আপনি ভারি অদ্ভুত ! এ কথা আপনি এর আগেও কয়েকবার জিগেস করেছেন এবং আমি তার জবাবও দিয়েছি। আচ্ছা, আপনার মাথায় কি কোনো ছিট আছে ? কিন্তু কই, তাও তো মনে হয় না ! নিজের সম্পর্কে আপনি কি কিছু ভেবেছেন ?'

তখন আমি নিজের সম্পর্কে ওঁকে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম। উনি মন দিয়ে শুনলেন, শুনলেন আর একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চললেন। আমার বলা শেষ হবার পর শান্ত স্বরে উনি বললেন, 'রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। এই জঘন্য বুদ্ধিজীবীরাই আপনাকে ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে। এভাবে চললে কোন্ দিন হয়তো আমাকেই খুন করে বসবেন। আর করতেই বা বাকি রেখেছেনটা কি ? কেবল একটা জিনিস—কাউকে যদি সত্যিই খুন করতে পারেন তবেই হয়তো চিৎকার করে উঠতে পারবেন।'

হঠাৎ পকেট থেকে মদের চ্যাপটা একটা বোতল বার করে আলোর সামনে তুলে ধরলেন, তারপর আমার দিকে পেছন ফিরে খানিকটা গলায় ঢেলে দিলেন। এর আগে উনি আর কখনও এমন করেননি। অনেকক্ষণ ধরে ওঁকে ঠিক ওইভাবে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার ?'

ধীরে ধীরে সিমনভ ঘুরে দাঁড়ালেন, মদের বোতলটা পকেটে ভরে টেবিলের সামনে এসে বসলেন, তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরালেন।

'এ সবকিছুই আপনার মন-গড়া, কারাঝিন, এটা একটা মানসিক দুর্বলতা।' 'একটু বিরতির পর আবার কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়ে দিয়ে উনি অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'আমি জানি, এগুলো কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার ফলশ্রুতি, তা ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ একদিন আমিও এ রকম করতাম। বিছনায় শুতে যাবার পর ঘুমতে পারছি না, কখনো নিজেকে কল্পনা করছি একজন ভয়ঙ্কর ধরনের দুর্বৃত্ত, কখন মুক্ত-পুরুষ। সত্যি, সে ভারি মজার ব্যাপার ! সবচেয়ে ভালো বাসতাম অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রজালের খেলা দেখাতে,' সিমনভ মুচকি মুচকি হাসলেন। 'নিজেকে কল্পনা করতাম বিখ্যাত একজন জাদুকর হিসেবে। আমি যখন সুসজ্জিত মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়িয়েছি, সামনে কেবল দেখতে পাচ্ছি সারি সারি কালো মাথা। ব্যাপারটা একবার মনে মনে কল্পনা করার

চেষ্টা করুন। পরনে সুন্দর ঢিলে পোশাক, কিন্তু কোথাও কোনো পকেট নেই। হঠাৎ আমার হাতের তালুর ওপর দেখা গেলো একটা পাতিহাঁস। হাঁসটাকে আমি নিচে নামিয়ে দিলাম। ওটা মঞ্চের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর প্যাক প্যাক করে ডাকছে। ডাকতে ডাকতেই হাঁসটা একটা ডিম পাড়লো, ডিমটা ফাটতেই ওটা থেকে বেরিয়ে এলো ছোট্ট ফুটফুটে একটা শূয়োর ছানা। হাঁসটা আর একটা ডিম পাড়লো, ওটা থেকে বেরিয়ে এলো একটা খরগোশ, তার পরেরটা প্যাঁচা, এই রকম আরও কত কি—পর পর দশটা ডিম। দর্শকদের প্রতিক্রিয়াটা একবার কল্পনা করুন! সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখ রগড়াচ্ছে, চশমার ভেতর দিয়ে জুল জুল করে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—এ কথায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে! হঠাৎ আমার কাঁধের পাশ থেকে আর একটা মাথা গজিয়ে গেলো। আমি একটা মুখ দিয়ে সিগারেট টানছি, কিন্তু কোনো মুখ দিয়েই ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, ধোঁয়া বেরুচ্ছে গোড়ালি দিয়ে। সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে হঠাৎ কোত্থেকে শুয়োরছানাটা ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠলো খরগোশটা, প্যাঁচাটা ঘাড় ঘুরিয়ে দর্শকদের দিকে কটমট করে তাকালো—আর দর্শকদের চোখ ছানাবড়া। অবস্থাটা ভাবুন একবার··' আরক্ষাবিভাগের প্রধান, বিপ্লবের বিরুদ্ধে একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, পিওতর ফিলিপোভিচ সিমনভ তাঁর অর্ধ নিমীলিত চোখদুটো আমার মুখের দিকে মেলে দিলেন। '···একজন মানুষও জনতার সঙ্গে কিভাবে প্রতারণা করতে পারে!'

ওঁর উদ্ভট খেয়ালের কথা শুনে আমি বোকা বনে গেলাম। উনি তো মাতাল হননি, শুনেছি প্রচুর পান করলেও উনি কখনও মাতলামি করেন না। তাই আমি সত্যিই অবাক না হয়ে পারলাম না। 'তাহলে ঘুম না হলে আপনি শুয়ে শুয়ে এইসব কল্পনা করতেন?'

'হ্যাঁ। আর তা যখন-তখন, হঠাৎই হানা দিতো আমার মনের মধ্যে। একদিন আমি অফিস ঘরে বসে একটা দরকারী বিবরণ লিখছি, হঠাৎ কি খেয়াল হলো—ওদের সঙ্গে আমার নামটাও যোগ করবো। সাংকেতিক ভাষায় লিখতে শুরু করলাম—লিখছি তো লিখছিই। শেষে যখন খেয়াল হলো, আগুন জ্বেলে কাগজটা পোড়াতে শুরু করলাম, দেখলাম আমার চোখের সামনে পুড়ে যাচ্ছেঃ সিমনভ, সিমনভ, সিমনভ···তখন আমি নিজেকেই জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার, তুমি কি অসুস্থ, নাকি ভয় পেয়েছো?'

ওঁর চোখদুটো দেখলাম কি যেন একটা অস্থির উন্মাদনায় ঝিকমিক করছে, মুখে অজানা একটা অভিব্যক্তি। বুকের মধ্যে অস্পষ্ট একটা আশা নিয়েই হঠাৎ জিগেস করে বসলাম, 'যা বলতে চান তা কি এই সব?'

চমকে উঠে উনি আমাকেই পালটা প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে! কি বলতে চান আপনি?'

অদ্ভুত ভাবে উনি মারা গেলেন। সেদিনও অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দুজনে বসে বসে গল্প করেছি, কোথাও কোনো অসংগতি লক্ষ্য করিনি, অথচ পরের দিন বিকেল চারটে নাগাদ বাগানে ওঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলো।

সেদিন কমরেড বাসভ মাথায় পটি-বাঁধা একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমাকে জিগেস করলেন, 'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন, কারামোরা ?'

আমি ওঁকে ঠিক চিনতে পারলাম না, তবে মনে হলো আমারই পরিকল্পনায় কারাগার থেকে যে তিনজন পালাতে পেরেছিলেন, উনি হয়তো তাঁদেরই একজন।

বাসভ হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন আমি ইতিমধ্যেই পুলিসের হয়ে কাজ করছি কি না। সম্ভবত উনি কারাগার থেকে পালাবার পরিকল্পনাটার প্রতিই ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু পুলিসের নথিপত্র দেখলে বুঝতে পারতেন প্রশ্নটা নিতান্তই নিরর্থক। প্রায় আধ ঘণ্টা ওঁরা ছিলেন এবং নিরপেক্ষ বিচারকের ভঙ্গিতে এমন সব কথাবার্তা বললেন, যেন ও'রা ধরেই নিয়েছিলেন ওঁদের ধারণাটা অভ্রান্ত। তারপর ওঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সম্ভবত ওরা আমাকে বাঁচার সুযোগ দেবে। ভীষণভাবে জানতে ইচ্ছে করে আমার এই জীবনটাকে নিয়ে আমি কি করবো। দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ জীবনটাকে মানুষের ইচ্ছা শক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে, না কি মানুষ জীবনের পায়ে বশ্যতা স্বীকার করবে ?

হ্যাঁ, পুলিসের হয়ে কাজ করাটা এক ধরনের বিলাসিতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া। বন্ধুদের হয়ে কিছু করবো, কারাগার থেকে তাদের পালাতে সাহায্য করবো। নির্বাসন থেকে মুক্তি দেবো, গোপনে ছাপাখানা খুলবো, প্রচুর প্রচারধর্মী সাহিত্য সংগ্রহ করবো—নিশ্চয়ই, এ এক ধরণের আনন্দ বইকি। কিন্তু আমার এই দ্বৈত-ভূমিকা, পুলিসের আস্থা অর্জন করার পর তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা নয়। না, এটা নিতান্ত একটা বৈচিত্রের জন্যে। কিন্তু বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে ওরা আমাকে যতটা না সাহায্য করে, তার চাইতে বেশি সাহায্য করে কৌতূহলের মনোভাব নিয়ে।

*　　　*　　　*

বিজ্ঞানে বলে চোখের মধ্যে এমন একটা স্বচ্ছ পদার্থ আছে, যা দিয়ে সবাই দেখতে পায়, মানুষের মনের মধ্যেও তেমনি একটা কিছু পদার্থ থাকা উচিত। এর অবাভটাই যাকিছু বিভ্রান্তির মূল।

*　　　*　　　*

সৎভাবে বাঁচার স্বভাব ? এটা বিশ্বস্তভাবে সংবেদনশীলতার স্বভাব এবং সম্ভবত সেই সংবেদনশীলতার পূর্ণ প্রকাশ তখনই সম্ভব, তাপস হয়ে জন্মাবার আগে সে যদি নিজেকে সুসজ্জিত করতে পারে, কিংবা অন্ধ-হৃদয় হয়ে না জন্মাতে পারে। হয়তো দৃষ্টিহীনতা নিজেই তপস্বীতা।

*　　　*　　　*

সবকিছু আমি লিখিনি আর যাকিছু লিখেছি তার সবটা হয়তো লেখা উচিত ছিলো না। সে যাই হোক, মোটের ওপর আমি আর লিখতে চাই না।

সারাটা বন্দীশালা এখন 'আন্তর্জাতিক' গাইছে। ঢাকা যাতায়াতের পথে প্রহরীটাকে আমি মৃদুস্বরে সেই গান গাইতে শুনছি। কেনই জানি হঠাৎ আমাদের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্যা, কমরেড তেসিয়া মিরনোভার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। এমন রূপসী, এমন সুন্দর মিষ্টি চেহারা, অথচ দৃঢ় সংকল্পের মেয়ে আমার চোখে আর কখনো পড়েনি। আচ্ছা, ওর কথা হঠাৎ এখন আমার মনে পড়লো কেন ? আমি তো পুলিসের কাছে ওকে

ধরিয়ে দিইনি। ভাবনার প্রবাহগুলো বহে চলেছে—অবিরাম, অশান্ত ধারায় বহে চলেছে।

আচ্ছা, যে লোকটা সত্যকে দেখতে পেয়েছিলো, আমি যদি সত্যিই সেই অর্বাচিন হই. তাহলে কি হবে ?

'সাম্রাজ্ঞী যে নগ্ন—সেটা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না ?'

ওই যে, ওরা আবার আসছে। নাঃ, ওদের নিয়ে আমি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

১৯২৪

হঠাৎ কুয়াশা

ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পর টিকালো নাক লালচে মাথা নেড়ে ডাক্তারবাবু যখন বেশ জোরালো গলায় গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন অসুখটাকে দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলা করা হয়েছে এবং এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, ইগর বিকভের মনটা তখন ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো, মনে পড়লো তার তরুণবেলার দিনগুলোর কথা। তখন রঙরুট, তুরস্ক যুদ্ধের সময় ইয়েনি-জাগরার ঘন জঙ্গলে পিচ-ঢালা অন্ধকার রাতে ও ওত পেতে রয়েছে আর আকাশ ঝামরে অঝরে বৃষ্টি ঝরছে, ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ, শরীরের হাড় পর্যন্ত ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে।

বিষণ্ণ চোখ তুলে ও তাকালো। 'তার মানে আমি খুব শিগগিরই মারা যাবো, ডাক্তার বাবু ?'

গম্ভীর মুখে টেবিলের সামনে ওষুধের নাম লিখতে লিখতে ডাক্তারবাবু দু-চারবার কলমটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন। বিকভ তার ক্ষীণ করুণ চোখের দৃষ্টি জানলার দিকে ফিরিয়ে নিলো। অদূরে রাস্তার বুক থেকে এলোমেলো হাওয়ায় পাখির নোংরা পালক, কামানো-চুল আর ধুলো উড়ে আসছে।

'এক সময়ে অত্যন্ত বেশিই মদ পান করেছেন !'

'ওটা কোনো কারণই নয়', ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে কথাটা বলে বিকভ মুখ ফেরালো। 'কত লোকেই তো কাঁড়িকাঁড়ি মদ গিলছে, তা বলে সবাই কি এত অল্প বয়েসে মারা যাচ্ছে ?'

থমথমে গম্ভীর গলায় ডাক্তার বললেন, 'সবাই না মারা গেলেও, আপনি যাবেন। আপনার সারাজীবন ধরে কঠোর শ্রমে গড়ে ওঠা এই যাকিছু সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে ?'

আর কোনো কথা না বলে ডাক্তারকে নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে বিকভ খালি পায়ে চটিজোড়াটা গলিয়ে নিলো, তারপর ঢিলে বহির্বাসটা গায়ে চড়িয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। দামী আয়নায় স্বচ্ছ প্রতিফলিত হলো রুক্ষ বিশীর্ণ একটা মুখ, বিষণ্ন নীলচে দুটো চোখ। দু গাল বেয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বুকের কাছ পর্যন্ত নেমে আসা দীর্ঘ দাড়ি।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইগর বিকভ জানালার সামনে চামড়ায়-মোড়া নরম একটা আরামকুর্সিতে এসে বসলো। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, ডান দিকের ফুসফুস থেকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, কেমন যেন দুর্বল লাগছে।

'আমি না হয় একটু বেশিই পান করেছি,' নিচে, ফটকের সামনে ডাক্তারকে তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে দেখে বিকভ বিশ্রী মুখভঙ্গি করে ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'কিন্তু মূর্খ, তুমি এখানে এসে আমার কোন্ কামেটা লাগলে ?'

'চায়ের কেটলিটা কি এখানেই রাখবো ?'

বিকভ তাকিয়ে দেখলো বেঢপ মোটা দেখতে, বোকা বোকা চাহনি, রাঁধুনি আগাফিয়া ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে দেখেই বিকভ রেগে উঠলো। 'পেট-মোটা জালা কোথাকার, তোমাকে কতবার না বারণ করেছি এই আরামকুর্সি'টাকে কখনও জানলার সামনে রোদ্দুরে রাখবে না, সেই রেখেছো ? তোমার কি ধারণা রোদ্দুরে আসবাবপত্রের জেল্লা বাড়ে ?'

'কুর্সিটা কিন্তু আপনিই জানলার ধারে সরিয়ে রেখেছেন ইগর।' আগাফিয়া শান্ত স্বরে জবাব দিলো।

এত ভারি কুর্সিটা তার পক্ষে কি করে সরানো সম্ভব ভাবতেই বিকভ অবাক হয়ে গেলো, তার ওপর ওর শান্ত মোলায়েম কণ্ঠস্বর তাকে আরও উত্ত্যক্ত করে তুললো।

'বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে !'

চায়ের কেটলিটা টেবিলের ওপর রেখে আগাফিয়া চলে গেলো। ওর গমন পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে বিকভ ভাবলো, 'ও এখনও আরও চল্লিশ বছর ধরে বাঁচবে, অথচ আমাকে এই অকালে মরতে হবে ! আমার এই অঢেল ধনসম্পদ কি হবে ? নানান ব্যস্ততার মধ্যে বিয়েটাও করতে পারলাম না ! সত্যি যুদ্ধের পরেই আমার বিয়ে করা উচিত ছিলো, তাহলে এত দিনে ছেলেপুলেরা সব বড় হয়ে যেতে পারতো। অদূরদর্শীতার জন্যেই হয়ে উঠলো না। এখন তার আর সময়ও নেই। তাছাড়া কে জানতো যে জীবনের শেষ দিনগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসবে ?'

মাথাটা ঝুঁকে এসেছে বুকের কাছে, অস্ফুট যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠলো, 'উঃ, ভগবান !'

যে জিনিসটা তার সবচেয়ে খারাপ লাগে, তাকে উত্ত্যক্ত করে তোলে—কুড়ি বছরের দীর্ঘ শ্রমে গড়ে-তোলা এই বিপুল সম্পদ কারুর হাতে তুলে দিয়ে যাবার মতো আর কেউ নেই। হয়তো মঠ কিংবা এই ধরনের পবিত্র কোনো সংস্থাকে সে দান করে যেতে পারে। কিন্তু পুরোহিত আর সাধুসন্ন্যাসীদের সে হাড়ে হাড়ে চেনে, ঈশ্বরের নামে বজ্জাতি তাদের মজ্জায় মজ্জায়। সেদিক থেকে ওরা তার চাইতেও কম পাপী নয়। তাছাড়া কেমন যেন ক্লান্ত একটা অনুভূতি ছাড়া ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস তার কোনো কালেই তেমন জোরদার ছিলো না। তার বরাবরের ধারণা ঈশ্বর তার সব কাজ, সমস্ত রকম ভাবনার সঙ্গে ভীষণ ভাবে পরিচিত, যিনি চিরটাকাল খুব কাছ থেকেই লক্ষ্য করেছেন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই যে অর্থলিপ্সা, এর জন্যে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কেউ আর কখনও তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেনি। অথচ একটা সময় ছিলো যখন কিছু কিছু জিনিস সে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে পারতো। কিন্তু হঠাৎ ছোট্ট একটা অগ্নিশিখা দীপ্ত স্ফুলিঙ্গের মতো তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, পাপ বোধ, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিও তার অস্পষ্ট কুয়াশার মতো কেমন যেন চোখের নিমিষে মিলিয়ে গেলো।

বিকভ স্পষ্ট বুঝতে পারলো—শয়তান নয়, ঈশ্বরই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করিয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে কিছুটা বিদ্রূপ, কিছুটা বিক্ষোভ মেশানো সুরেই সে কুঁজো পিঠ, সবসময়েই যে তার পেছনে আঠার মতো লেগে

থাকে, ভীরু অথচ বিশ্বাসী, পাখির মতো কুতকুতে চোখ, বুড়ো কিকিনকে বলতো, 'কেন, কিসের জন্যে আমি মানুষকে দয়া দেখাতে যাবো ? কেউ আমাকে কোনোদিন দয়া দেখিয়েছে ? কেউ না !'

হঠাৎ কিকিনের কথা মনে পড়তেই বিকভ ঝুলঝাড়ুটা নিয়ে ছাদের সিলিং-এ কয়েক বার জোরে ঠকঠক শব্দ করলো। এর দু তিন মিনিট বাদই বাঁকা পায়ে রাজহাঁসের মতো হেলেদুলে কুঁজো কিকিনকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা গেলো।

অসুস্থ মোরগের মতো চোখ পিটপিট করতে করতে কিকিন জিগেস করলো, 'কি বলছো ?'

'আমি মারা যাচ্ছি, শুনেছো ?'

দাড়ি-গোঁফহীন পরিষ্কার মুখে হাত বোলাতে বোলাতে ও বোকার মতো হাসলো, 'না না, ডাক্তার তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

'না। আমি নিজেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'হুঁ ! বড্ড তাড়াতাড়ি…'

'সেইটাই তো হয়েছে সবচেয়ে মুস্কিল ! মরি তাতে ক্ষতি নেই, মৃত্যুকে তো আর কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না…তাছাড়া আমি সৈনিক। কিন্তু এই এত সম্পত্তি নিয়ে করবোটা কি ?'

ঘরের মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে কিকিন টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর চা ছাঁকতে ছাঁকতে বললো, 'আইনত তোমার যাকিছু সম্পত্তি সব তোমার বোনপো ইয়াকভ সমোভই পাবে।'

'হ্যাঁ, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, ও আমার বোনপোই বটে !' বিকভ চাপা স্বরে গর্জে উঠলো। আর তখনই বুকের ডান পাশ থেকে তীব্র একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। 'স্বভাব-চরিত্র তো দূরের কথা, দু চারবারের বেশি ওকে আমি চোখেই দেখিনি।'

চায়ের পেয়ালা নিয়ে কিকিন ফিরে এলো। 'তবু, আইনত তারই পাওনা।'

'আইনত !' ঘৃণায় ভ্রূ-কুঁচকে বিকভ ভীষণ চোখে তাকালো।

'এক্ষেত্রে কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে… '

'আরে না না, বেনাবনে মুক্তো ছড়াতে যাবো কোন্ দুঃখে !'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে অবশ্য কথাটা ঠিক।'

একটু থেমে বিকভ কি যেন ভাবলো। তারপর মনের মধ্যে রাগটা একটু থিতিয়ে আসার পর সে কুঁজো কিকিনকে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি বরং কালই ইয়াকভের সঙ্গে একবার দেখা করে ওকে এখানে আসতে বলো, আগে আমি নিজে চোখে দেখবো ওটা কি ধরনের জন্তু তৈরি হয়েছে।'

* * * *

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় ইয়াকভ সমোভ দেখা করতে এলো। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে না দিলেও, সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে ও অভিবাদন জানালো।

'কেমন আছেন ?'

খুব জোরে না বললেও, কাটাকাটা বেশ স্পষ্ট ওর কণ্ঠস্বর। খুব যে একটা লম্বা তা

নয়। ছিপছিপের ওপর সুঠাম পাকানো শরীর, কোমল নীলাভ দুটো চোখ। এলোমেলো ঝাঁকড়া ঘন চুল, সুন্দর বাঁকানো গোঁফ। বিকভ স্পষ্টই বুঝতে পারলো ওর চরিত্রে ঋজু, আকর্ষনীয় একটা ভঙ্গি রয়েছে। তবু তার সহজাত সন্ধিগ্ধ মন বললো, 'আহা, কি মুখের ছিরি, ঠিক যেন বেশ্যাদের দালাল!'

যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে ওঠা চোখে বিকভ বোনপোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। পোশাক পরিচ্ছদে ওর দৈন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। নীল রঙের খাটো একটা কুর্তার ওপর ধূসর রঙের পাজামা পরেছে, পায়ে একজোড়া জীর্ণ বুট। এত কিছু লক্ষ্য করা সত্ত্বেও বিকভ স্পষ্ট অনুমান করতে পারলো না ওর বয়েস কত, কি করে। প্রশ্ন করে ওর মুখ থেকেই জানতে পারলো—বছর উনিশ বয়েস। প্রথমে গির্জায় সমবেত সংগীত গাইতো, এখন একটা কাঠগোলায় বিক্রয়িক। মাছধরা আর বই পড়ায় দারুণ নেশা। ওর কথাবার্তা শুনে বিকভ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবলো, ব্যাটা যেন গির্জায় স্বীকারুক্তি করতে এসেছে। সব মিথ্যে। ঠিক বুঝতে পেরেছে কেন আমি ওকে ডেকেছি, অমনি এখন ভালোমানুষ সাজার ভান করছে!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঁকা হেসে বিকভ বললো, 'আমি মরতে চলেছি।'

শোনা গেলো মৃদু অথচ ভরাট একটা কণ্ঠস্বর, 'একথা কেন বলছেন?'

'কেন বলছি?' বিকভ মনে মনে চটে উঠলো। 'যেহেতু আমি খুব অসুস্থ বলে।'

পরমুহূর্তেই মনে মনে ভাবলো, 'কিরে বাবা, ছেলেটা গাধা নাকি!'

'কিন্তু সব অসুস্থতা থেকেই সেরে ওঠার উপায় আছে।' প্রত্যয়-দৃপ্ত নিটোল স্বরে ইয়াকভ এমনভাবে কথাগুলো বললো যে বিকভ মনে মনে চমকে উঠলো। 'যেমন ধরুন গাজরের রস। গত বছর আমার যক্ষ্মা হয়েছিলো। গির্জায় মূল-গায়েনের বৃদ্ধা মা আমাকে রোজ সকালে খালি পেটে এক গেলাস করে গাজরের রস খেতে বলেছিলেন। আমি তাই করেছিলাম, এখন বেশ ভালোই আছি।'

এক টুকরো মিষ্টি হেসে ইয়াকভ গলার চারপাশে হাত বোলালো। বিকভের মনে হলো ওর কথা শুনেই তার বুকের যন্ত্রণা যেন অর্ধেক কমে গেছে।

'ও, গত বছর তোমার বুঝি যক্ষ্মা হয়েছিলো? কিন্তু আমার যে অন্য অসুখ...'

'যক্ষ্মাটাও তো একটা অসুখ। আপনি নিশ্চয়ই এক গেলাস করে গাজরের রস কিংবা মদের সঙ্গে অশ্বমূলা-বাটা মিশিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন। গাজরের চেয়ে অশ্বমূলা অনেক ভালো। কেননা ওতে শোরা আছে। আর শোরা শরীরের ক্ষয় রক্ষা করার পক্ষে খুব উপকারী। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, শরীরের ক্ষয় থেকেই যত রোগের উৎপত্তি।'

ঝুরঝুরে বালির মতো একটা একটা করে খসে-পড়া কথাগুলো যেন বিকভের ক্ষতের ওপর একটা স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিলো। ও অবাক হয়ে জিগেস করলো, 'তুমি এত সব জানলে কেমন করে?'

আন্তরিক ভঙ্গিতে উৎসাহিত হয়ে ইয়াকভ বললো, 'আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে···ও খুব শিক্ষিত, এসব নিয়ে পড়াশোনাও করেছে প্রচুর।'

'ও এখন কোথায়?'

'আত্মহত্যা করে মারা গ্যাছে।'

'সেকি ! কেন ?'

'ব্যর্থ প্রেমে আঘাত পেয়ে···'

'আত্মহত্যা কিন্তু এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা ।'

'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক ধরনের ঋজুতাও বলতে পারেন ।'

'তার মানে ?'

'ঋজু তার নিজের ভাবনার কাছে । অন্তত কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হবে না ।'

'হুঁ, তা অবশ্য ঠিক ।' মুখে বললেও বিকভ মনে মনে ভাবলো, 'নাঃ, বয়েস অল্প হলে কি হবে, ছেলেটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত !'

এই ধরনের খুব সাধারণ কিছু আলাপ আলোচনার পর দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ইয়াকভ উঠে পড়লো । তারপর অত্যন্ত শোভন ভঙ্গিতে বিদায় নিয়ে চলে গেলো ।

ইগর বিকভ তার আরামকুর্সি'র মধ্যে তালগোল পাকিয়ে বসে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতে শুরু করলো । একটানা দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আচ্ছা, কি নিয়ে যেন এতক্ষণ কথাবার্তা হলো ? নাঃ, ছেলেটা সত্যিই অন্য ধরনের। চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন তো দূরের কথা, তার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা একবারও উল্লেখ করলো না, একবার মামা বলে ডাকলোও না । কিন্তু তার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা অজানা থাকার কথা নয় । হয়তো এটাও ওর এক ধরনের নিপুণ অভিনয় । ওকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না ।

এতক্ষণ ধরে গুদমঘরে গাঁটগাঁট পাটের হিসাবপত্তর বুঝে নিয়ে কিকিন ফিরে এলো। ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে গেছে । ক্লান্ত বাঁকানো পাদুটো ঘষতে ঘষতে টেনে এনে টেবিলের সামনের চেয়ারটায় থপ করে বসে পড়লো । 'সনোভ এসেছিলো ।'

'হ্যাঁ ।'

'কেমন মনে হলো ?'

'একবার দেখেই বলা মুশকিল । তবে দেখে বেশ সরল বলেই মনে হলো ।'

কিকিন কেটলি থেকে চা ঢাললো, বড় একটুকরো রুটি মুখের মধ্যে পুরে গোগ্রাসে চিবুতে শুরু করলো ।

বিকভ এবার কুর্সি'তে সোজা হয়ে বসলো । 'তবে সত্যি বলতে কি জানো, ওদের সরলতার ওপর ঠিক আস্থা রাখা যায় না...বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে। তাছাড়া যোগ্যতার প্রশ্নও আছে । লোকের ধারণা ঈশ্বর যাকে যেভাবে সৃষ্টি করছেন, তারা সেই ভাবেই বাঁচতে অভ্যস্ত । এর বাইরে যেতে ওরা ভয় পায় ।'

'তা অবশ্য ঠিক ।' ম্লান স্বরে কিকিন বললো । তাছাড়া বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোর জন্যে আজীবন যাকে নির্মম উপহাস সহ্য করতে হয়েছে, তার চাইতে বেশি করে মর্মে মর্মে কে আর এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে ।

চোখ বুজিয়ে ক্লান্ত স্বরে বিকভ জিগেস করলো, 'আচ্ছা, ইয়াকভ সমোত সম্পর্কে তুমি নিজে কিছু শুনেছো ?'

'কাঠগোলার মালিক, টিটভকে আমি জিগেস করেছিলাম, ও বললো—ছেলেটা খুবই পরিশ্রমী, তবে একটু যা ভাবপ্রবণ।'

'কি রকম, কি রকম ?'

'টিটভ সেটা খুলে বলতে পারলো না। আমি তখন গির্জার যাজককে ওর সম্পর্কে জিগেস করলাম, কেননা আমি জানতাম উনি প্রায়ই ইয়াকভের সঙ্গে মাছ ধরতে যান। উনি বললেন ছেলেটা খুবই ভালো, বদ-সঙ্গ বলতে কিছু নেই, হয়তো মাঝে মধ্যে দু চারজন গরীব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দু এক পাত্তর…'

'গরীব ছাড়া রাজা উজির বন্ধুবান্ধব ওর আর জুটছে কোথেকে ?'

'ও কিন্তু মেয়েদের পেছনে ঘোরে না, একা একা থাকতেই বেশি ভালোবাসে, আর সবার জন্যে প্রাণে ওর খুব দয়া মায়া।'

'দয়া মায়া !'

'হ্যাঁ।'

'সেটা ওর বয়েসের জন্যে। বেশ, তা না হয় বুঝলাম…কিন্তু তুমি যেভাবে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বেড়ালে, ও ঠিক বুঝতে পারবে কেন আমি ওকে ডেকেছি।'

'না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সেভাবে আমি কাউকেই কিছু জিগেস করিনি।'

একটু নিস্তব্ধতার পর কি যেন ভেবে বিকভ জিগেস করলো, 'কিন্তু এখন কি করা উচিত ? ধরে নিচ্ছি সব সত্যি, তবু ওর সম্পর্কে আমাদের আরও খোঁজ-খবর নিতে হবে। তুমি বরং ওকে আর একবার এখানে আসার কথা বলো, বলো যে ওকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা আমি একদম ভুলে গেছি।'

পর মুহূর্তেই ম্লান অস্ফুট যন্ত্রণায় বিকভ যেন আর্তনাদ করে উঠলো, 'কিন্তু সারা জীবন এই যে আমি গোলামি করেছি, বুকের মধ্যে পাপের পাহাড় জমিয়ে তুলেছি, এসব কার জন্যে ? ভিজে ন্যাতার মতো পুঁচকে একটা ছোঁড়ার হাতে তুলে দেবার জন্যে ?'

কুজো কিকিন কোনো কথা বললো না, কেবল গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মিটমিট করে তাকালো।

* * * *

ডাক্তারের থমথমে গম্ভীর মুখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিকভের অসুস্থতা যেন দিন দিন আরও বেড়েই চলেছে। ওর মনে হচ্ছে বুকের যন্ত্রণাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে, বিষণ্ন বিভ্রান্ত সারাটা মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে দেহের প্রতিটা অংশ যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

'কি ব্যাপার, খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

কিকিন কখনও জিগেস করলে ও দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয়, 'খুব ! এই প্রথম বার মরছি তো, তাই মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে এখনও ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।'

এই ধরনের ঠাট্টা করাটা তার চিরকালের অভ্যেস। কখনও বলে, 'বুঝলে কিকিন, আমি যদি তুমি হয়েও জন্মাতাম, তাহলে অন্তত এভাবে অকালে প্রাণটা খোয়াতে হতো না।'

কিন্তু যতদিন যাচ্ছে মনের সেই উচ্ছলতা হারিয়ে দিন দিন সে যেন কেমন মুষড়ে পড়ছে। এমন কি আজকাল কিকিনের সঙ্গেও হাসি-তামাশা করে না, সারাদিন ঘরের

এক কোণে আরাম-কুর্সিটার মধ্যে মুখ গুঁজে একা একা চুপচাপ পড়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে, 'কেন, কেন আমাকে এভাবে মরতে হবে?'

কখনও অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, 'ঈশ্বর, এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও...'

কিন্তু মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, সে লক্ষ্য করছে এই ধরনের উত্তেজনার পর তার যন্ত্রণাটা আরও তীব্রভাবে বেড়ে যায়। তখন সে উঠে পড়ে, উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দামী ঢিলে বর্হিবাসটা গায়ে চড়ায়! আয়নায় প্রতিফলিত হয় জীর্ণ বিশীর্ণ একটা দেহ, বিবর্ণ মুখ, ম্লান দুটো চোখ, কয়েদীদের মতো লম্বা ঘন দাড়ি। ক্লান্ত হাতে চিরুনিটা তুলে নিয়ে চুলটা আঁচড়ে নেয়। কখনও বা দাড়িতেও দু চারবার চিরুনি বোলায়। তারপর শ্লথ পায়ে ধীরে ধীরে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিচে অযত্নে লালিত আগাছায়-ভরা বিস্তীর্ণ একটা বাগান, ভারি ফটকের গায়ে হেলান দিয়ে দরোয়ানটা ঝিমুচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, এমন কি ফটকের ওপারে চওড়া রাস্তাটাও নির্জন। বাগানে পাখিপাখালির কিচির-মিচির ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।

আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বিকভ ভাবে, 'মানুষের হাতে গড়া এই যে বাড়িগুলো মাটির ওপর দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্মরণাতীত কাল পর্যন্ত এগুলো ঠিক এমনিভাবেই টিঁকে থাকবে, অথচ মানুষ, যারা এই বিশাল বিশাল বাড়িগুলো বানিয়েছে, রক্ত আর ঘামে যারা পৃথিবীকে এত সুন্দর করে গড়ে তুলেছে, তারাই কেবল মারা যাবে অল্প কয়েকটা দিন বাঁচার পরেই। কিন্তু কেন? কেন সেণ্ট জর্জের বীর সৈনিক, বণিকসঙ্ঘের অদ্বিতীয় পুরুষ ইগর ইভানভ বিকভ মাত্র পঞ্চাশটা বছরও বাঁচতে পারবে না? কেন, কেন তাকে এভাবে অকালে মরতে হবে? সে কি অনেকের চেয়ে বেশি পাপী? পাপী হলেই কি তাকে মরতে হবে?'

সন্ধ্যের পর ইয়াকভ সমভ এলে সে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। ওর কথা বলার ভঙ্গিতে তার মনের বিষণ্ন ভাবটা কেটে যায়, সে ওকে বোঝবার চেষ্টা করে! তখন আবার ছেলেটার প্রতি জ্বলন্ত একটা বিদ্বেষ বিকভের মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, কেননা ও তরুণ, এখনও দীর্ঘদিন বাঁচবে এবং অপরের শ্রমোপার্জ্জিত সম্পদ দুহাতে মুঠো মুঠো ভোগ করবে। ও হয়তো পাপ না করেই বাঁচবে। এটা কি অদ্ভুত, এটা কি অন্যায় নয়?

ইয়াকভ কিন্তু সমান আগ্রহ ভরে অদ্ভুত মজার মজার যত গল্প বলে যায়, আর বিকভ মাঝে মাঝে ওর অভিনব মাধুর্যে বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। তবু তার মনে হয় ছেলেটার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথায় একটা জটিল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। ফলে যথেষ্ট ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিকভ তার বোনপোটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারে না।

বিকভ মনে মনে ভাবে ওর স্বাভাবটাই বোধহয় ও রকম।

দু ঠোঁটের প্রান্তে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে ইয়াকভ বলে, 'সবাই যেভাবে বাঁচে সেভাবে বাঁচার কথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগে, অথচ অন্যভাবে বাঁচাটাও খুব কঠিন।'

'হয়তো তাই। কিন্তু সবাই তো আর সমান নয়।'

'যদি দেখার মতো চোখ মেলে দ্যাখেন, দেখবেন একটা ব্যাপারে সবাই কিন্তু সমান।'

'সেটা কি ?'

'নির্লজ্জের মতো' 'অপরের উপার্জিত শ্রমের ফল ভোগ করা।'

ঠিক এমনি কোনো মুহূর্তে বিকভ স্তব্ধ বিস্ময় থমকে যায়। সামনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ভাবে, 'খুবই ঠিক কথা ! তার ভাবনার সঙ্গে স্পষ্ট একটা মিল রয়েছে ! কিন্তু ও কি জানে না—বিকভেরই শ্রম লব্ধ ফলের ওপর নির্ভর করে ওকে একদিন বাঁচতে হবে ? সে কথা ও যদি এখনও বুঝতে না পেরে থাকে, তাহলে ও নির্বাধ !'

ইয়াকভের চরিত্রের সেই দিকটাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে বিকভ বলে, 'জীবন ঠিক যুদ্ধের মতো, তার আইনকানুনও খুব সাধারণ। সুযোগ হারালেই ঠকতে হবে !'

'কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষের জীবনে সেটাই তো সবচেয়ে বড় টোপ।'

'এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।'

ইয়াকভ কোনো জবাব দেয় না, কেবল ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসে।

সুকুমার মুখে ওর হাসিটুকু দেখে বিকভের মনে হয় কেমন যেন অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, যেন স্বেচ্ছায় জোর করে তাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওর স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবে, 'নিজেকে ও বড্ড বেশি চালাক মনে করে।'

বিকভের সবচেয়ে খারাপ লাগে কথার মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে, কি যেন জরুরী কথা ছিলো অথচ লজ্জায় বলতে না পারার ভঙ্গিতে চোখের পাতা নামিয়ে ওর জামার বোতাম খোঁটার বিশ্রী সম্ভাবটা।

নিটোল এই নিস্তব্ধতার মুহূর্তে, যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বিকভ রুক্ষ স্বরে চিৎকার করে ওঠে, 'কথাটা কি বললাম বুঝতে পারলে, নাকি পারলে না ?'

'পারলাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।'

'কেন ?'

'যেহেতু আমি ভিন্ন মত পোষণ করি।'

'সেই ভিন্ন মতটা কি ? পরিষ্কার করে খুলে বলো। চুপ করে রইলে কেন ?'

ইয়াকভ শান্ত স্বরে একই ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'দেখুন, আমি তর্ক করাটা পছন্দ করি না। তাছাড়া পারিও না। আমার ধারণা তর্ক করা মানে স্ববিরোধী ভাবনাগুলো কারুর ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও কেউ কথা না বলে সবাই চুপ করে থাকবে ?'

'না, সে কথা আমি বলতে চাইনি। সত্যকে খুঁজে পাবার জন্যে মানুষ সাধারণত যতটা না তর্ক করে, তার চাইতে বেশি তর্ক করে সত্যকে গোপন করার জন্যে। অথচ মানুষের জীবনে সত্য খুবই সরল, ছোট্ট শিশুর মতোই সরল—প্রতিবেশীকে সাধ্যমতো ভালোবাসা, তার বিরুদ্ধে তর্ক করাটাই সবচেয়ে জঘন্য।'

'কিরে বাবা, ও কি সন্ন্যাসী নাকি !' বিরক্ত হয়ে বিকভ মনে মনে ভাবে। অবজ্ঞায় মেশা তিক্ত একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার শীর্ণ দুটি ঠোঁটে। যদিও সে হাসিতে বুকের যন্ত্রণাটা তার বেড়েই ওঠে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তবু বলে, 'তুমি কি তোমার কাছের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে পারো, হতে পারো ছোট্ট একটা শিশুর মতো সরল ?'

আশ্লেষের তীব্র ঝাঁঝটুকু ইয়াকভের কান এড়িয়ে যায় না। তবু শান্ত স্বরেই ও বলে,

'না। যেহেতু অনড় দুঃখের হাত এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই, সেহেতু শিশুর শান্ত সরল জীবনেও আমরা ফিরে যেতে পারি না।'

'মূর্খ! শিশুরা যে কি ভয়ঙ্কর জীব, তা তো আর তুমি জানো না! কেন, রাস্তায় রাস্তায় দ্যাখোনি কি রকম অসভ্যের মতো ওরা মারামারি কামড়াকামড়ি করে?'

বোনপোটি কোনো জবাব দেয় না, আগেরই মতো ঠোঁট টিপে কেবল মুচকি মুচকি হাসে।

বিকভের পিত্তি জ্বলে যায়। তবু কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ভৎর্সনার সুরে বলে, 'ঠিক আছে। এখন যাও। আমি ভীষণ ক্লান্ত।'

* * * *

জানলার ধারে চুপচাপ বসে আকাশের দিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—দূরে ভেসে চলেছে আরক্ত মেঘমালা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তার মনও যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। তখন সে আবোল-তাবোল কত কি যে ভাবে, মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যায়। সবচেয়ে অবাক হয় যখন ইয়াকভ সমভের কথা মনে পড়ে।

'ছেলেটা শুধু অদ্ভুতই নয়, ঠিক যেন ছায়ার মতো। বোঝা যায় অথচ ধরা যায় না।'

কখনও ভাবে, 'যেভাবে ও ধীরে ধীরে নিঃশব্দে হাঁটে, সেটা অলস প্রকৃতির লক্ষণ। তবে ভদ্রলোকদের মতো ওর অল্প খাওয়াটা সে মনে মনে তারিফ না করে পারে না। আর যখন তন্ময় হয়ে কিছু ভাবে, ওর মুখটাকে মনে হয় মেয়েদের মতো কেমন যেন বিষণ্ন আর করুণ, হয়তো ওর কপালের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ ঝাঁকড়া চুলগুলোর জন্যেই ও রকম মনে হয়।'

কখনও রাগে বিকভের হাতের আঙুলগুলো আপনা থেকে মুঠো হয়ে যায়। শিশুর মতো সরল...অত সস্তা নয়! ওভাবে বাঁচার চেষ্টা করে দ্যাখই না একবার, তখন বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। না, ও বোকা নয়, হয়তো মনটা সত্যিই নরম···হয়তো বয়েস অল্প বলে বুকের ভেতরটা এখনও জমে শক্ত পাথর হয়ে ওঠেনি!'

চেনা অচেনা, কারুর সম্পর্কেই বিকভ যখন কিছু ভাবে, নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে যাচাই করে। আর তখনই দয়া-মায়াহীন নিষ্ঠুর কঠোর জীবনযাত্রার জন্যে তার নিজেরই ওপর নিজের করুণা হয়। যে নিজেও জানে, অন্যদের চাইতে ভিন্নভাবে বাঁচা কঠিন। তবু তার কাছে পাপ ছাড়া জীবন, মাখনবিহীন শুকনো রুটিরই মতো বিস্বাদ মনে হয়। পালকের নরম শয্যায় শুতে কে না চায়। তবু সব মিলিয়ে ইয়াকভ ছেলেটা কিন্তু খারাপ নয়, প্রসংসা করার মতো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ওর কিছু না কিছু আছেই! হাজার হোক বিকভের বংশের রক্তই তো বইছে ওর শরীরে!'

তবু কিকিন এলে বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বিকভ আশ্লেষের ভঙ্গিতে বলে, 'নাঃ ওকে দিয়ে আমার উত্তরাধিকারের কাজটা চালানো যাবে না দেখছি! বড্ড দেমাক। না, দেমাক ঠিক নয়, সাধুপুরুষ! বলে কি না আমাদের শিশুর মতো সরল হওয়া উচিত। শুনলে কথাটা একবার?'

কিকিন ভারিক্কি চালে বলে, 'ওটা বাইলের কথা।'

'কিসের কথা?'

'বাইবেলের। যেখানে যিশু···'

বুকের ডান পাশে হাত চেপে বিকভ ক্রুদ্ধ স্বরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'কিন্তু ঈশ্বরের বরপুত্র। কিন্তু আমি ইভান বিকভের পুত্র, একটা চাষার ছেলে। ওঁতে আমাতে অনেক তফাৎ। ঈশ্বরকে তো পাটের ব্যাবসা করতে হয় না, বাসও করতে হয় না আমাদের সঙ্গে ?

অসহ্য যন্ত্রণায় বিকভ কুর্সির হাতলদুটো শক্ত করে চেপে ধরে। 'ঈশ্বরের মতো যদি বাঁচতে হয়, যাও, জামাকাপড় খুলে নেংটি পরে মাথা মুড়িয়ে ফকির হয়ে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়ো। তাছাড়া ঈশ্বর মানুষের কোনো উপকার করতে পারে না, কিচ্ছু না !'

পাখির মতো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে কিকিন সতর্ক ভঙ্গিতে বলে, 'যিশুও একদিন তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্যে গেথেসমেনের উদ্যানে ঠিক এমনি ভাবে অভিযোগ করেছিলেন।'

'সে কথা আমি জানি। উনিও চাননি অকালে মরতে, আমি তো নিতান্তই সাধারণ মানুষ…' উত্তেজনায় ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বিকভ কি যেন ভাবে, কপালের ভাঁজে ফুটে ওঠে গভীর কয়েকটা বলিরেখা। 'কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারটা কি করা যায় বলো তো কিকিন ? এত পাপ, এত পরিশ্রম করে জমানো সম্পদ তো আর জলে ফেলে দিতে পারি না।'

সেই মুহূর্তে কিকিন কোনো জবাব দিতে পারে না। শীর্ণ বাঁকোনো হাঁটুদুটো শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নিচু করে গভীর কি যেন ভাবে। শেষে একসময়ে মুখ তোলে। 'দ্যাখো, আমি তোমার সামান্য কর্মচারী, আমার মুখে বলাটা ঠিক শোভা পায় না…তবু একটা কথা কিন্তু খুব ঠিক—ইয়াকভ যদি সম্পত্তি না পায়, কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে তুমি যদি সম্পত্তি দিতে না চাও, তখন কিন্তু বেওয়ারিস হিসেবে তোমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সরকারের হাতেই…'

বিকভ হেসে ওঠে। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন পথের ভিখিরি…'

'ঠাট্টা নয়, বিকভ ! ব্যাপারটা কিন্তু তাই-ই দাঁড়াবে।'

'খুব মজার, তাই না ?'

'কিন্তু কোনো উপায় নেই ..'

দুজনেই মাথা নুইয়ে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবে। ভাবে আর আপন মনে মাথা নাড়ে। শেষ পর্যন্ত কুঁজো কিকিনই একসময়ে বলে, 'তুমি বরং এক কাজ করো বিকভ, ইয়াকভকে এখানে এসে থাকার কথা বলো। তাহলে আরও কাছ থেকে ওকে ভালো করে লক্ষ্য করা যাবে, দরকার হলে কেমন করে ভদ্রভাবে বাঁচতে হয় সে-শিক্ষাও ওকে দিতে পারবে।'

'হুঁ !' কথাটা শুনে বিকভ মনে মনে খুশি হয়। তবু কিকিনের সামনে গম্ভীর হবার ভান করে। 'দ্যাখো, দায়িত্বে বোঝা কাঁধে চাপার পর যদি একটু সুস্থির হয়ে বসতে পারে !'

* * * *

বাইরে বাতাসের দুরন্ত গর্জন, তার সঙ্গে বৃষ্টির ধারাগুলো আছড়ে পড়ছে জানলার সার্সিতে। রাস্তায় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে কেঁপে উঠছে গোধূলির তরল অন্ধকার। ঘরের ভেতরেও স্বল্প নীলাভ আলোয় মনে হচ্ছে সব কিছু যেন কাঁপছে, ছিটকে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে দরজার বাইরে।

টালির তৈরি সুদৃশ্য উনুনে কাঠ জ্বলছে। বিকভ আরাম-কুর্সিটাতে বসে পাদুটো তুলে দিয়েছে তার গায়ে। উষ্ণ রক্তাভ শিখা কাঁপছে পায়ের কাছে, ঢিলে বহির্বাসের খানিকটা অংশে, কিন্তু মুখটা ঢাকা পড়েছে ছায়ার আড়ালে। চোখের পাতাদুটো বন্ধ, হাতদুটো শীর্ণ

বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে কিকিন তালগোল পাকিয়ে বসে রয়েছে নিচু একটা টুলের ওপর। কুতকুতে চোখে ও তাকিয়ে রয়েছে ইয়াকভ সমভের মুখের দিকে। সমভের মুখে পড়েছে তাপচুল্লীর পরিপূর্ণ রক্তিম আভা। নিচু স্বরে এমন ভাবে ও কথা বলছে, ঠিক যেন কাউকে গল্প শোনাচ্ছে। 'সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ যত বাড়বে, মানুষের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষের ভাবটা ততই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তখন গরীবরা চেষ্টা করবে এই বিপুল ধনসম্পদ...'

'হুঁ!' অসহ্য উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে বিকভ পাদুটো সরিয়ে নিলো! এবার ধীরে ধীরে তার বন্ধ চোখের পাতাদুটো খুলে গেলো। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করার জন্যে কিকিন নিচু হয়ে কাঠগুলো খুঁচিয়ে দিলো। জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো ভেঙে রাখলো সামনের একটা তামার পাত্রে। কাঠ ফাটার শব্দ শোনা গেলো।

পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকাতেই বিকভ দেখলো কোলাব্যাঙের মতো কিকিনের মুখটা হাঁ হয়ে গেছে আর ইয়াকভ চিত্রার্পিতের মতো নিশ্চল বসে রয়েছে। নতুন পোশাকে ওকে এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

'তার মানে তুমি বলতে চাও গরীবরা ধনীদের ধনসম্পদ সব ছিনিয়ে নেবে?'

'না। আমি বলতে চাই—ধনসম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হওয়া উচিত।'

'তাই নাকি!' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো বিকভের কণ্ঠস্বর। 'এইসব চিন্তাই বুঝি আজকাল তোমার মাথায় ঘুরঘুর করে?'

'হাজার হাজার মানুষ আজকাল এইভাবে চিন্তা করছে।'

'কেন, তুমি গুনে দেখেছো নাকি?'

'এটা কিন্তু সত্যি,' আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে কিকিন খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বললো। 'মানুষ আজকাল কেমন যেন ক্ষেপে গ্যাছে। দিন দিন ওরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।'

বিকভ অদ্ভুত ভঙ্গিতে ভ্রূদুটো কুঁচকে তুললো। 'তুমি চুপ করো! তোমাকে আমি কিছু জিগেস করিনি।'

কিকিনের ওপর হঠাৎ এভাবে রেগে যাওয়ার তার যথেষ্ট কারণ আছে। বিকভ লক্ষ্য করেছে দু মাসও হয়নি ইয়াকভ এখানে এসেছে, অথচ এরই মধ্যে বুড়ো কুঁজোটা পোষা কুকুরের মতো ওর প্রতিটা কথায় লেজ নাড়তে শুরু করেছে। ব্যাটা তার নতুন প্রভুর গন্ধ ঠিক টের পেয়েছে।

'মানুষ বলতে তুমি কাদের বোঝাতে চাইছো?' ক্রুদ্ধ হতাশায় বিকভ চিৎকার করে উঠলো।

আর ছেলেটাও হয়েছে তেমনি অদ্ভুত। হয় ভীষণ বোকা, না হয় অসম্ভব নিপুন। দুটোর মধ্যে কোনটে যে সত্যি বোঝা মুস্কিল। অথচ শক্ত শক্ত কথাগুলো এমন নম্রভাবে স্পষ্ট করে বলে যাবে যে যেকোনো লোকের মনের গেঁথে থাকবে, তখন আর কারুরই বুঝতে কোনো অসুবিধে হবে না যে জীবনের যাকিছু দুঃখ দুর্দশায় মূলে রয়েছে এই অঢেল ধনসম্পদের বৈসম্য। কুঁজোরও ধারণা এ এক ধরনের বিকৃতি, ইয়াকভের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু কেন? ইয়কভ তো খুব ভালো করেই জানে মামার মৃত্যুর পর ও-ই হবে একমাত্র উত্তরাধিকারী, তখন ও নিশ্চয়ই দানছত্র খুলে দুহাতে সর্বকিছু গরীবদের

মধ্যে বিলিয়ে দেবে না। বরং তখন ও দুহাতে কুড়োবে ধনীর প্রভূত সম্মান, প্রতিপত্তি। ফটকের সামনে বসে বসে ঝিমুলে দরোয়ানকে ও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে, লোকজন লাগিয়ে বাগান সাফ করাবে, হয়তো বা মরশুমী ফুলের চারাও লাগাবে। গুদামে গিয়ে মালপত্তের হিসেব নেবে, কোনো বিক্রয়িককে চুরি করতে দেখলে লাথি মেরে দূর করে দিতেও কোনো দ্বিধা করবে না...

তবু, এতকিছু সত্ত্বেও রহস্যটা রহস্যই থেকে যায়। না ভেতরে না বাইরে, গত দুমাসে ইয়াকভের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কপালের ওপর সেই একই চুলের গুচ্ছ, একই নম্র অথচ ঋজু কথা বলার ভঙ্গি, যা শুনলে বিকভের বিক্ষিপ্ত অসুস্থ মনটা আরও অসুস্থই হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইয়াকভ তাকে কবরে পাঠানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তখন উত্তেজিত মনের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো কে সে কিছুতেই নিজের আয়ত্বের মধ্যে রাখতে পারে না, ইচ্ছে করে চিৎকার করে ওঠে ঃ

'মানুষ বলতে তো যতত্ সব গেঁয়ো অশিক্ষিত মুর্খের দল।'

'হ্যাঁ। তবু আজকের দিনে ওদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।'

'বোকার মতো এই সব অর্থহীন কথা কেন যে বলো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না।

'যেহেতু আমাদের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাক, তা আমি চাই না'। পরিপূর্ণ আভায় ইয়াকভের চোখদুটো তখন আরও দীপ্ত আরও কোমল মনে হয়। 'আমি চাই আমার ধারণাগুলো স্পষ্ট মেলে ধরতে। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যেই প্রতিটা মানুষের উচিত সুসংবদ্ধ হওয়া...'

'সুসংবদ্ধ! কার বিরুদ্ধে?' ক্রুদ্ধতায় বিকভ চাপা গর্জন করে উঠে।

'শত্রুর বিরুদ্ধে।'

'শত্রু! শত্রু কে? নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু. বুঝলে?'

দেখুন, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তবে বুকের মধ্যে অসন্তোষের তীব্র ঘূর্ণীঝড় চেপে মানুষ দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে না। তার সুপ্ত চেতনা একদিন জেগে উঠবেই, যেদিন সারা দেশ ময় ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের আগুন...

'অসম্ভব! মিথ্যে কথা!' প্রচণ্ড ক্রোধে বিকভ চিৎকার করে উঠে।

* * * *

রাত্তিরে সীমাহীন নৈঃশব্দ্যের কাঁথা মুড়ি দিয়ে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ডালপালা মেলে দেওয়া মানুষের মনের নিভৃত ভাবনাগুলো তখন এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন হাত বাড়ালেই তাকে স্পর্শ করা যাবে, একটু জোরে নাড়া দিলেই যেন তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সারা ঘরে। ঠিক এমনই একটা মুহূর্তে বিকভ যেন স্পষ্ট শুনতে পায় ওপরের তলায় ইয়াকভের নম্র-মধুর স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর. আর দেখতে পায় পাখির মতো কুতকুতে চোখে বুড়ো কুঁজোর মুখটা কোলাব্যাঙের মতো হাঁ-হয়ে গেছে। ওরা দুজনে শাসনতন্ত্রের পুনর্বিন্যাস আর জারের ক্ষমতা সীমিত করাব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেন বলাবলি করছে।

তুরস্ক যুদ্ধের সময়েও সে অনেককে এইসব কথা ফিসফিস করে বলতে শুনেছিলো, আসন্ন যুদ্ধের মুখে অনেকেই আবার তা বলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ছাত্র-যুবসমাজই

এই উত্তেজনাকে সবচেয়ে বেশি করে জাগিয়ে তুলছে, কেননা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যেতে ওরা ভয় পায়। এমন কি তুরস্ক যুদ্ধের সময়ে ওরা জারকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিলো, তখন ঠিক সুযোগ করে উঠতে না পারলেও পরে ওরা জারকে হত্যা করেছিলো।

'যুদ্ধে না যাওয়াটা ভীরুতা! যোশুয়াও যুদ্ধে গিয়েছিলেন। রাজা ডেভিড কবি হয়েও যুদ্ধে না গিয়ে পারেননি। মঠবাসী, এমন কি তপস্বী যুবরাজদেরও তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিলো। সেণ্ট আলেকসান্দর নেভস্কিও সুইডদের মেরে তাড়িয়ে ছিলেন। এঁরা কিন্তু কেউই নিজেদের লোকের হাতে মারা যাননি। অথচ জারকে নিহত হতে হলো তাঁর নিজের লোকের হাতে!'

কুর্সি থেকে উঠে বিকভ জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারায় তারায় ভরা বিষণ্ণ ম্লান একটা আকাশ। বিকভের মনে পড়লো গির্জার প্রধান ধর্মযাজক ফাদার ফিওদর একদিন বলেছিলেন, 'তারাভরা অসীম আকাশের এই সৌন্দর্যকে মানুষ কোনোদিনও শ্রদ্ধা করতে শিখলো না।'

বিকভ ঠাট্টা করে বলেছিলো, 'অসীম সূর্যের আকাশকে দেখবে বলেই ওরা রাতের আকাশকে ঠিক পছন্দ করে না।'

'ওরা কোনো আকাশের দিকেই কোনোদিন চোখ তুলে তাকায় না।'

'আসল কথাটা কি জানেন—মানুষ জন্মেছে ধুলোমাটির এই পৃথিবীর জন্যে, সেখান থেকে তাদের মনগুলোকে ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া আর বাসরঘরের কনেকে জোর করে সৈন্যশিবিরে টেনে নিয়ে যাওয়া, একই কথা।'

প্রচণ্ড ক্রোধে ফাদার ফিওদর আর একটিও কথা বলতে পারেননি…

অন্ধকারের গাছের গায়ে গাছগুলো এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ওদের সারা গায়ে কে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। সারাটা শহর নিস্পন্দ নিথর। এমনই নিশ্চুপ যেন এখনই কেউ 'আগুন! আগুন!' বলে চিৎকার করে উঠবে।

বিকভের সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ নেই। তার সমকক্ষ পরিচিত যারা ওরা সবাই তার চাইতেও বেশি গৃধ্নু—হয় অর্থ-লোলুপ, না হয় কাম-লোলুপ। তাই চিরটাকাল সে একা একাই বেঁচেছে, একটু একটু করে গড়ে তুলেছে তার শান্ত নীড়। ভেবেছিলো আশ্চর্য রূপসী কোনো স্ত্রীকে নিয়ে বাকি জীবনটা সে নীলিম শান্তিতে কাটিয়ে দেবে, পুতুলের মতো ওর সারা গা জড়োয়ায় মুড়ে দেবে, ছুটির দিনে ওকে নিয়ে গাড়িতে করে বেড়াতে যাবে, আর শহরের সব বউয়েরা হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে। হ্যাঁ, এইটে সে চেয়েছিলো। তার মোহেই এতদিন সে কেবল চোখ বুজিয়ে সঞ্চয় করে গেছে।

অথচ আজ সারা ঘর শবাধারের মতো নিটল অন্ধকারে মোড়া।

'কেন? কেন? কেন? আমি কি অন্যায় করেছি?'

পরমুহূর্তেই ইয়াকভের মুখটা তার মনে পড়ে যায়। 'ওর ভাবনা, ওর ধারণাগুলো ছেলেমানুষি হলেও, সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছেলেবেলায় আমি যে কি চাইতাম তা আমি নিজেই বুঝতাম না।'

উত্তরাধিকারের প্রশ্ন জড়িত না থাকলে ছেলে হিসেবে ইয়াকভকে সে নিঃসন্দেহে

পছন্দ করতেন। নম্র শোভন। ভাবনার ঋজুতায় তার জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে, অন্তত কোনোকিছুর ওপর ওর আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিকভ মাঝে মাঝে যখন ভাবে, অবাক হয়ে যায়, কখনও বা হিংসেও হয়। সেই মনভাবকে গোপন করার জন্যে কখনও সে অহেতুক হাসে, কখনও গম্ভীর হবার ভান করে। তখন আপন মনেই ভাবে, 'উড়তে না পারলে কি হবে, সদ্য পালক-গজানো-পাখিটা কিন্তু গায় মন্দ নয়! তারপর আমার মতো যখন শক্ত পালকের ডানা পাবে, অন্য সুরে গাইবে, হয়তো তখন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও কোনো দ্বিধা করবে না…'

বিকভের সব চেয়ে ভালো লাগে ইয়াকভ যখন ওর আগের মনিব টিটভের সম্পর্কে গল্প করে। পাঁড় মাতালটা তার অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে কি রকম দুর্ব্যবহার করে শুনতে শুনতে বিকভের চোখদুটো খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, কখনও সে হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে যায়, বুকের যন্ত্রণটা তীব্র হয়ে ওঠে। তবু সে চায় ইয়াকভ অন্তত বুঝুক মানুষের শত্রুটাকে। তাই নিজেকে সে প্রচ্ছন্ন রেখে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলে, 'নাঃ, তোমার দেখার মতো চোখ আছে। আর আজকের দিনে সেটা বেশি দরকারী। ল্যাংচার কোন্ পাটা খোঁড়া সেটা আগে দেখতে হবে। যদি দ্যাখো বাঁ পাটা খোঁড়া, লাঠিটা মারবে ডান পায়ে। আর যদি দ্যাখো ডান পাটা খোঁড়া, লাঠিটা মারবে বাঁ পায়ে।'

'আপনি হাসছেন, কিন্তু এদের জন্যে আমরা সত্যিই দুঃখ হয়। এদের শক্তি আছে, সামর্থ আছে…অথচ আজ পর্যন্ত বিশাল এ পৃথিবীর কিছু জানলো না, শিখলো না, দেখলো না, সারাটা জীবন দুহাতে কেবল আঁকড়েই গেলো। অথচ এরাই আবার অপরকে বলে লোভী! কিন্তু সত্যিকারের লোভ বলতে যা বোঝায়, আমি তো সাধারণ মানুষের মধ্যে তার কিছুই দেখতে পেলাম না।'

'তুমি এখনও ছেলে মানুষ, তাই তুমি সম্পূর্ণ দেখতে পাওনা।' তর্কের খাতিরে মুখে বললেও বিকভ মনে মনে ভাবে,' 'সত্যি, ছেলেটার কোনো তুলনাই হয় না! যখনই যে-কথা বলে, সহজ সরল যুক্তির গভীরে অনায়াসে প্রবেশও করতে পারে। নিশ্চয়ই, সাধারণ কর্মচারীরা অলস হতে পারে, লোভী নয়। আর তাদের সে অলসতার জন্যে মালিক পক্ষের ত্রুটিও নিতান্ত কম নয়।' তবু বিকভ মুখে এ-কথা কখনও স্বীকার করে না। বরং বিষণ্ণ কৃত্রিম একটা ক্রোধের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে, 'তোমরা পরস্পর বিরোধী ভাবনাগুলোকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফ্যালো, ইয়াকভ। যুক্তির চাইতে কল্পনার দিকেই তোমার ঝোঁক বড্ড বেশি…'

ইয়াকভ এ কথার কোনো প্রতিবাদ করে না, নিঃশব্দে চোখের পাতা নামিয়ে কপালের ওপর এসে-পড়া চুলের ঘনীটা পেছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

*

হঠাৎ কেন জানি শহরের ধনী বণিকরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। জানলার সামনে বসে বিকভ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো—চিরদিনই যাদের ব্যস্ততার কোনো বালাই ছিলো না, আজ তারা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে সারাটা দিন গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করছে, থমথমে গম্ভীর মুখ। কিকিনকে ডেকে সে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, ওরা এত ছোটাছুটি করছে কেন?'

'এটাকে তুমি বড় রকমের একটা ঠাট্টাও বলতে পারো, ইগর ইভানিচ।'

কিকিনের কথা বলার ধরন, ওর মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বিকভ অবাক হয়ে গেলো। কুঁজোর কুতকুতে করুণ চোখের দৃষ্টি, নির্বোধের মতো ম্লান মুখের হাসি, এখন কি যেন অপ্রত্যাশিত একটা আশায় ঝলমল করছে। বিশেষ করে টলমলে পায়ে অস্থির হয়ে কোমরবন্ধটা ঠিক করতে করতে কিকিন যখন বললো—দুমা শহরের সবাই, সরকার বণিক, এমন কি ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধেও ভীষণ ক্ষেপে গেছে—তখন আর ওকে ঝড়ের রাতে পথ-হাতড়ে-খুঁজে-মরা মানুষের মতো বিধ্বস্ত মনে হলো না। বিকভ প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো, পারে কথার মাঝ পথেই ওকে থামিয়ে দিয়ে জিগেস করলো, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, একমিনিট! রাজ্যপাল কি এখন শহরেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর জারও বেঁচে আছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি?'

বেখাপ্পা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে কিকিন জিগেস করলে, 'কি জানতে চাইছো তুমি?'

'মূর্খ!'

ইয়াকভ সমভ নিঃসন্দেহে খুব সহজ করেই তাকে বুঝিয়ে বলেছিলো শহরে এখন কি ঘটছে এবং কিছুদিন তাকে মস্কোয় গিয়ে থাকার জন্যে অনুরোধ ও করেছিলো। কিন্তু মনস্থির করার আগেই বিরাট কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার মতো দেখতে দেখতে সারাটা শহর উত্তেজনায় গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো।

অক্ষম ক্রোধে কঠিন হয়ে উঠলো বিকভের মুখের রেখাগুলো। 'জানতে চাইছি শহরে সত্যি কি ঘটছে?'

'সে তো তুমি খুব ভালো করেই জানো, ইগর ইভানিচ। জনগণ দাবী করছে···'

'দাঁড়াও, একমিনিট! বোকার মতো ঘোঁত ঘোঁত না করে তার আগে বলো—জনগণ বলতে তুমি কাদের বোঝাতে চাইছো? মূর্খ চাষাগুলোকে তো?'

'হ্যাঁ, ওরাও আছে।'

'হুঁ, কি দাবী করছে ওরা?'

'চাষের জমি চাইছে।'

'কার কাছে, কাদের জন্যে।'

'তোমাকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। কাদের জন্যে আবার? সবাই সবার জন্যেই দাবী করছে।' ফুটন্ত জলে কাঁকড়ার মতো চেয়ারের মধ্যে কিলবিল করতে করতে কিকিন বলে চললো। 'সবার অসন্তোষ একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সবাই বলাবলি করছে এভাবে বাঁচা অসম্ভব···'

'এভাবে বলতে?'

'যেভাবে লোকে এখন বেঁচে রয়েছে। সব্বাই নির্ভয়ে এমন বুক ফুলিয়ে বলছে, যেন এতদিন তারা ঘুমিয়ে ছিলো আর অতীতের সবকিছু কেবল বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন···'

বিকভের প্রায় মুখোমুখি চেয়ারে বসে কিকিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ছেঁড়া সার্টটা আলগা হয়ে নেমে এসে কুঁজের কাছে আটকে গেছে। পাজামা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি। বিকভ মনে মনে ভাবলো, 'কি অদ্ভুত একটা জীবের সঙ্গেই না আমাকে বাস করতে হয়!'

'পরিহাস আর কাকে বলে! দুমার রাস্তায় রাস্তায় সবাই ছুটোছুটি করছে…'

'বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে!'

কিকিন চলে যাবার পর বিকভ ভাবলো, 'নাঃ, কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ওটাকে এবার সত্যিই দূর করতে হবে। তাছাড়া ইয়াকভ যখন এখানে রয়েছে, ওটার এখন আর কোনো প্রয়োজনও নেই।'

* * *

বৃষ্টি মাথায় করে ইয়াকভ ফিরলো সন্ধ্যেবেলায় সেই চায়ের সময়ে। সচরাচর ও কখনও যা করে না, পা দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে নিঃশব্দে গিয়ে বসলো টেবিলের ওপর। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে কয়েকটা চুমুক দিলো। গির্জার প্রার্থনাসভা থেকে ফিরে-আসা মানুষের মতো ওর মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ আর পবিত্র দেখাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভেজা চুলের সঙ্গে কপালের ওপর ঘূর্ণীগুলো আটকে রয়েছে, বাঁকানো ধনুকের মতো ভ্রূদুটো অনেকটা ওপরে তোলা।

ওকে দেখে বিকভ মনে মনে সতর্ক হলো, আর তখনই তার বুকের মধ্যে সুপ্ত শয়তানটা জেগে উঠলো, গম্ভীর গলায় সে জিগেস করলো, 'মস্কোর খবর কি?'

স্বাভাবিকের চেয়ে একটু চড়া গলায়, যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেওয়ার আগে শপথবাক্য পাঠ করার ভঙ্গিতে থেমে থেমে, হঠাৎ মনে-পড়ে যাওয়া শব্দগুলোকে গাঁথতে গাঁথতে ইয়াকভ দীর্ঘক্ষণ অনর্গল বকে গেলো।

বিকভ মনে মনে ভাবলো, 'মিথ্যে কথা! আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই ইয়াকভ এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছে।' প্রতিটা প্রশ্নের যথাযথ জবাব না পাওয়ার জন্যে বিকভ যতটা না ক্ষুব্ধ হলো, ইয়াকভের প্রতিটা কথা কিকিনকে হাঁ করে গিলতে দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো তার চাইতেও বেশি।

ইয়াকভের কিছু কিছু কথা তার কাছে সত্যিই দুর্বোধ্য বলে মনে হলো। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ হঠাৎ কেন জানি এক সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ক্রোধে ফেটে পড়েছে, সোচ্চার কণ্ঠে তারা তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্যে দাবী জানাচ্ছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থে লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছে, যেন হঠাৎ একটা কিছু পাওয়ায় নেশায় একেবারে মাতাল হয়ে উঠেছে।

সন্দেহের চোরা-চোখে তাকিয়ে বিকভ চাপা স্বরে জিগেস করে, 'কিন্তু এতে লাভটা কি হবে?'

একটু চুপ করে থেকে ইয়াকভ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে যদি এ গণ-জাগরণকে আমরা সুষ্ঠু রূপ দিতে না পারি, তাহলে খুব খারাপই হবে। বিশ্বাস করুন ইগর ইভানিচ, আপনার উদ্বিগ্নতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। তবু আপনার কাছে আমি কিছুই গোপন করতে চাই না বলেই বলছি—এতে সম্পূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লবও দেখা দিতে পারে।'

'মিথ্যে কথা!' বিকভ জোরে চিৎকার করে উঠলো। 'এত অস্ত্র ওরা পাবে কোথায়?

অসম্ভব! আমি অসুস্থ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দেখে আসতে পারবো না বলেই তুমি এ সুযোগের সদ্বব্যবহার করছো…তুমি…তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে আরও তাড়াতাড়ি মেরে ফেলতে চাইছো।' উত্তেজনার বশে বিকভ এত জোরে টেবিলের ওপর ঘুঁষি মারলো যে পেয়ালা-পিরিচ ছিটকে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেলো, ম্লান চোখের মণিদুটো কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে এলো। 'তুমি কি ভেবেছো আমি অথর্ব হয়ে গেছি? নাঃ, কক্ষোনো নয়? এভাবে তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারবে না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আছি, এ সম্পত্তি আমার…'

বিস্মিত না হয়ে বরং সলজ্জ ভঙ্গিতে টেবিল থেকে উঠে ইয়াকভ মামার মুখোমুখি একটা চেয়ারে এসে বসলো। দু একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্ত নিটোল স্বরে বললো, 'আমি জানি ইগর ইভানিচ। আর ঠিক সেই জন্যেই আমি আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আপনার ধারণা আমি আপনার সম্পত্তি গ্রাস করতে চাই। কনসতান্তিন দিমিত্রিয়েভিচ আমাকে সবই বলেছেন। কিন্তু আপনার ধারণা ভুল এবং এতে আমি রীতিমতো মর্মাহত হয়েছি। আপনার সম্পদের ওপর আমার কোনো মোহ নেই, আমি উত্তরাধিকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। এ সম্পর্কে লিখিত একটা খসড়াও প্রস্তুত করেছি। সম্ভবত আজ রাতেই শেষ করতে পারবো। আমি এখানে বাস করতে রাজি হয়েছিলাম শুধু আপনার অসুস্থতা, আপনার নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে। আমি জানি আপনি অন্য অনেকের চেয়ে ভালো, অনেক বেশি সম্প্রতিভ আপনার নিজস্ব ঋজু একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আপনি ইচ্ছে করলে যেকোনো মুহূর্তে প্রধান শিক্ষক বেসকারকে পথের ভিখিরি করে ছাড়তে পারতেন, কাসিমিরস্কির মেয়েদের উচ্ছন্নে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা করেননি। এইসব কারণেই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ বাড়িতে আমি আর বাস করতে চাই না। বিদায়!'

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে ইয়াকভ কি ভেবে আবার ঘুরে দাঁড়ালো।

'আমি কিন্তু আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ, ইগর ইভানিচ!'

'দাঁড়াও, একমিনিট।' কুর্সি থেকে উঠে ঢিলে বহির্বাসের দড়িটা দুপাশ থেকে টেনে বাঁধতে বাঁধতে বিকভ বললো, 'শোন, ইয়াকভ মাথা গরম কোরো না!' কিন্তু ইয়াকভ ততক্ষণে চলে গেছে। বিকভ দড়ির ফাসটা বাঁধা শেষ করতে পারলো না, দুহাতে দড়ির প্রান্তদুটো চাবুকের মতো দুলিয়ে সে কিকিনকে চিৎকার করে বললো 'ওকে ফিরিয়ে আনো শিগগির।'

চোখের পলকে কুঁজো-বুড়ো লাফিয়ে উঠে নড়বড় করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর খোলা-দরজার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে বিকভ অবাক হয়ে গেলো। সম্পত্তি প্রত্যাখ্যানের জন্যে সে যত না অবাক হলো, ইয়াকভ কেমন করে বেসকারের কথা জানতে পারলো ভেবে বিস্মিত হলো তার চাইতে বেশি। সত্যি, সুদখোরের লোলুপ থাবা থেকে বেসকার আর লম্পট মাতাল বাবার হাত থেকে রূপসী কাসিমিরস্কির বোনেদের সে না বাঁচালে ওরা এতদিন পথে পথেই ঘুরে বেড়াতো।

'আমি আপানাকে শ্রদ্ধা করি… এতে আমি রীতিমতো মর্মাহত হয়েছি! নাঃ, ছেলেটা সত্যিই ছেলেমানুষ!' আপন মনে ভাবতে ভাবতে বিকভ সারা ঘরময় পায়চারি করতে

লাগলো। ইয়াকভ যখন ভেতরে প্রবেশ করলো, সে যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেলো।

'অদ্ভুত ছেলে তো তুমি! হঠাৎ এভাবে রেগে গেলে কেন? আরে রোসো, রোসো! সমস্ত সম্পত্তি তো তোমারই—শুধু আমি দিতে চাই বলে নয়, আইনত তোমারই প্রাপ্য।'

চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে ইয়াকভ দৃঢ় স্বরে বললো, 'আমি উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাই না।'

'চাও না! সত্যিই কি তুমি চাও না?'

'না। তাছাড়া হয়তো খুব শিগগিরই সমস্ত সম্পত্তি বিলোপ করা হবে।'

'উত্তরাধিকার থেকে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আইনই তা হতে দেবে না।'

'বিলোপ করতে গেলে আইন করেই তা করতে হবে। আর চরম দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে গেলে অচিরেই তা করা উচিত।'

'বেশ, ধরে নিচ্ছি আমরা তা করলাম,' হঠাৎ জ্বরতপ্ত মানুষের মতো ম্লান হয়ে ওঠা ইয়াকভের মুখের দিকে চোখ পড়তেই বিকভ থমকে গেলো। 'তোমার অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি তো?'

'না।' একটু বিরতির পরেই আবার স্বচ্ছ প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠস্বর। 'আমি কিন্তু আগে থেকেই আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, ইগর ইভানিচ…এটাকে আপনি সাময়িক একটা ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দেবে না। এটা নিঃসন্দেহে গণবিপ্লবের রূপ নিতে চলেছে এবং অনেকেই ধনীদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেবার জন্যে সোচ্চার কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে।'

'এতে তোমার এমন একটা ভয় পাবার কিছু নেই, ইয়াকভ।'

'ভয় আমি পাইনি, ইগর ইভানিচ। তাছাড়া আমি নিজেও তা পছন্দ করি।'

'কিন্তু…' হঠাৎ বিকভের মনে হলো অসহ্য যন্ত্রণায় তার দম বন্ধ যেন হয়ে আসছে, গলার মধ্যে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। তবু নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখে দীপ্ত ভঙ্গিতে কুর্সির হাতলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'কিন্তু সম্পত্তি ছাড়া মানুষের জীবন অর্থহীন, অনেকটা নগ্ন কঙ্কালের মতো। ধনসম্পদ হলো সেই কঙ্কাল-কাঠামোর ওপর মেদ পেশী ত্বক। বুঝলে? এগুলো বৃদ্ধি করার জন্যেই মানুষ বাঁচে, বাঁচে তার আশা-আশাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে। আর মানুষের এই আশা-আশাঙ্খা পরিতৃপ্তির ওপরেই নির্ভর করে পৃথিবীর অস্তিত্ব। এ পৃথিবীতে যে কম চায়, সে মূর্খ…'

ইয়াকভ হাসতে হাসতে বললো, 'সেই জন্যেই তো আজ সবাই সবকিছু চাইছে।'

'ওরা নিজেরাই জানে না ওরা কি চাইছে। আর শুধু চাইলেই তো হবে না, তাকে সৃষ্টি করতে হবে। দ্যাখো, আমি মূর্খ নই। বুঝি সব। যিশুও চেয়েছিলেন সবাই সব কিছু সমান ভাবে ভাগ করে নিক, কিন্তু উনি নিজে কি আমাদের চাইতে আরও দরিদ্র ভাবে বাস করেন নি? নিশ্চয়ই সেদিনের চেয়ে আজকে দিনের পৃথিবীতে লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে তবু সবাই সবকিছু চাইলেই তো হবে না—সবাইকে কাজ করতে হবে, উপার্জিত অর্থ থেকে তাকে বাঁচাতে, তাকে পুঞ্জীভূত করে তুলতে হবে…' নিজের উচ্চারিত কণ্ঠস্বরে বিকভ নিজেই অবাক হয়ে গেলো। তার কাছে মনে হলো এ যেন নিজেরই জীবনের স্বতস্ফূর্ত স্বীকারুক্তি। সারা ঘরের নিটোল নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে সে ধীরে ধীরে বলে চললো,

'সবার আগে আমাদের কাজ করতে হবে, তা থেকে বাঁচাতে হবে তারপর সমান ভাবে ভাগ করে নিতে হবে। যে পঙ্গু যে অক্ষম, সেও নিশ্চয়ই বাদ যাবে না। আর তখনই কেবল অভাব বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না দারিদ্র, এমন কি পাপের কোনো ছায়াও না। নিশ্চয়, তা হওয়া উচিত বইকি। সবাই দুবেলা পেট পুরে খেতে পাবে, যোগ্যতা অনুযায়ী যথেষ্ট ভালো ভাবে বাঁচতে পারবে, কেউ কারুরটা ছিনিয়ে নেবে না, কেউ কারুর প্রতি অন্যায় করবে না, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে ?'

যত বেশি কথা বলছে বিকভ নিজেই তত অবাক হয়ে যাচ্ছে, যেন তার ভাবনার ধারাগুলো পূর্ণতা পাবার আগেই এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, অথচ খুব সহজেই সেগুলোকে আবার খুঁজে পেতে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বিকভের মনে হলো এ ভাবনাগুলো যেন অনেক আগে থেকে তার মনের মধ্যে গোটানো ছিলো, আজ অদৃশ্য কেন মসৃণ ঢাল বেয়ে তা যেন আপন খেয়ালেই গড়াতে শুরু করেছে। নতুন পাওয়া শব্দগুলো বিকভ এমন অনায়স ভঙ্গিতে বলে চললো, যেন এই শব্দগুলোই সে বরাবর ভেবেছে। কুঁজো বুড়োটাকে তন্ময় হয়ে শুনতে দেখে ওকে মাতালের মতো হাসতে দেখে বিকভ খুশিতে ভরে উঠলো। তার মনে হলো কুঁজো শয়তানটা দেখুক সে কত চালাক। ইয়াকভও মেয়েদের মতো শান্ত চোখ মেলে তার দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। আর এ সব কিছু এমনই মর্মস্পর্শী যে সে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো কোন অদৃশ্য শক্তি মানুষকে পারস্পরিক বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে, তাকে রোমাঞ্চিত করে তুলতে পারে। আর তখনই তার চোখে জল এসে গেলো। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে মাথাটা কুর্সির পেছনে হেলিয়ে দিল ! বন্ধ হয়ে এলো চোখের পাতা।

'মানুষের খারাপ করে কে আর আনন্দ পায় ? কিন্তু সবচেয়ে যা জরুরী, সবাইকে মন প্রাণ ঢেলে কাজ করতে হবে, কাজই হলো…'

কিকিন হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। 'কি ব্যাপার, ইগর ইভানিচ ? তোমার কি খুব ক্লান্ত লাগছে ?' করুণ চোখে ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে ও বললো, 'চলো, ওকে বরং বিছনায় শুইয়ে দিই।'

দুজনে ধরাধরি করে বিকভকে বিছনায় শুইয়ে দিলো, তারপর দুজনেই নিঃশব্দে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

* * *

কিকিন আর ইয়াকভের নিপুণ সেবা-যত্নের উষ্ণ ছায়ায় নিজেকে জড়িয়ে বিকভ কয়েকটা দিন নিবিড় প্রশান্তির মধ্যে কাটিয়ে দিলো। এ যেন তার জন্মদিন। কিন্তু শারিরীক শক্তির অবনতি এমন এক চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালো যে সবসময় তাকে দেখা শোনার জন্যে ইয়াকভ একজন ধাত্রী রাখতে বাধ্য হলো। লম্বা, রোগা লিকলিকে চেহারা, আয়ত ম্লান দুটো চোখ। ভদ্রমহিলা এত কম কথা বলে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি বোবা। শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেও বিকভের আত্মসমর্পিত চেতনাবোধ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো কিকিনের চঞ্চল অস্থির উদ্বিগ্নতা, ইয়াকভের ধীর সুসংযত আচরণ। দিনের মধ্যে কয়েকবার ও যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়, যখন ফিরে আসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিটা ঘটনা বিকভকে বলতে বাধ্য হয়।

'নাঃ, ওরা দুজনেই দেখছি আমার জন্যে দুঃখিত।' বিকভ আপন মনে ভাবে। 'ওরা কেউই আমাকে বিব্রত করতে চায় না। তার মানে আমি সত্যি সত্যিই মৃত্যুর শেষ সীমানায় এসে পৌঁচেছি।'

যদিও মৃত্যু ভীতি এখন আর তাকে আগের মতো আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে না, তবু সে না ভেবে পারে না, 'আঃ, আমি যদি আর কয়েকটা দিন ইয়াকভের সঙ্গে বাঁচতে পারতাম। কিকিনটাও ভালো। ওরা আমাকে বুঝতে পেরেছে। হৃদয়ের দুয়ার আমি ওদের কাছে খুলে দিয়েছি, ওরা এখন আমাকে চিনতে পেরেছে।'

বিকভ মনে মনে—হাসে সম্পদকে যে সম্মান করা উচিত, সেটা আমি নিঃসন্দেহে ইয়াকভের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি। তাই ইয়াকভ আজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে গরীবদের সঙ্গে সমস্ত সম্পত্তি ও ভাগাভাগি করে নেবে।

তবু কিকিনের বিভ্রান্তি, ইয়াকভের মুখ থেকে শোনা অদ্ভুত তথ্যগুলো যাচাই করে নেওয়ার জন্যে, বিকভ ধাত্রীকে জিগেস করে, 'শহরের অবস্থা এখন কি রকম ?'

'ওরা এখন বিদ্রোহ করছে।' ভদ্রমহিলা এমন নির্লিপ্ত স্বরে কথাটা বললো যেন জিনিসপত্র কেনা-বেচা কিংবা মদ খেয়ে মাতলামি করার মতোই শহরে এটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। মুখের সামনে হাত ঢেকে মাঝে মাঝেই ও হাই তোলে, আর হাই তোলা শেষ হলে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। সব সময়েই ঘুমে চোখের পাতা ঢুলে আসে আর বেড়ালের মতো এমন সতর্ক পায়ে হাঁটে যে কখনও এটুকু শব্দ শোনা যায় না।

শনিবার বিকেলে প্রথম গুলির শব্দ শোনা গেলো। সকাল থেকে অঝরে বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টি ভেজা ঝোড়ো হাওয়ায় প্রথম ঝাঁকের শব্দগুলো মনে হলো যেন অনেক অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

বিকভ কয়েক মিনিট চুপচাপ কান-পেতে শুনলো। তার মনে হলো কোনো দাঁড়কাক যেন টিনের চাল ঠোকরাচ্ছে। তখন সে ধাত্রীকে ডেকে তুললো! 'কিসের শব্দ হচ্ছে ?'

জানলার সার্সি খুলে সাপের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে ধাত্রী কান পেতে শুনলো, তারপর ফিরে এলো। 'বুঝতে পারছি না। আপনার ওষুধটা কি এখন দেবো ?'

'চুপ করো !'

টিনের চাল ঠোকরানো শব্দগুলো এখন আরও ঘন ঘন আর খুব কাছে বলে মনে হলো। এবার আর অভিজ্ঞ সৈনিকের কানকে ফাঁকি দিতে পারলো না। মনে মনে গুম হয়ে ভাবলো, 'হুঁ, রাইফেলের শব্দ।' পর মুহূর্তেই সে ধাত্রীকে বললো, 'যাও, ওদের কাউকে ডেকে নিয়ে এসো।'

খোলা চুলগুলো রঙিন রুমালে জড়াতে জড়াতে ধাত্রী চলে গেলো। গোধূলি আলোয় ওর রঙিন রুমালটাকে মনে হলো ডানা-মেলা পাখির মতন। বিকভ তার শয্যায় সোজা হয়ে বসলো, ফাঁপা ফাঁপা আঙুল দিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কান খাড়া করে রইলো।

'আচ্ছা শয়তান তো সব! আমি বুঝতে পারছি না কারা গুলি করছে, কাদেরই বা গুলি করছে ?'

চিল চেঁচাতে চেঁচাতে ধাত্রী প্রায় ছুটেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো। তখনও হাঁপাচ্ছে,

বিস্ফারিত দু চোখের মণি। 'ওরা, আপনার ঘরের ছাদ লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে!'

'বাজে বোকো না। এগুলো খালি কার্তুজের খোল ভরে ছুঁড়ছে!'

'না না, এগুলো খালি কার্তুজের খোল নয়!'

'চুপ করো। এ এক ধরনের রণকৌশল! শহরের মধ্যে এভাবে গুলি চালানো নিষিদ্ধ।'

'না, ইগর ইভানিচ, আপনি ভুল করছেন!'

ধাত্রী দৌড়ে এসে জানলাটা খুলে দিলো। চকিতে সারা ঘর বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো। বিকভ বুঝতে পারলো রাইফেলের শব্দের সঙ্গে দু একটা রিভলভারের গুলির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা বোমা ফাটলো। কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ শোনা গেলো, উলটো দিকের বাড়ির জানলায় প্রতিফলিত হলো তীব্র আলোর ঝলক। ধাত্রী মেঝের ওপরে ধপ করে বসে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, 'হে ঈশ্বর, রক্ষা করো।'

বাঁকা পায়ে নড়বড় করতে করতে কিকিন প্রবেশ করলো। গায়ে ঢলঢলে কোট, মাথায় লম্বা ঝুঁটিওয়ালা টুপি। মোমের আলোয় ওর মুখটাকে মনে হলো নিষ্প্রাণ ব্রোঞ্জের মুখোশের মতো।

ওকে দেখেই বিকভ চিৎকার করে উঠলো, 'কি ব্যাপার? ইয়াকভ কোথায়?'

'ও নেই। বেরিয়েছে।'

'কোথায়, কখন গ্যাছে?

বাঁকা হাতে টুপিটা তুলে নিয়ে কিকিন অপরাধীর মতো ভীরু চোখে তাকালো। 'আমি ওকে বারন করেছিলাম, ইগর ইভানিচ। আমি ওকে আজ বাইরে বেরুতে মানা করেছিলাম। এ কথা সত্যি ওরা আমাদের সঙ্গে প্রতারনা করেছে…'

'কারা?'

'সরকার। কর্তৃপক্ষ!'

'তুমি যখন মানা করলে, ইয়াকভ কি বললো?'

'ও বললো—না আমাকে যেতেই হবে! কমরেড…কনোনভ ঢালাই কারখানার শ্রমিক-বন্ধুরা সব আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

বিকভের মনে হলো কে যেন তাকে সমানে চাবকে চলেছে। বিছনা থেকে নেমে উত্তেজিত স্বরে যে চিৎকার করে উঠলো, 'আমাকে জানলার সামনে নিয়ে চলো। এই যে, কি যেন নাম তোমার…আমার গাউনটা দাও।'

জানলার দিকে তাকিয়ে ধাত্রী ভয়-চকিত স্বরে বললো, 'গুলি চলছে, আমি এখানে থাকবো না। আপনার যা খুশি করুন। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

মুখে বললেও, যাওটা তো দূরের কথা, মেঝে থেকে ও নড়লোও না। ওখানে বসে বসেই জানলার দিকে তাকিয়ে ও বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো।

বিকভকে ঠেলে বহির্বাসটা পরিয়ে দিতে দিতে কিকিন আস্তে আস্তে বললো, 'দেখো, জানলা দিয়ে আবার গোলাগুলি যেন…'

'চুপ করো। তুমিও তো ওদের দলে।'

চকিতে গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছেই কোথায় যেন চাপা আর্তনাদ শোনা গেলো। পরমুহূর্তেই ফটকে শেকলের ঝনঝনা, ফটকের পাল্লাদুটো আছড়ে খোলার শব্দ হলো। কুড়ুলের ঘায়ে গাছের দু একটা ডালও খসলো। সরু মেয়েলি গলায় কে যেন চিৎকার করে বললো, 'এদিকে নয়, এদিকে নয়—পেছনের বাগান দিয়ে যাও।'

টলতে টলতে বিকভ যখন জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো, দেখলো রাস্তায় কালো ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে। সওয়ারী ঘোড়ার পিঠের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে রয়েছে, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা উট এগিয়ে আসছে। তিনটি একক ছায়ামূর্তিকে ও বাগানের প্রাচীর বেয়ে উঠতে দেখলো, একজনের হাতে আবার ভারি পাথর-বাঁধা লম্বা একটা দড়ি।

অশুভ, নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে তার বুকের গহনে কে যেন চিৎকার করে উঠলো, 'চোর। চোর!' আর সেই নির্জনতার মধ্যে তার শোনা প্রতিটা শব্দ যেন প্রতিধ্বনিত হলো, এলোমেলো হয়ে হারিয়া গেলো তার যাকিছু ভাবনা। জানলার পাশ দিয়ে একটা গুলি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পড়লো শুকনো ডালপালার মধ্যে।

ভীরু স্বরে কিকিন বললো, 'জানলার সামনে থেকে বরং সরে আসাই ভালো।'

বিকভ কুঁজোর কাঁধ হিড় হিড় করে টেনে আনলো। 'দ্যাখো, চোখ মেলে দ্যাখো। একে কি বিদ্রোহ বলে?'

'শ্রমিক-অভ্যুত্থান, ইগর ইভানিচ।'

'ইয়াকভও কি এর মধ্যে রয়েছে?'

'হ্যাঁ। ও রয়েছে কনোনভ ঢালাই-শ্রমিকদের সঙ্গে।'

'যাও। একখুনি গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। বলবে আমি ডেকেছি। পাজি, বদমাইস কোথাকার! কেন এ কথা আমাকে এতক্ষণ বলোনি?'

'ইয়াকভ নিজেই তোমাকে বলেছে। ও কি বলেনি খুব শিগগিরই সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হচ্ছে?'

'যাও, একখুনি ওকে ডেকে আনো। ও যদি মারা যায় তোমাকে আমি জ্যান্তো কবর দেবো!'

কিকিন বেরিয়ে গেলো।

ধাত্রী বললো, 'আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

প্রকম্পিত পায়ে বিকভ আবার জানলার সামনে ফিরে এলো। স্বল্প আলোয় উদ্ভাসিত জানলার ফ্রেমের মধ্যে দীর্ঘ ধূসর ছায়া ফেলে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অসম্ভব ক্লান্তিতে তার সর্বাঙ্গ যেন শিথিল হয়ে এলো। আরাম-কুর্সিতে সম্পূর্ণ গা এলিয়ে দিয়ে সে অপলক চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। রাস্তার বুক থেকে এখন অল্প অল্প কুয়াশা উঠছে। গুলির শব্দ এখন যেন অনেকটা থিতিয়ে এসেছে, কুড়ুলের শব্দও তেমন আর ঘনঘন শোনা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড শব্দে ফটকের ওপর কি যেন আছড়ে পড়ছে, কাঠ ফাটার মড়মড় আওয়াজ শোনা গেলো। টেলিগ্রাফের তারগুলো এমন ভীষণ ভাবে কাঁপছে কেন বিকভ কিছুতেই বুঝতে পারলো না। পর-মুহূর্তে শুনলো অসম্ভব দ্রুত দুড়দাড় পায়ের শব্দ, জানলার খড়খড়ি ভাঙার আওয়াজ,

আর চড়া গলায় চিৎকার করে ওঠা পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, 'ফটকটা ভেঙে ফ্যালো। উঠোন থেকে পিপেগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তায় নিয়ে যাও।'

বিকভ ভাবলো, 'নিশ্চয়ই আমার উঠোনের পিপেগুলোর কথাই ওরা বলছে!'

রাস্তা থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'তারগুলো বাতিস্তম্ভের গায়ে জড়িয়ে দাও, তারপর সবাই মিলে টানো···তার চেয়ে বরং কেটে দাও···দেখো হে, আমার পাটা থেঁৎলে দিও না যেন···ছেলেমানুষী রাখো, আগে রাস্তাটা বন্ধ করতে দাও'···'

'এটা ইয়াকভের কণ্ঠস্বর!' স্বগত স্বরে বিকভ চাপা গর্জন করে উঠলো। 'নিশ্চয়ই ও!'

ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে করতে ধাত্রী করুণ স্বরে বিলাপ করছে, 'হে ঈশ্বর, প্রভু···রক্ষা করো, ডাকতরা সব ভেঙে তছনছ করছে!'

'চুপ, চুপ করো! নইলে এটা সোজা তোমার পিঠে গুঁজে দেবো।'

কুর্সি থেকে উঠে ঝুলঝাড়ুটা নিয়ে বিকভ তর্জন-গর্জন করলো। ধাত্রী ভয় পেয়ে চুপ করে গেলো। হঠাৎ মনে পড়ায় বিকভ ঝুলঝাড়ুটা দু চারবার ছাদের সিলিং-এ ঠুকে কিকিনকে ডাকলো। চোয়ালদুটো তার তখনও কাঁপছে। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে চিৎকার চেঁচামেচি, জিনিসপত্র ফেলার দুমদাম্ শব্দ, দূরে কোথাও অস্পষ্ট গুলির আওয়াজ।

'ইয়াকভ নিশ্চয়ই ডাকাতগুলোকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবে!' মনে মনে ভাবলেও বিকভ স্বস্তি পোলো না। স্খলিত পায়ে সে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথাটা গলিয়ে দিয়ে চারদিকে তাকালো, কিন্তু অন্ধকার আর কুয়াশার মধ্যে সে স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পেলো না। কেবল ফটকের সামনে থেকে শুনলো ভরাট একটা কণ্ঠস্বর, 'আজ এই পর্যন্ত থাক।'

*　　　　*　　　　*　　　　*

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি, নিশান্তিকার হালকা কুয়াশার মধ্যে মানুষের মূর্তি-গুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আলাদা আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। বিকভের বাড়ির ঠিক বাঁদিকে রাস্তা-জুড়ে-গড়ে-তোলা প্রতিরোধের আড়ালে শ খানেক মূর্তি গুঁড়ি মেরে ওত পেতে রয়েছে। তলায় খড় বিছিয়ে কয়েকটা ঠেলা গাড়ি সাজিয়ে অস্থায়ী আস্তানাটা গড়ে তোলা হয়েছে। সামনের বাড়ির জানলা থেকেও বিস্মিত অবাক চোখগুলো ওদের লক্ষ্য করছে। চকিতে কালো কালো ছায়াগুলো কখনও জানলার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, কখনও আবার চট করে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

দূরে 'সার-বেঁধে-দাঁড়ানো'র ভঙ্গিতে শিঙা বেজে উঠলো।

'শুনতে পাচ্ছো। প্রস্তুত হও।' বিকভ শুনতে পেলো সেই ভরাট কণ্ঠস্বর। তারপরেই শুনলো শানবাঁধানো পাশ-পথের ওপর কি সব ধুপধাপ ফেলার আওয়াজ, ঘষড়ে টেনে আনার শব্দ। কাছেই কোথাও হুড়মুড় করে কি যেন ভেঙে পড়লো।

'জায়গাটা ওরা ভেঙেচুরে তছনছ করছে।' ধাত্রীর দিকে ফিরে বিকভ এমন ভাবে কথাটা বললো যেন ওর মতামত জানতে চাইছে। 'শুনতে পাচ্ছো? ওরা আর কোনো কিছু অস্তো রাখছে না।'

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বিকভ ঢিলে বহির্বাস দিয়ে বুকটা ভালো করে ঢেকে নিলো,

জানলা দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিতেই দেখতে পেলো কাঁধে বিরাট একটা শাবল নিয়ে ইয়াকভ ফটকের দিকে ছুটে আসছে। ওর পেছনে রাইফেল, কুড়ুল হাতে দশ-বারোজন লোক, একজনের হাতে আবার এককা গাড়ির লম্বা একটা হাতল। দু পাশ থেকে ওরা একসঙ্গে ফটকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকিয়ে ইয়াকভ বাগানের মধ্যে এসে পড়লো, তারপর চিৎকার করে বললো, 'ফটকটা আগে ভেঙে ফ্যালো। আর তোমরা কয়েকজন পিপেগুলোকে গড়িয়ে রাস্তায় নিয়ে যাও!'

এ সবকিছুই যেন স্বপ্নের মতো অসম্ভব। বিকভ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, তবু যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলো না। মূর্চ্ছারোগীর মতো ধাত্রীর আতঙ্কিত কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিকভের চমক ভাঙলো।

'বাড়িতে ডাকাত পড়েছে! ডাকাত, ডাকাত।'

হঠাৎ ডানা মেলা পাখির মতো ফটকের পাল্লাদুটো দুপাশ থেকে খুলে গেলো, আর কয়েকজন হুড়মুড় করে বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'এই, কি হচ্ছে কি। থামো থামো!' শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বিকভ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলো। 'শয়তানগুলো সব থামো! ইয়াকভ, তুমি ওদের বাড়ির ভেতর থেকে দূর করে দাও।'

ইয়াকভ মুখ তুলে তাকালো, তারপর চিৎকার করে বললো, 'ওরা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, মামা। ওরা আমাদের লোকজনকে খুন করছে।'

পরমুহূর্তে সে কুঁজো-কিকিনের গলা শুনতে পেলো, 'জানলার সামনে থেকে সরে যাও ইগর ইভানিচ।'

ফটকের বাঁ পাল্লাটা এবার কব্জা থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো বাগানের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সেটাকে টেনে নিয়ে গেলো রাস্তায়। অন্যরা যখন বাকি পাল্লাটা ভাঙার চেষ্টা করছে, কয়েকজন তখন পিপেগুলোকে গড়াতে গড়াতে ফটকের সামনে নিয়ে এলো। ওদের মধ্যে কুঁজো-কিকিনের বেঁটে গুড়গুড়ে চেহারাটাও বিকভের চোখে পড়লো। অস্বাভাবিক ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে সে বাহারী-ফণীমনসার টবটা তুলে নিয়ে বাগানের লোকজন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু ওদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছলো না। এতে বিকভ যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ধাত্রীর দিকে ফিরে না তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে বললো, 'ফুলদানী, চেয়ার, হাতের কাছে যা আছে শিগগির নিয়ে এসো।'

তার ভীষণ কণ্ঠস্বরে আতঙ্কিত হয়ে ধাত্রী চোখের সামনে যা পেলো বিকভের হাতে তুলে দিলো, আর বিকভের পক্ষে যেগুলো তোলা সম্ভব হলো হাঁফাতে হাঁফাতে দম বন্ধ করে বন্য-আক্রোশে সে জানলা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

'আমি…আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো, ইয়াকভ! আর তোকেও আমি ছাড়বো না, রক্ত-চোষা মাকড়শা। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!'

বুক কাঁপানো শব্দে জানলার সার্সি ভেদ করে একটা গুলি গিয়ে বিঁধলো ছাদের সিলিং-এ, এক খাবলা পলেস্তরা খসে পড়লো ওপর থেকে। ভয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ে ধাত্রী হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বিকভ ঘুরে তাকিয়ে এক ধমক দিলো। 'চুপ, চুপ করো! তোমার গায়ে তো আর গুলি লাগেনি। আর কি আছে শিগগির দাও।'

খুব কাছেই পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ শোনা গেলো, রাস্তা থেকে কে যেন চিৎকার করে বললো, 'ওরা আমাদের দুপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে।'

বিকভ দেখলো এক পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইয়াকভ গুঁড়ি মেরে বাগানটা পেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ওর ঠিক পাশেই দাড়িওয়ালা একজন লোক হাতের বল্লমটা ফেলে দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লো, আর তার মাথাটা এমন ভাবে ঠুকে গেলো যে টুপিটা ছিটকে পড়লো দূরে। ঠিক সেই মুহূর্তে ফটকের সামনের কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ধূসর উর্দি-পরা একদল সৈন্য। সামান্য একটু ঝুঁকে ওঁচানো সঙ্গিন হাতে ওরা ঝড়ের মতো বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়লো।'

'হাত তোলো। আত্মসমর্পণ করো।'

বিকভ পাগলের মতো হেসে উঠলো। হাত বাড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে সে চিৎকার করে বললো, 'ওই যে, ওখানে একজন···হ্যাঁ, টুপি মাথায় বুকে হেঁটে যাচ্ছে···ওটাকে আগে খুন করো! আর একটা কুঁজো-পিঠ-বুড়ো ওই পিপেটার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, ওটাকে শেষ করে দাও।'

ধাত্রীও তখন ঘরের অন্য একটা জানলা খুলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'মারো মারো, পালাচ্ছে, ধরো···'

আলো-ছায়া

নোংরা ইতর পল্লীতে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পুরনো একটা তিনতলা বাড়ি। মাটির নিচেও সারিসারি কখানা ঘর। অনেককাল আগে মাটির নিচের এই ঘরগুলো গুদমঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যত রাজ্যের আবর্জনা ভরা ছোট্ট এক চিলতে উঠোন। উঠোনের চারপাশেও কাঠের জীর্ণ কতকগুলো কুঠরি। এ বাড়ির মালিক পেতুনিকভ, মদের কারবারী। মাটির নিচের গুদম ঘরগুলো একদিন মদের পিপেয় ঠাসা থাকতো। আজ আর তার সে কারবার নেই। এখন সারা বাড়ি, এমন কি উঠোনের ছোট ছোট কুঠরি আর মাটির নিচের কামরাগুলোতেও ভাড়াটে বসিয়েছে।

প্রায় প্রতি শনিবারে সন্ধ্যের ঠিক আগে নিচের তলার একটা কুঠরিতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধে। তার ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে ভেসে আসে মেয়েলি কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার, 'ছাড়! ছাড়! ছেড়ে দে বলচি ধেড়ে মাতাল কোথাকার।'

সঙ্গে সঙ্গে চড়া গলায় পুরুষ কণ্ঠে জবাব আসে, 'আগে আমার ঘাড় থেকে নাব, নাবলেই তোকে ছেড়ে দোবো।'

'উঁহু, ওটি হবে না। আমি অত সহজে তোর ঘাড় থেকে নাবচি না।'

'কি বল্লি! নাববি না? দাঁড়া, তোর মজা দেকাচ্চি!'

'দেকা না, দেকা! মোরে গেলেও তোর ঘাড় থেকে নাববো না।'

'তবে রে পেত্নী। দ্যাক, দ্যাক, আমার ঘাড় থেকে তুই নাবিস কি না দ্যাক!'

'মার, মার আমাকে তুই মেরেই ফ্যাল!'

'কেমন, তখন বলিনি?'

'কে আচো, বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেললো গো, বাঁচাও!'

'থাম না মাগী, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। আজ তোকে আমি মেরেই ফেলবো!'

'এই রে, আবার ওদের নারদ-নারদ লেগে গ্যাছে!' সেঙ্কাই প্রথম চেঁচিয়ে ওঠে।

সেঙ্কা ঘর-বাড়ি রঙ-করার মিস্ত্রি সুচকভের ছোকরা শিক্ষানবীশ। সারাদিন উঠোনে বড় বড় গামলায় রঙ গোলে আর ইঁদুরের মতো কুচকুচে কালো দুষ্টুমিভরা চোখে চনমন করে তাকায়। কোথাও মজার কিছু ঘটলেই দেখা যাবে সবার আগে হাজির হয়েছে সেখানে। ওদের ঝগড়া বাধতে না বাধতেই সেঙ্কা রঙ গোলা ফেলে ছুটে আসে অরলভদের জানলায়। উঠোনের ওপর ওর সটান শুয়ে পড়ে ছোট খুলখুলির মধ্যে চোখ রাখে। সেখান থেকে নিচের খণ্ডযুদ্ধের প্রতিটা দৃশ্য তার চোখে পড়ে। শোনা যায় মেঝেতে হুটোপুটির আওয়াজ, চিৎকার-চেঁচামেচি, আর্তনাদ আর টেনে টেনে শ্বাস নেওয়ার শব্দ।

'উঃ, বউটাকে যা জোরে একটা ঝাড় দিলো না!' ঘুলঘুলি থেকে মুখ না তুলেই

সেঙ্কা প্রতিটা ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে যায়। আর সেঙ্কার সেধারাবিবরণী শোনার জন্যে উঠোনে তখন সবাই ভিড় করে দাঁড়ায়—আদালতের পেয়াদা লেভচেঙ্কো, অ্যাকর্ডিয়ানবাদক কিসলিয়াকভ, দর্জির দোকানের দুজন ছোকরা কারিগর আর বেকার বখাটে যত ছেলে মেয়ে। অধীর আগ্রহে ওরা সেঙ্কাকে প্রশ্ন করে, 'তারপর ? তারপর কি হলো ?'

'বউটাকে শুইয়ে ফেলে গ্রিগরি ওর পিঠের ওপর চেপে বসেছে…' রুদ্ধ নিশ্বাসে সেঙ্কা বলে যায়। 'এবার ওর ঘাড় ধরে মেঝেতে নাকটা ঠুকে দিচ্ছে।'

যদিও অরলভদের এই ধরনের ঝগড়া-ঝাঁটির সঙ্গে ওরা পরিচিত, তবু ঠিক এই মুহূর্তে মেঝেতে নাক ঠুকে দেওয়ার দুর্লভ দৃশ্যটা নিজে চোখে দেখার সৌভাগ্য কেউ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তাই অনেকে সেঙ্কাকে ঠেলে দিয়ে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখার চেষ্টা করে, কেউ কেউ সেঙ্কার পা ধরেও টানে। সেঙ্কা কিন্তু অটল। মাটি কামড়ে ও পড়ে থাকে। বিস্ফারিত চোখে কে যেন জিগেস করে, 'নাকটা কি ওর ভেঙে গ্যাছে ?'

'হ্যাঁ, গল গল করে রক্ত পড়ছে !'

'স্বামী তো নয়, পিশাচ !' মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে।

বয়স্ক একজন দর্শক দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে, 'নাঃ, ওর হাতেই বউটা একদিন নির্ঘাত মরবে দেখছি !'

'কোন্ দিন হয়তো ছুরিই বসিয়ে দেবে।'

'ছুরি নয়, ছুরি নয়। ছুরি বসালে তো মিটেই গ্যালো। বউটাকে ও এমনি করে তিলে তিলে মারবে, এই তোমাদের আমি সাফ কথা বলে দিলুম, দেখে নিও।' কিসলিয়াকভ গম্ভীর গলায় বলে।

'ব্যাস আজকের মতো লাগ-ধুমাধুম খেল খতম !' কথাটা বলেই সেঙ্কা ঘুলঘুলি ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর জামার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সোজা ওখান থেকে কেটে পড়ে। ও জানে অরলভ এখন যে কোনো মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও দ্রুত ফাঁকা হতে থাকে। ক্রুদ্ধ মুচির সামনা সামনি দাঁড়াতে কেউ বড় একটা সাহস করে না। তাছাড়া লড়াই যখন থেমেই গেছে, মিছিমিছি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না।

এমনি হামেশাই হয়। মারপিটের পালা শেষ করে অরলভ উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, জামাটা ছিঁড়ে গেছে, মাথার চুলগুলো কাকের বাসার মতো উস্কো-খুস্কো, ঘামে ভেজা সারা মুখে আঁচড়ের দাগ, চোখদুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ও উঠোনে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা একখানা পুরোনো শ্লেজগাড়ির ওপর বসে। কখনও নিজের মনে গজ গজ করে, কখনও শুধু চুপচাপ বসে থাকে। জামার হাতা দিয়ে মুখের রক্ত মুছে সামনের চূর্ণবালি-ঘসা দেওয়ালের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। দেওয়ালের গায়ে নানা রঙের ছোপ। কোনো বাড়ি রঙ করে ফিরে আসার পর দেওয়ালের গায়ে পোঁচড়া মোছা সুচকভের বহুদিনের বদ অভ্যেস। ভাঙা শ্লেজের ওপর চুপচাপ বসে অরলভ সেই রঙগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে :

বয়েস ওর বেশি নয়, ত্রিশের নিচেই। চমৎকার দেখতে, মাঝারি গড়ন। বাদামী

রঙের চওড়া বুক, পেশী বহুল বলিষ্ঠ বাহু। পুরু ঠোঁটের ওপর কুচকুচে কালো এক জোড়া গোঁফ। ঘন ভ্রূদুটো প্রায় একসঙ্গে জুড়ে গেছে। আশান্ত চঞ্চল দুটো চোখ।

বেলাশেষের সূর্য ডুবে যাবার পর উঠোনে গোধূলি ম্লান ছায়া নামে। বাতাসে থমথম করে আলকাতরা, রঙ, বাঁধাকপির আচার আর জঞ্জালের পচা গন্ধ। নিচে ওপর উভয় তলায় কোনো জানলা থেকে ভেসে আসে গানের কলি, কোনোটা থেকে বা ঝগড়ার শব্দ। কখনও কখনও কোনো মাতাল মুখ চকিতে অরলভের দিকে তাকিয়ে আবার চট করে জানলার সামনে থেকে সরে যায়।

কাজ সেরে বাড়ি-রঙ করার মিস্ত্রিরা ফিরে আসে। আসার পথে অরলভের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে পরস্পরে ইশারা করে, নিজেদের মধ্যে কস্ত্রোমা প্রদেশের ভাষায় দ্রুত কি সব যেন বলাবলি করে। তারপর কেউ যায় স্নান করতে, কেউ বা শুঁড়িখানায় আড্ডা জমাতে। একটু পরে তিনতলার ছোট ছোট দোকানঘর থেকে দর্জিরা সব বেরিয়ে আসে। বাড়ি-রঙ করার মিস্ত্রিদের কস্ত্রোমার ভাষা শুনে ওরা হাসাহাসি করে। চকিতে সারা উঠোন কলোরব আর ঠাট্টা-তামাসায় মুখর হয়ে ওঠে। অরলভ কিন্তু নির্বিকার। কারুর দিকে না তাকিয়ে ও চুপচাপ বসে থাকে। বাসিন্দারা কেউ ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষে না বা ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে না। সবাই জানে ও এখন মনে মনে হিংস্র পশুর মতো ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে।

বুকের মধ্যে ক্লান্ত অবসাদ, নিঃসীম ক্রোধ আর গ্লানির পাহাড় নিয়ে অরলভ রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে! নাকের ফুটোদুটো ওর প্রকম্পিত নিশ্বাসে কখনও ফুলে ওঠে কখনও বা পুরু ঠোঁটদুটো ঝুলে মুখটা হাঁ হয়ে যায়। তাঁর ফাঁকে দেখা যায় দুসারি ঝকঝকে সাদা দাঁত। কখনও তীব্র অনুশোচনায় বুকের ভেতরটা ওর হাহাকার করে ওঠে, তখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে নীল লাল অজস্র ফুটকি। ও বোঝে, পেটে খানিকটা ভদকা না পড়লো মনের এই বিষণ্ণ অবসাদ কিছুতেই কাটবে না। কিন্তু তখনও রাত্রির অন্ধকার তেমন করে গাঢ় হয়নি, এ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সবাই হাসাহাসি করবে। এ তল্লাটে গ্রিগরি অরলভকে সবাই চেনে। নিজে থেকে লোক হাসাতে ও চায় না। আবার ঘরে গিয়ে যে মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পালটাবে, তারও কোনো উপায় নেই। সেখানে ওর বউ মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘর। উঃ, সে এক বিভৎস দৃশ্য!

হয়তো বউটা এখনও ভালো করে সম্বিৎ ফিরে পায়নি, মেঝেয় মুখ রগড়ে গোঙাচ্ছে। অরলভ জানে বউ-এর কোনো দোষ নেই, বরং সে-ই অকারণে বউটার ওপর অকথ্য নির্যাতন করে, জুলুম চালায়, আর ও মুখ বুজে তা সহ্য করে। অসম্ভব ওর সহ্যশক্তি। অরলভ বোঝে সব, কিন্তু সে কি করবে! ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধের গভীরে চণ্ডালের মতো প্রচণ্ড একটা ক্রোধ যে তার দৃষ্টিশক্তিকে অচ্ছন্ন করে ফেলে! একবার রেগে গেলে তার হিতাহিত কোনো জ্ঞান থাকে না। এমনি অবস্থায় ভদকা ছাড়া আর কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারে না।

খানিকটা পরে অ্যাকর্ডিয়ানবাদক কিসলিয়াকভ আসে। গায়ে লাল রঙের রেশমী শার্টের ওপর মখমলের হাত-কাটা একটা কোট চাপানো, পরণে ঝলমলে পাজামা। পায়ে

চকচকে পালিশ করা বুট। বগলের নিচে সবুজ কাপড়ের ঢাকনাওয়ালা অ্যাকর্ডিয়ান যন্ত্রটা। কালো গোঁফের প্রান্তদুটো পাকিয়ে ছুঁচোলো করা, মাথার টুপিটা একপাশে হেলানো। প্রাণচঞ্চল সারা মুখে উচ্ছল চাপা হাসির একটা রেশ। ওর এই উচ্ছল হাসিখুসি বেপরোয়া ভঙ্গির জন্যেই অরলভ ওকে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে হয়তো বা হিংসেও করে।

ভাঙা শ্লেজের ওপর মুচির ওই বিধ্বস্ত মূর্তি দেখে, কির্সানিয়াকভ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর মুচকি হেসে জিগেস করে, 'কি ব্যাপার গ্রিগরি, আবার আজ মারপিট করেছো ? হুঁ মুখে আঁচড়ানো দাগ দেখে ঠিক বুঝতে পেরেছি ! না, বাহাদুর ছোকরা বটে। নাও, ওঠো, মিছিমিছি আর মন খারাপ না করে চলো একটু ভদকা খেয়ে আসি।'

কোন্ দিন বা না তাকিয়ে অরলভ সাফ জবাব দেয়, 'এখন নয়, পরে।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে গুটি গুটি এগুই, তুমি না হয় খানিকটা পরেই এসো। আমি ওখানে তোমার জন্যে বসে থাকবো, কেমন ?'

'আচ্ছা।'

অ্যাকর্ডিয়ানবাদকের ছায়াটা উঠোন থেকে মিলিয়ে যাবার খানিক বাদে অরলভও উঠে পড়ে। তারপর অন্ধকার গাঢ় হলে মাটির নিচের কুঠরি থেকে বেরিয়ে আসে ছোটখাটো ঋজু একটা নারী মূর্তি। মাথায় বড় একটা ফেটি বাঁধা। সেই ফেটির ফাঁক দিয়ে একটা চোখ, চিবুক আর কপালের খানিকটা অংশ দেখা যায়। মূর্তিটা দেওয়াল ধরে ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে একবার থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার টলতে টলতে উঠোনটা পেরিয়ে সেই ভাঙা শ্লেজগাড়িটার ওপর এসে বসে। স্বামীর পূর্বের আসনে মেত্রোনাকে ওই ভাবে চুপচাপ বসতে দেখে কেউ বিস্মিত হয় না। সবাই জানে, শুঁড়িখানা থেকে নেশায় চুর হয়ে টলতে টলতে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত মাত্রোনা অরলভের জন্যে ঠায় বসে থাকবে। বদ্ধ ঘরের ভেতরের গুমসানি গরমের চেয়ে উঠোন অনেক ভালো। তাছাড়া অরলভ ফিরে এলে চোরা কুঠরির ভেঙে যাওয়া ছোট ছোট খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওকে সাহায্য করতে পারবে। একবার মাতাল অবস্থায় সিঁড়ি থেকে পা ফশকে পড়ে গিয়ে অরলভ হাতে এমন চোট পেয়েছিলো যে যন্ত্রণায় দুসপ্তা কোনো কাজই করতে পারেনি। তখন ঘটি বাটি বাধা রেখে মাত্রোনাকে সংসার চালাতে হয়েছিলো। সেই থেকে মেত্রোনা হুঁশিয়ার হয়ে গেছে, যাতে নেশার ঘোরে আবার না পড়ে অরলভ হাত-পা জখম করে।

মাঝে মধ্যে প্রতিবেশীদের কেউ না কেউ এসে ওকে সান্ত্বনা দেয়। প্রায়ই যে আসে— প্রাক্তন ফৌজি অফিসার লেভচেঙ্কো। ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা, পেল্লাই ককেশীয় গোঁফ, মাথাটা কামানো, টকটকে লাল নাক। মেত্রোনার পাশে বসে লম্বা একটা হাই তুলতে তুলতে বলে, 'ফের আবার মার খেয়েছো তো ?'

মেত্রোনা ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'তাতে তোমার কি ?'

'না, আমার আর কি···এই এমনি বলছিলাম···' লেভচেঙ্কো থতমত খেয়ে চুপ করে যায়।

সেই নিটোল নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা যায় মেত্রোনার বুকের অতল থেকে বেরিয়ে আসা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। লেভচেঙ্কো যতটা সম্ভব কণ্ঠস্বরে দরদ ফুটিয়ে বলে, 'কেন

তোমরা মিছিমিছি এমন মারপিট করো ? কি লাভ হয় এতে ?'

'সেটা আমাদের ব্যাপার, আমরা বুঝবো।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই !' লেভচেঙ্কো ঘন ঘন মাথা নাড়ে। 'তোমাদের ঘরকন্নার ব্যাপার। তবে কি না . '

ওকে বাধা দিয়ে মেত্রোনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'আসলে কি বলতে চাও, বলো তো শুনি ?'

'উঃ, কি মেয়েমানুষ রে বাব্বা ! মেজাজ তো নয়, যেন খাপ-খোলা ছুরি। তুমি আর গ্রিগর দুজনে মানিয়েছে ভালো। আসলে তোমাকে দুবেলাই চাবকানো দরকার—সকালে একবার, সন্ধ্যেবেলায় একবার—তবে যদি একটু ঢিট থাকো।'

কথাটা বলেই লেভচেঙ্কো রাগে হন হন করে সেখান থেকে উঠে যায়। মেত্রোনা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। কেননা ওদের দুজনকে নিয়ে সবাই আড়ালে হাসাহাসি করে। তাছাড়া বছর চল্লিশ বয়েস হতে চললো, দু-কান কাটা ফৌজি বেহায়াটার বেল্লেপনা এখনও ঘুচলো না। লেভচেঙ্কো উঠোন পেরিয়ে তার ঘরে ঢোকার আগে হঠাৎ কোত্থেকে বেরিয়ে এসে সেঙ্কা তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি, অরলভের বউটা কেমন দিলো মুখের মাপে একটা ?'

'চোপরাও ! ফের যদি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে আসিস তো এক থাপ্পড়ে তোর মুণ্ডু আমি ঘুরিয়ে দেবো !'

সেঙ্কা ওর কথায় কানই দেয় না। বরং হিঁহি করে হাসতে হাসতে বলে, 'মেত্রোনা অত সহজ মেয়ে নয় বুঝলে ? ওই যে ছবি আঁকে, ম্যাকসিম, তোমার মতো ওর পেছনে ঘুর ঘুর করতো। একদিন মাত্রোনা এ্যাইসা ওর কান মুলে দিয়েছিলো যে কানদুটো ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিলো। অত চালাকি করতে হবে না, আমি নিজে চোখে দেখেছি !' বুঝলে.

বয়েস সবে বারো হলে কি হবে, এ বাড়ির কোনো কিছুই সেঙ্কার চোখ এড়িয়ে যায় না। যেমন ছটফটে, তেমনি বিচ্ছু। দিনের পর দিন নোংরা আর কদর্য পরিবেশে মানুষ হয়েছে। এদের মধ্যে থেকেই যাকিছু দেখেছে, শিখেছে—নিজের মনের মধ্যে জমিয়ে পাহাড় করে রেখেছে, সবার সামনে প্রকাশ করতেও তার কোনো দ্বিধা নেই।

এদিকে উঠোনে রাত্রির ছায়াগুলো গাঢ় হয়। মাথার ওপরে একচিলতে নীল আকাশ। তাতে সোনালী চুমকির মতো ঝিকমিক করে কয়েকটা নক্ষত্র। আর প্রাচীর ঘেরা অন্ধকার ছোট্ট উঠোনের গহ্বরে মেত্রোনা নিঃসঙ্গ একা চুপচাপ বসে থাকে। অত মার খাবার পরেও সমস্ত বেদনা লাঞ্ছনা ভুলে সে মাতাল স্বামীর ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে।

প্রায় চার বছর হতে চললো অরলভদের বিয়ে হয়েছে। ওদের একটা বাচ্চাও হয়েছিলো, কিন্তু আট মাস বয়েসে বাচ্চাটা মারা যায়। প্রথমে দুজনে খুবই শোক-তাপ পেয়েছিলো। তারপর শিগগিরিই আর একটা হবার আশায় ওরা সে দুঃখ ভুলে গিয়েছিলো।

নিচের তলায় ঘুপসি মতন বেশ বড় একটা ঘর নিয়ে দুজন থাকে। দরজার পাশে, জানলার ঠিক নিচেই, মেঝের সঙ্গে গাঁথা মস্ত একটা উনুন। উনুন আর দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে সরু একফালি পথ চলে গেছে পাশের ছোট একখানা ঘরে। সে ঘরে উঠোনের দিকে

দুটো জানলা। ঐ দুটো জানলা দিয়েই বড় ঘরের ভেতরে যা একটু আলো বাতাস চলাচল করে। কখনও কখনও ভেসে আসে উঠোনের বিচিত্র কলরব। তখনই কেবল মনে হয় পৃথিবী এখনও বেঁচে আছে। নইলে ঝুল আর মাকড়শার জালে ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁত স্যাঁতে ঘরটাকে মনে হয় ঠিক যেন যক্ষপুরী। এরই মধ্যে অরলভদের রেখাহীন রঙহীন বৈচিত্রহীন বিষণ্ণ দিনগুলো কোনো রকমে কেটে যায়।

উনুনের উলটো দিকের দেওয়ালের গায়ে বড় একটা তক্তপোশ। তার সামনে গোলাপী ফুলওয়ালা হলুদ পর্দা টাঙানো। তক্তপোষের একপাশে ওদের খাওয়া-দাওয়ার টেবিল। ছোট ঘরের দিকে ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসে স্বামী স্ত্রী দুজনে সারাদিন মুচির কাজ করে। চুনবালি-খসা স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে সাঁটা পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া ছবিগুলোর গায়ে আরশোলা ঘোরে, দিনের বেলাতে মাছি ভনভন করে।

অরলভদের দিনগুলো শুরু হয় ঠিক এমনিভাবে—ভোর ছটায় ওঠে মেত্রোনা মুখ হাত ধোয়, উনুন ধরায়, কালিপড়া তোবড়ানো কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়ে তারপর ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে দোকানে যায়। তখন বিছনা ছেড়ে উঠে গ্রিগরি মুখ হাত ধুতে যায়। মেত্রোনা দোকান থেকে রুটি এনে প্রাতরাশ তৈরি করে, চা ছাঁকে। প্রাতরাশের টেবিলে বসে দুজনে সামান্য একটু গল্পও করে। তারপর শুরু হয় কাজের পালা।

গ্রিগরি এ তল্লাটে সবচেয়ে নাম করা মুচি! ওর হাতের কাজ যেমন চমৎকার, তেমনি কাজের ফরমাশও আসে প্রচুর। প্রাতরাশের টেবিলে বসেই ও সমস্ত দিনের পরিকল্পনাটা ছকে রাখে। যাকিছু শক্ত কাজ ও নিজেই করে। মেত্রোনা ওর পাশ বসে সুতোয় মোম মাখায়, ভেতরের চামড়ায় নতুন কাপড় সাঁটে, পুরনো গোড়ালিতে নতুন পেরেক ঠোকে! তারপর চাঁচা ছোলার সূক্ষ্ম কাজগুলো গ্রিগরি নিজে হাতে করে।

প্রথমে ওরা নিঃশব্দেই কাজ শুরু করে। তাছাড়া আর কিই বা বলার আছে? বড়জোর সকালে কিংবা রাত্তিরে কি রান্না হবে, কিংবা কাজের সম্পর্কে দু চারটে এটা ওটা কথা। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে? অধিকাংশ সময়েই দুজনে চুপচাপ থাকে। সেই নিটোল নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল শোনা যায় চামড়া কাটার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস আওয়াজ আর হাতুড়ি পেটার ঢপ ঢপ শব্দ। কখনও কখনও মুখে উৎকট আওয়াজ করে গ্রিগরি পেল্লাই হাই তোলে, মাত্রোনা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে। মাঝে মাঝে গ্রিগরি গান ধরে। গলাটা একটু মোটা হলেও মন্দ গায় না, অন্তত বেসুরো নয়। ঘরের বদ্ধ বাতাসে গমগম করে ওঠে গ্রিগরির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তারপর দ্রুত উচ্চারিত গানের বিষণ্ণ কলিগুলো ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে জানলা পেরিয়ে উঠোনের দিকে ছুটে বরিয়ে যায়। একটু পরে মেত্রোনাও সুরেলা কণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রিগরি তখন হাতের কাজ থামিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে মেত্রোনার মুখের দিকে তাকায়। সুকতলার চামড়া সেলাই করতে করতে মাত্রোনা তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছে, এবং বিষণ্ণ চোখে গ্রিগরি তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে দুজনে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ, এমন কি রূপ-রস-গন্ধবিহীন এ পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বের কথাও ওরা সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

গান থামলে সারা ঘর ভরে ওঠে একটুকরো নিটোল নিস্তব্ধতায়। সেই নিস্তব্ধতায় গ্রিগরির বুকের অতল থেকে উঠে আসে গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস। 'উঃ, এভাবে বাঁচাটাকে কি কেউ

বাঁচা বলে !'

'এর জন্যে এত হা-হুতাশ কারার কি আচে ? কদিনের জন্যে বাঁচা বইতো নয় !'

'তুই থামতো ! মেয়েমানুষ হয়ে জর্ম্মোচস, জীবনের মর্ম তুই কি বুজবি ?'

'না, আমি আর কিছু বুজি না, তুইই সব বুজিস !'

'ফের রা কাড়চিস ?' গ্রিগরি খেঁকিয়ে ওঠে।' 'আমি কি কচি খোকা, যে জ্ঞান দিতে এসেচিস ? নাকি তুই আমার গুরুমশাই, যে তোর কাছে পাঠ নিতে হবে ? নে নে, যা করচিস, তাই কর।'

মেত্রোনা গ্রিগরির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে গলার দুপাশের শিরাগুলো ওর ফুলে উঠছে, দুচোখে চাপা আগুনের আভাস। সেই দেখে মেত্রোমা চুপ করে যায়। ও জানে গ্রিগরির মাথায় যেমন ঝট করে রাগ চড়ে যায়, তেমনি পড়তেও সময় লাগে না একটুও। শুধু কথা না বললেই হলো। মেত্রোনা মাথা নিচু করে এক মনে কাজ করে যায়। রাগ পড়ে গেলে গ্রিগরির অনুশোচনা হয়, মোত্রানার করুণ মুখখানা দেখে ওর সারা বুক মমতায় ভরে ওঠে। মনে মনে ভাবে এমন করে আর কখনও ওকে বকবো না।

দু জনেই বয়েসে তরুণ, দেখতে ভালো—ভালো স্বাস্থ্য আর পরস্পরকে ভালোও বাসে নিবিড় করে। কিন্তু হলে কি হবে -একঘেঁয়ে জীবনে এতটুকু বৈচিত্র নেই, আলো নেই, যা থেকে ওরা একটু মুক্তি পেতে পারে। আসলে স্বাভাবিক জীবনের উৎসধারাটাই ওদের কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। কেবল বাঁচার জন্যে বেঁচে থাকা। আর নিতান্ত সেই বেঁচে থাকার জন্যেই দুজনে দিনের পর দিন অবিরাম কাজ করে। আলো নেই, হাসি নেই, ছুটি নেই—কেবল কাজ, কাজ আর কাজ। মাঝে মধ্যে দু চারজন ইয়ার বন্ধুরা যে কখনও আসে না, তা নয়। কিছুক্ষণের জন্যে ওরা আসে, মদ খেয়ে হৈ-হুল্লোড় করে, আবার চলে যায়। তারপরেই অদৃশ্য চাকার টানে আবার চলতে শুরু করে বৈচিত্রহীন, বিষণ্ন, ভয়াবহ সেই একঘেঁযে জীবন।

এক-একদিন বিরক্ত হয়ে গ্রিগরি বলে, 'উঃ, কি দুর্বিসহ জীবন! কেবল কাজ আর ক্লান্তি···ক্লান্তি আর কাজ !' শালা, একে কি বাঁচা বলে ? একটু নিস্তব্ধতার পর মুচকি হেসে ও মেত্রোনার মুখের দিকে তাকায়। 'মাটা তো জন্ম দিয়েই খালাস। বেশ, তার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। তারপর মুচিগিরির কাজ শিখলুম, মুচি হলুম। কিন্তু তাতে কি দৌলতখানাটা গড়ে উঠলো আমার ? এই যে এই ইঁদুরের গর্তে বসে দিনের পর দিন চামড়া কাটচি, জুতো সেলাই করচি···এই করতে করতেই একদিন মরে যাবো। পাঁচজনে হয়তো তখন বলবে, আহা, অরলভ মুচিটা খাশা বুট বানাতো বটে, বেচারি কলেরায় মরে গেলো! তা নাহয় বললো। কিন্তু তাতে আমার কি এসে গেলো ? মরলে না হয় বুঝলাম ফুরিয়ে গেলো। কিন্তু বেঁচে থেকেটা কি পেলাম তুই শুধু তাই বল ?'

গ্রিগরির কথা শুনে মেত্রোনা তখনই কোনো জবাব দেয় না, মনে মনে স্বামীর কথাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। কখনও বলে—থাক না এসব কথা, ভগবান যাকে যেমন করেচেন, তাই নিয়েই খুশি থাকতে হয়। কখনও মনের ভাব চাপতে না পেরে স্পষ্টাস্পষ্টই বলে ফেলে, 'মদ গেলাটা ছাড় দিকিনি। দেকবি মনে সুখ পাবি, স্বস্তি পাবি, চাই কি দু চার পয়সা জমাতেও পারবি। তখন আর মনে দুখ্যু থাকবে না, ভদ্দোলোকদের

মতো যা খুশি কিনতে পারবি।'

'থাম্ দিকিনি মাগী, তোর কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়!' চোখ পাকিয়ে গ্রিগরি খেঁকিয়ে ওঠে। 'জীবনে ওই একটা মাত্তরই তো সুখ। মদ খাওয়া ছাড়লে বাঁচবো কি নিয়ে বলতে পারিস? আর ভদ্দোরলোক? ভদ্দোরলোকের কথা আমাকে শোনাতে আসিসনি বুঝলি? ঢের ঢের ভদ্দোরলোক দেখিচি আমি! বিয়ের আগে তবু বেশ ছিলুম। তুই এসেই আমার জীবনটা বরবাদ করে দিলি!'

গ্রিগরির কথা শুনে মেত্রোনা মনে মনে আঘাত পায়, বুকের ভেতরটা অভিমানে গুমরে ওঠে। তবু কথাটা মিথ্যে নয়। বিয়ের আগে ও সত্যিই ভালো ছিলো। যেমন উচ্ছল আর স্ফূর্তিবাজ, তেমনি সুন্দর। মদ প্রায় ছুঁতোই না—অনেকের কাছে একথা সে বহুবার শুনেছে। তবু আর্দ্র বেদনায় মেত্রোনার চোখ ছলছল করে ওঠে—কেন, কেন এমন হলো? সত্যিই কি আমি ওর জীবনটা বরবাদ করে দিয়েছি? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মেত্রোনার মন মমতায় ভরে ওঠে। গ্রিগরির আরও কাছে সরে সে এসে ওর বুকে মাথা রাখে।

'এই, আবার ছিনালিপনা শুরু করলি তো!' মুখে গজগজ করলেও, গ্রিগরি কিন্তু মেত্রোনাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় না। বরং হাতের কাজ ফেলে তাকে হাঁটুর ওপর বসায়, তারপর দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে তার সারা মুখ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। দুচোখের আগুন ততক্ষণে নিভে জল হয়ে গেছে। পাছে কেউ শুনে ফ্যালে, যেন সেই ভয়ে ও মেত্রোনার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'রাগ করিসনে রে মেত্রোনা। যা ইতর আমাদের জীবন, একটু ফাঁক পেলেই কেবল শেয়াল-কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করি। কিন্তু কেন, কেন বলতে পারিস? সে শুধু আমার বরাত। জম্মাবার সময় থেকেই এক একটা মানুষ খারাপ বরাত নিয়ে জম্মায়, আমারও হয়েছে সেই দশা, বুঝলি?'

নিজের মন গড়া ব্যাখ্যাতেও কোথাও সান্ত্বনা মেলে না, বরং মেত্রোনাকে আরও নিবিড় করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গ্রিগরি নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা করে।

এমনি ভাবে নিটোল কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায়। অধিকাংশ সময়েই মেত্রোনা কিছু বলে না। কিন্তু সেই অনাবিল মুহূর্তে হঠাৎ নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা মনে পড়ে গেলে তার দুচোখ ফেটে জল আসে, বুকের মধ্যে গুমরে-ওঠা আর্দ্র করুণ দীর্ঘশ্বাসগুলো যেন ভারি পাথর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। মেত্রোনার চোখে জল দেখে গ্রিগরির বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে, সোহাগে আদরে যত তাকে গলিয়ে দিতে চায়, মেত্রোনার চোখের জল ততই হুহু করে বেড়ে ওঠে। তা দেখে গ্রিগরি কিছুটা বিরক্তও হয়। বিরক্ত হয়ে অস্ফুট ভৎ'সনার সুরে বলে, 'প্যানপ্যানানি থামাতো! তোকে যখন মারধোর করি, তাতে তুই যত ব্যাথা পাস, তার চাইতে হাজারগুণ বেশি ব্যাথা পাই আমি নিজে, বুঝলি? তাই কখনও মুখে মুখে তক্কো করবি না, চুপ মেরে থাকবি।'

কখনও কখনও বউয়ের চোখের জল বাঁধ মানছে না দেখে গ্রিগরির সত্যিই মায়া হয়। তখন মমতায় ভেজা কোমল স্বরে মেত্রোনাকে ও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'নাঃ, আমি লোকটা সত্যিই কোনো কাজের নয়, বুঝলি? তোকে যে মারিধরি, সেটা যে অন্যায় আমি বুঝি। তুই যে আমার একটা মাত্তর বউ, তুই ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার আদর যত্ন

করার আর কেউ নেই, তাও জানি। এবং এটাও সত্যি যে সে-কথা আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কিন্তু কি করবো বল্ ? ওই যে কথায় বলে না—রাগ হলো গিয়ে চণ্ডাল ! রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না, মাথার মধ্যে রক্ত টগবগ কোরে ফোটে। তখন আমি পাগলের মতো হয়ে যাই, ইচ্ছে করে তোকে দু হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ফেলি। রাগে তখন আমার নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। সত্যিরে মেগ্রোনা, তখন তোকে আমি যেন ঠিক সহ্য করতে পারি না। তখন তুই যদি হক্ কথাও বলিস, মাথার রক্ত আমার চড়ে যায় বই কমে না।'

সব সময় মেগ্রোনা যে গ্রিগরিকে স্পষ্ট বুঝতে পারে তা নয়, অনুতাপে ভরা ওর এই কোমল কণ্ঠস্বর তার মনের অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। স্বামীর দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে সে বলে, 'ভগবান করুন, তোর যদি একটু মতিগতি ফেরে, তুই যদি কথায় কথায় তখন রাগ না করিস, তাহলে আমাদের আর দুখ্যু কিসের !' কি যেন ভেবে মেগ্রোনা চুপ করে যায়। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান স্বরে বলে, 'আমাদের যদি একটা বাচ্চা-কাচ্চা থাকতো, তাহলে হয়তো আর কোনো দুখ্যু থাকতো না।'

'তা বাচ্ছা তোকে পেটে ধরতে মানা করেচেটা কে ? ধরলেই পারিস।'

'আহাহা, যে ভাবে পেটে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মারিস, ওতে কারুর পেটে বাচ্ছা আসে না, বুঝলি ? তবু যদি বুক পেট বাঁচিয়ে হাত পা চালাতিস্…'

'মারার সময় কারুর অতশত খেয়াল থাকে না, বিশেষ করে রেগে গেলে…আমি তো আর তোকে ইচ্ছে করে মারি না।'

'কোত্থেকে যে তোর এত রাগ আসে, আমি সেইটাই বুঝতে পারি না।'

'বরাত মেগ্রোনা, এইটেই আমার বরাত।' গ্রিগরি দর্শনের ভঙ্গিতে বলে, 'মানুষের স্বভাব কি আর এত সহজে মরে। এই আমার কথাই ধর না কেন—আমি কি আর পাঁচজনের চাইতেও খারাপ ? আমি কি ওই ইউক্রেনিয়ান ফৌজি-ছোঁড়াটার চাইতেও খারাপ ? অথচ দ্যাখ, ও কেমন ফুর্তিতে রয়েছে। বউ নেই, ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই—একদম একা ! আর তোকে না পেলে আমি হয়তো বাঁচতুমিই না ! ও ব্যাটা খাচ্ছে দাচ্ছে আর সিগারেট ফুকে বেড়াচ্ছে। আমি কিন্তু ওর মতো নই। দিনরাত কত পরিশ্রম করি। হ্যাঁ, আমি একটু বেশি ছটফটে, কোথাও একটু সুস্থির হতে পারি না। কি করবো বল, সেটা আমার জন্মের দোষ। অথচ ও ব্যাটার সঙ্গে আমার কত তফাৎ…আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, এদিক ওদিক তাকাই, ভালো মন্দ এটা ওটা দেখি, তখন কি পেয়েচি কি পাইনি ভাবতে ভাবতে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি যেন তখন পাগলের মতো হয়ে উঠি ! মনে মনে ভাবি নিজের বলতে আমার কিচ্ছু নেই…দিনরাত কেবল ইঁদুরের গর্তে বসে কাজ করছি। অথচ দ্যাখ, ও ব্যাটা দুনিয়ার দিকে একবার চোখে তুলে তাকায়ও না, তবু কেমন ফুর্তিতে রয়েছে। এই তোর কথাই ধর—তুই আমার বউ, কিন্তু কি লাভটা হলো তাতে ? তুই তো এই দুনিয়ার আর পাঁচটা মেয়েমানুষেরই মতো খুব সাধারণ—সব সময় যা পাবার জন্যে আমার মন খাঁ খাঁ করছে, তুই তার কিছুই দিতে পারবি না। ছেঁড়া জুতো সারানোর মতো তোর আটঘাট আমার সব জানা হয়ে গ্যাচে। এমন কি কাল তুই কখন হাঁচবি, আমি তাও পর্যন্ত বলে দিতে পারি। তোর মধ্যে নতুন কিছু পাবার নেই, একটা ছিটে

ফোঁটাও না, বুঝলি ?'

মেগ্রোনা অমনি ফোঁস করে ওঠে, 'অত যদি তোর দেমাক তো আমাকে বে করতে গেলি কেন ?'

'সেইটেই তো কথা ! সত্যিরে মেগ্রোনা, তুই বিশ্বাস কর—আমি কোনোদিন বিয়ে করার কথা ভাবিনি। বরাবর ভেবেছিলুম আমি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখবো। হয়তো খিদে তেষ্টা পেতো, তবু তো যেখানে খুশি যেতে পারতুম, যা খুশি দেখতে পারতুম। এমনি করতে করতে গোটা দুনিয়াটাই একদিন আমার ঘোরা হয়ে যেতো।'

'আমাকে ছেড়ে দিয়ে এখও তুই যেতে পারিস।' মুখে বললেও তার চোখের কোলে দু ফোঁটা অশ্রু চিক চিক করে, রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ স্বর।

'তোকে ছেড়ে ? কেন, ছেড়ে দিলে তুই কোথায় যাবিটা শুনি ?'

'সে আমার ভাবনা। তার জন্যে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

হঠাৎ গ্রিগরির চোখদুটো ক্রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে ওঠে। 'না, তোকে বলতেই হবে।'

'অত চেঁচাচ্চিস কেন ? তোর চোখ-রাঙানিকে আমি ভয় করি নাকি ?'

'হু, বুঝেচি। তোর মন এখন অন্য কারুর ওপর আশনাই ! খুব ওড়ার সাধ হয়েছে তাই না ?'

'যদি হয়েই থাকে, তাতে তোর কি ?'

'তবেরে মাগী, ফের মুখে মুখে চোপরা করচিস !' প্রচণ্ড ক্রোধে ও মেগ্রোনার চুলের ঝুঁটি ধরে মেঝেতে ফেলে দেয়, তারপর যথেচ্ছ ভাবে চলে কিল চড় ঘুঁষি। মেগ্রোনা কিন্তু এ প্রহার নীরবে সহ্য করে। এত নির্যাতনেও তার মন নিঃসীম একটা আনন্দে ভরে ওঠে। ওকে ছেড়ে চলে যাবার কল্পনাতেই গ্রিগরি ক্ষেপে উঠেছে। এয়োতির কাছে এ-ও এক ধরনের সুখ ! এদিকে এত মার খাবার পরেও মেগ্রোনাকে কোনো প্রতিবাদ করতে না দেখে গ্রিগির রাগ আরও চড়ে যায়, তখন মেগ্রোনাকে ও নিষ্ঠুরের মতো প্রহার করে।

রাত্তিরে সর্বাঙ্গে কাটা-ছড়া আর অসহ্য ব্যথা নিয়ে মেগ্রোনা বিছনায় পড়ে পড়ে কাতরায় ! বিছনার অন্য প্রান্তে বসে গ্রিগরি তার দিকে আড় চোখে তাকায় আর মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে। অসীম মমতায় তখন ওর বুকের ভেতরটা ভিজে ওঠে। নিজেকে তখন ওর ভীষণ বিষণ্ণ আর করুণ লাগে। মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে ভাবে—অকারণে বেচারিকে এভাবে মারার কোনো মানেই হয় না।

'চুপ কর চুপ কররে মেগ্রোনা, আর কাঁদিস নে।' এলোমেলো স্বরে গ্রিগরি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। 'বলচি তো আমার দোষ। আর তোকেও বলিহারি, কেন তুই মুখে মুখে অমন কোরে তক্কো করলি ? কেন তুই ওসব কথা বলে আমার রাগটাকে বাড়িয়ে দিলি ?'

মেগ্রোনা কোনো জবাব দেয় না। সে জানে কেন বলেছিলো। সে খুব ভালো করেই জানে এমনি ধারা কথায় গ্রিগরির হাতে যেমন মার খাবে নির্মমভাবে, তেমনি আদর সোহাগও কুড়োবে তার চাইবে কিছু কম নয়। স্বামীর বুকের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সপে দিয়ে নিবিড় একমুঠো সোহাগ কুড়োবার লোভেই মেগ্রোনা ঠিক এমনি ভাবে নির্যাতন সহ্য করে প্রতিদিন।

'চুপ, চুপ কর লক্ষ্মীটি, সোনা আমার ! আর কোনোদিন তোকে মারবো না।' নিবিড় করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গ্রিগরি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, চুমু খায়। আর স্নিগ্ধ মধুর একটা আবেশে মেত্রোনার চোখের পাতাদুটো আপনিই মুদে আসে।

তক্তপোশের ওপারে জানলাটা খোলা, কিন্তু তা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। ঘরের ভেতরে একরাশ জমাট অন্ধকার আর গুমোট গরম।

'উঃ, এই কি জীবন ! একে কি বাঁচা বলে !' বুকের ভেতরের যন্ত্রণা চাপতে না পেরে গ্রিগরি অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। 'অন্ধকার গর্তের মধ্যে আমরা দুজনে যেভাবে বাস করি, শালা রাস্তার নেড়ি কুত্তাগুলোও বোধহয় এর চাইতে ভালো ভাবে বাস করে। এ যেন ঠিক জ্যান্তো কবর !'

অশ্রুসজল চোখে মেত্রোনা বলে, 'চ না, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।'

'আমি সে কতা বলচি না। আমরা যদি কোনো চিলেকোঠাতেও যাই, তবু আমরা সেই গর্তেই থেকে যাবো। মনের দুখ্যু আমাদের কোনোকালেও ঘুচবে না।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে থেকে মেত্রোনা কি যেন ভাবে।

ভগবান যদি দয়া করেন, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ওই কথা তো তুই রোজ বলিস। কিন্তু ঠিক হওয়া তো দুরের কথা, যতদিন যাচ্চে ততই দেকছি আরও খারাপ হচ্চে। আমরা আরও বেশি করে ঝগড়া-ঝাঁটি করচি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। আগে ঝগড়া ঝাঁটি হতো মাসে একবার কি দুবার। এখন প্রায় প্রতিদিনই হয়। শনিবার হলে তো কোন কথাই নেই। সকালে কাজ শুরু করতে করতেই গ্রিগরি মেত্রোনাকে বলতো, 'আজ সন্ধেবেলায় আমি কিন্তু শুঁড়ীখানায় মদ গিলতে যাবো।'

মেত্রোনা কোনো জবাব দিতো না, কেবল চোখ ঘোঁচ করে তাকাতো।

'কি রে, কথা বলচিস না যে ? খুব বাড় বেড়েচে তোর, ন্যা ?'

মনে মনে ব্যথা পেলেও মেত্রোনা কোনো জবাব দিতো না। সে জানে জবাব দিলেই এখন লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে। তাই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে কাজ করে যেতো, গ্রিগরির দিকে চোখ তুলে তাকাতোও না। আর যত বেলা বাড়তো গ্রিগরি রাগ ততই চড়তে থাকতো, যেন জবাববিহীন নিটোল একটা নিস্তব্ধতা ওকে গিলতে আসছে। সন্ধ্যের দিকে ও আর নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারতো না, মেত্রোনার উপেক্ষায় ওর চোখদুটো তখন আগুনের শিখার মতো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠতো।

আর একটু পরেই ভগ্নদূতের মতো এসে সেঙ্কা উঠোনে খবর দিতো অরলভদের ঘরে আবার লাগধুমাধুম খেল শুরু হয়ে গ্যাছে।

মারধোরের পালা শেষ করে গ্রিগরি সেই যে ঘর থেকে বেরুতো, কোনো কোনো দিন সারা রাতেও আর ঘরমুখো হতো না। পরের দিন চোখদুটো জবা ফুলের মতো লাল করে, কাদা মেখে ভুত হয়ে যখন ফিরে আসতো, মেত্রোনা নিঃশব্দে ওর পরিচর্যা করতো আর করুণায় তার চোখদুটো ছলছল করে উঠতো। আহা, বেচারি—কোথাও বিপদ আপদ না ঘটিয়ে তবু তো তার কাছেই ফিরে এসেছে !

গ্রিগরি মেত্রোনার দিকে তাকিয়ে বলতো, 'ওসব কিচ্ছু করতে হবে না। আমাকে এক গেলাস ভদকা দে দিকিনি, তাহলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গ্যাছে।'

সত্যিই তাই। পর পর দু'তিন গেলাস ভদকা পেটে পড়ার পর ও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতো। সারাদিন আপন মনে কাজ করতে। পাছে রেগে যায় সেই ভয়ে একটাও কথা বলতো না। কিন্তু মাঝে মাঝে এই নৈঃশব্দ্য, বুকের ভেতরের আত্মগ্লানি এমনই দুর্বিসহ হয়ে উঠতো যে কাজ ফেলে রেখে বিছনায় শুয়ে ও ছটফট করতো। মনে পড়তো ওদের বিয়ের প্রথম দিকের দিনগুলো কি আশ্চর্য সুন্দরই না ছিলো। তারপর একটু একটু করে ফিরে এই ছকে-বাঁধা যান্ত্রিক জীবন, যার সঙ্গে আজও পর্যন্ত ও কোনোরকম সন্ধি করতে পারলো না। এমনি করে সপ্তার পাঁচটা দিন ওরা কোনো রকম পরস্পরের সঙ্গে কথা না বলে কাটিয়ে দিতো।

কখনও ওর ছটফটানি অসহ্য হয়ে উঠলে মেত্রোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, 'এই মদ খেয়ে খেয়েই তুই একদিন মরবি।'

'ভালোই তো। তখন তুই বেশ ডানা কাটা পরী সেজে ঘুরে বেড়াতে পারবি।'

'ফের আবার নোংরা কথা বলচিস!'

ভ্রূ কুঁচকে মেত্রোনা স্বামীর মুখের দিকে তাকাতো। তারপর আর কোনো কথা না বলে সেখান থেকে সরে আসতো। গ্রিগরির চণ্ডাল-রাগকে মেত্রোনা মনে মনে ভয় পায়। তার জন্যে সে বহু সাধ্য-সাধনাও করেছে। ওকে না জানিয়ে চুপিচুপি জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভাগ্য গননা করিয়েছে, তুকতাক-জানা বুড়িদের কাছ থেকে মন্ত্রপূত শেকড়বাকড় এনেছে। তাতেও যখন ফল হয়নি সারাদিন উপোষ করে বড় বড় সাধু-সন্নাসীদের কাছে ধর্না দিয়েছে, স্বামীর সুমতি ফিরিয়ে আনার জন্যে নতজানু হয়ে কাতর প্রার্থনা করেছে।

এটাও যেমন সত্যি, অন্যদিকে তেমনি আবার বিয়ের প্রথম দিকে উচ্ছল হাসি-খুশিতে ভরা যে মানুষটা তার জীবনকে উজ্জ্বল আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিলো, সেই মানুষটারই প্রচণ্ড ঘৃণা আর বিদ্বেষ দিনের পর দিন তার বুকের ভেতরটাকে ম্লান বিষন্নতায় যেন পাথর বানিয়ে দিয়েছে।

এমনি ভাবে অন্ধকার এই গুহার মধ্যে ক্লান্তিকর একঘেঁযে জীবনের হাত থেকে মুক্তি-পেতে পারে এমন কিছুর প্রত্যাশায় দুটি মানুষের দিন কাটে।

একদিন সকালে প্রাতঃরাশ সেরে অরলভরা সবে কাজে বসতে যাবে, এমন সময় ওদের কুঠরির দরজার সামনে দেখা গেলো একজন জাঁদরেল পুলিস অফিসারের মূর্তি। ওকে দেখেই গ্রিগরি মেঝে থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, চকিতে গত কয়েকদিন মাতলামির বিশ্রী ঘটনাগুলো তার মনে পরতে স্পষ্ট ভেসে উঠতে লাগলো। নিশ্চয়ই তাই, না হলে···

সিঁড়ির দিকে ফিরে পুলিস অফিসারটি কাকে যেন বললো, 'সোজা চলে আসুন। হ্যাঁ···এই দিকে···'

'আরে বাব্বা, যা অন্ধকার! এ তো দেখছি পেত্নিকভের কবরখানা।'

একটু পরেই টুপি হাতে একজন তরুণ ভেতরে প্রবেশ করলো। গায়ে ধবধবে সাদা ডাক্তারদের ঢিলে বর্হিবাস, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, উঁচু মসৃণ কপাল, রোদে-পোড়া তামাটে মুখ চশমার পুরু কাচের ওপারে বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে দুটো চোখ। তরুণ একটু এগিয়ে এসে গাঢ় স্বরে বললো, 'সুপ্রভাত! প্রথমেই নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই—আমি

স্বাস্থ্য-দফতরের একজন সদস্য। দেখতে এসেছি আপনারা কি রকম পরিবেশে বসবাস করেন…কিন্তু এখানের বদ্ধ বাতাস শুধু দূষিতই নয়… হুঁ, যা ভেবেছি তাই, খুবই নোংরা…'

গ্রিগরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। চোখ থেকে আতঙ্কের ভাবটা মুছে গিয়ে ওর দু ঠোঁটে ফুটে উঠলো ম্লান একটা হাসির রেখা। তরুণের সরল আন্তরিক ভঙ্গি, স্বাস্থ্যদীপ্ত মুখে তারুণ্যের লালিমা, ঠোঁটের ওপর গোঁফের শীর্ণ রেখা…সব মিলিয়ে তাকে গ্রিগরির দারুণ ভালো লাগলো। বিশেষ করে তার অনাবিল হাসিটুকু মনে হলো এই আঁধার ঘরটাকে যেন এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে তুলেছে।

'শুনুন, আপনাদের কয়েকটা কথা বলি।' কথা বলতে বলতেই তরুণের চোখদুটো ঘরের চারদিকে ঘুরে চলছে। 'ঘর-দোর যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। ঘরের কোণে কোণে এইভাবে ময়লা জমিয়ে রাখবেন না, এতে ঘরের আব-হাওয়া দুষিত হয়। আর কাজ হয়ে গেলেই বালতির নোংরা জল ফেলে দিয়ে আবার পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখবেন।' হঠাৎ গ্রিগরির দিকে চোখ পড়তেই তরুণ থমকে ওকে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, এত গম্ভীর কেন ? দেখি আপনার হাতটা।'

তরুণ ডাক্তার গ্রিগরির ডান হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখলো। তার সরল আন্তরিক ভঙ্গি দেখে গ্রিগরি কিছুটা অপ্রতিভ না হয়ে পারলো না। মেত্রোনার দু চোখে ফুটে উঠছে শুদ্ধ বিস্ময়, ঠোঁটের প্রান্তে একটুকরো চাপা হাসি।

'দেখি আপনার পেটটা। কোনো ব্যথাট্যাথা নেই তো ? উঁহু, এতে লজ্জার কিছু নেই …আমাদের সবারই পেটে পিলে আছে। যদি কোনো অসুখবিসুখ থাকে বা কষ্ট হয়, আমরা আপনার চিকিৎসা করবো, দেখবেন দুদিনে সেরে উঠেছেন।'

ডাক্তারের কথায় গ্রিগরি হেসে উঠলো। 'না না, আমাদের কোনো অসুখবিসুখ নেই। আমাকে যে একটু এদিক ওদিক দেখচেন, সেটা অসুখের জন্যে নয়…মানে, আপনাকে সত্যিই বলি, আমি মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু টানি· ·'

'একটু-আধটু নয়, বেশ ভালো পরিমানেই টানেন। সে আমি ঘরে ঢুকে গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পেরেছি।'

তরুণের কথা বলার ভঙ্গিতে গ্রিগরি হো হো করে হেসে উঠলো। মেত্রোনাও হাসি চাপতে পারলো না, মুখ ফিরিয়ে ফিক ফিক করে হাসলো। সবার গলা ছাড়িয়ে গেলো তরুণের। কিন্তু সে-ই থামলো সবার আগে। হাসি থামিয়ে শান্ত স্বরে মিষ্টি করে বললো, 'আমি জানি, যাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয়, তাদের মাঝেমধ্যে একটু-আধটু পান না করলে চলে না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াটা কোনো মতেই উচিত নয়। তাছাড়া চারদিকের অবস্থা এখন খুব খারাপ, ভীষণ মড়ক হচ্ছে।'

তারপর থমথমে স্বরে, প্রাঞ্জল ভাষায় ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝালো কলেরা কি, কেন হয়, কিভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। কথা বলতে বলতেই সে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলো ! দরজার পেছনে, উনুনের চারপাশে, পরদার ওপরে উঁকিঝুঁকি মারলো, জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে কি যেন শুকলো। আর গ্রিগরি তার প্রতিটা শব্দ একাগ্র মনে শুনলো তার পর্যবেক্ষণের প্রতিটা প্রদ্ধতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো। প্রখর অথচ স্নিগ্ধ একটা

ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গ্রিগরির চোখের ভাষা, ওর সমগ্র সত্তাই যেন বদলে গেছে। মেত্রোনাও তন্ময় হয়ে শুনছে। পুলিস অফিসারটি একফাঁকে কখন যে কেটে পড়েছে ওরা টেরও পায়নি!

'তাই বলছিলাম প্রতিদিন যতটা সম্ভব ঘরদোর পরিষ্কার রাখবেন। রাস্তার মোড়ে ওই যে নতুন বাড়িটা তৈরি হয়েছে, ওখান থেকে পাঁচ কোপেক দিয়ে যত খুশি চূণ আনতে পারবেন। এনে ঘরের কোণে কোণে সব ছড়িয়ে দেবেন! আর মদ খাওয়াটা কমিয়ে দিন। ওতে শরীরের শক্তি বাড়ে না, বরং দিনদিন কমে যায়। আজ তাহলে চলি, কেমন? আবার খুব শিগগিরই আপনাদের দেখতে আসবো।'

হঠাৎ যেমন এসেছিলো, তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেলো। কেবল অরলভদের মনে গভীর ছাপ ফেলে গেলো তার উজ্জ্বল চোখের চাউনি, তার দীপ্ত হাসির রেখা। তার অনাহুত এই অসীম উৎসাহ ওদের বিষাদ-মগ্ন মূঢ় জীবনটাকে যেন আলোয় উদ্ভাসিত করে দিলো।

'নাঃ, ছোকরা সত্যিই জাদু জানে!' স্তব্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর গ্রিগরিই প্রথম অস্ফুট স্বরে বললো। 'অথচ সবাই বলে ডাক্তারেরা নাকি বিষ দিয়ে মানুষ মেরে ফ্যালে। ধ্যাৎ, তা কখনও হয়! যার এমন সুন্দর চেহারা, এমন মিষ্টি কথা, সে কখনও খুনী হতে পারে না। কেমন সুন্দর এলো, যেন কত আপনার জন... বললো তোমরা যাতে ভালো থাকো, অসুখ-বিসুখ না করে, সেই জন্যে দেখতে এসেছি। বললো বালতির জল সাফ রাখো, এখানে ওখানে চূণ ছড়াও···কে জানতো শালার চূণ এত দরকারী! সবচেয়ে মজার কথা কি জানিস মেত্রোনা, ও ব্যাটা আমার মনের খবর ঠিক টের পেয়ে গ্যাছে। বলে কিনা যাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয়, মদ তো তারা একটু-আধটু খাবেই। তুই তো নিজ কানে শুনলি, শুনলি না বল?'

'হুঁ, তা তো শুনলুম।'

'তাহলে দেনা মাইরি এক পাত্তর।'

কোনো প্রতিবাদ না করে মেত্রোনা নিঃশব্দে লুকনো বোতল থেকে খানিকটা ভদকা ওর গেলাসে ঢেলে দিলো। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ছেলেটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার! ও হয়তো আর পাঁচজনের মতো পয়সা নিয়ে গরীব লোকজনদের বিষ খাইয়ে মারে না।'

'পয়সা! কার কাছ থেকে আবার পয়সা নিতে যাবে?'

'কেন? সরকারের কাছ থেকে।'

'কে বললো তোকে একথা শুনি?'

'সব্বাই বলে। সেদিন বাড়ি রঙ করা মিস্ত্রির রাঁধুনীটাও বলেছিলো।'

'যারা বলে, তারা নিরেট মুখ্যু। এতে সরকারের কি লাভ? যারা মরবে তাদের সব্বাইকে কবর দিতে গেলে জমি কিনতে হবে, মাটি খুঁড়তে হবে, কফিন বানাতে হবে—কত খরচা, তুই একবার ভেবে দ্যাখ। এ খরচা যদি সরকারী তহবিল থেকে দিতে হয়, তাহলে এত ঝক্কি পোয়াবার দরকার কি?' সোজা সাইবেরিয়াতে চালান করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। বরং সেখানে এদেরকে দিয়ে খাটালে সরকারের দুপয়সা রোজগার হতো

আর শীতে জমে মরে গেলে নিজেরাই নিজেদের খরচে কবর দিতো। না, এ ছোকরা কিন্তু আর পাঁচজনের মতন নয়। একে দেখলেই যেন ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, তাই কিনা তুই বল ?'

সেদিন সারাক্ষণ ওরা কেবল সেই তরুণ ডাক্তারটির সম্পর্কেই বলাবলি করলো, সেই মুখ সেই হাসিটুকুকে মানসপটে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। এমন কি সাদা বহির্বাসে যে একটা বোতাম ছিলো না, সে সম্পর্কেও ওরা আলোচনা করলো। বোতামটা কোন্ দিকের সে নিয়ে মেত্রোনার সঙ্গে প্রায় এক চোট ঝগড়াই লেগে গেলো। মেত্রোনা বললো ডান দিকের বোতামটা খসে গেছে, গ্রিগরি বললো না, বাঁ দিকেরটা। এ নিয়ে দুজনের তর্কাতর্কি। গ্রিগরি তো মেত্রোনার পিঠে দুটো কষিয়েই দিলো। মেত্রোনা কিন্তু রাগ করলো না, উলটে বরং খানিকটা ভদকা ঢেলে গেলাসটা এগিয়ে দিলো স্বামীর দিকে। পরের দিন সকালে উঠেই দুজনে কোমর বেঁধে ঘরদোর সাফসুফ করার কাজে লেগে পড়লো এবং নিজেদের সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতায় নিজেরাই হেসে গড়িয়ে পড়লো। তখনই আবার শুরু হয়ে গেলো সেই তরুণটির সম্পর্কে আলোচনা।

'সোনার টুকরো ছেলে!' গ্রিগরি উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললো। সত্যিরে মেত্রোনা, যত ভাবছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি! বলা নেই কয়া নেই, আপনজনের মতো আমাদের দেখতে এলো—কি না, আমাদের মতো নিচু জাতের লোকদের ভালো করতে চায়!' এমন কি রাত্তিরে শুতে যাবার পরেও দুজনে বাচ্ছাদের মতো অনাবিল উচ্ছলতায় কলকল করতে লাগলো, তারপর অনেক রাত্তিরে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরে ঘুম ভাঙলো বাড়িওকরা মিস্ত্রির সেই রাঁধুনী-ঝিয়ের ডাকে। দরজার সামনে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিটোল শরীর, গোলগাল টুকটুকে লাল মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। অরলভদের জেগে উঠতে দেখে ও চোখ বড় বড় করে বললো, 'ওমা, তোমরা এখনও পড়ে পড়ে ঘুমচ্চো! আর ওদিকে যে ওলা বিবি বাড়িতে ভর করেছে।'

'কি সব পাগলের মতো যা তা বোকচো!' গ্রিগরি চেঁচিয়ে ওঠে।

'ইস, এদিকে আমি কিনা কাল রাত্তিরে বালতির নোংরা জল ফেলতে ভুলে গেচি!' রাঁধুনী বললো, 'আমি বাপু এখানে আর একদণ্ডও থাকচি না, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে আজই গ্রামে চলে যাচ্চি।'

গ্রিগরি বিছনা ছেড়ে লাফিয়ে নামলো, 'কেন, কার হয়েচে?'

'ওই যে বাজনদারের গো! কাল রাত্তির থেকে হয়েচে, কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করচে...'

'বা-জ-ন-দার!' স্বগতস্বরে গ্রিগরি বিড়বিড় করে বলে। ও যেন এখনও বিশ্বাসই করতে পারছে না। এমন হাসিখুশি আর স্ফূর্তিবাজ একটা লোক, গতকালও যে ময়ূরের মতো পেখম তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে, আজ সে কাটা-পাঁঠার মতো ছটফট করছে! 'চলো, দেখি তো কি ব্যাপার।'

মেত্রোনা ভয়ে শিউরে ওঠে। 'যাসনি রে, বড্ড ছোঁয়াচে ব্যামো।'

'ছোঁয়াচে তো কি হয়েচে? একটা লোক মরতে বসেচে...' কথা বলতে বলতেই ও জুতোজোড়াটা পায়ে গলিয়ে নেয়। চুল আঁচড়ালো না, বোতাম আঁটলো না, কামিজটা

কোনো রকমে গায়ে চড়িয়েই ও দরজার দিকে ছুটে গেলো। পেছন থেকে মেয়োনা ওর হাত চেপে ধরলো। মেয়োনার হাতটা তখন থরথর করে কাঁপছে।

'যাসনি গ্রিগরি!'

'সরে যা বলচি! নাহলে তুলে এক আছাড় দোবো।' গ্রিগরি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

উঠোনটা নিস্তব্ধ নিঝুম। অ্যাকোর্ডিয়ান-বাদকের ঘরের চৌকাঠ মাড়াবার আগেই গ্রিগরির সারা শরীর অজানা একটা আতঙ্কে ছমছম করে উঠলো। অন্যদিকে আবার—সারা বাড়িতে এত লোক, অথচ ও ছাড়া অসুস্থ মানুষটাকে আর কেউ দেখতে আসেনি, একথা ভাবতেই বিপুল আনন্দে ওর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। এবং এ-উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠলো, যখন দেখলো দোতলার জানলা থেকে দর্জিরা সভয়ে ওকে লক্ষ্য করছে। তাচ্ছিল্যে মাথা দুলিয়ে আপন মনে শিস্ দিতে দিতে গ্রিগরি কিসলিয়াকভের ঘরে প্রবেশ করলো, দেখলো ভেতরে সেঙ্কা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করচিস?'

ওর হঠাৎ কণ্ঠস্বরে সেঙ্কা চমকে উঠলো। 'দ্যাখো গ্রিগরি-খুড়ো, ব্যাঙের ছাতার মতন কেমন চুপসে গ্যাছে! বেচারি যন্তন্নায় খুব কষ্ট পাচ্ছে!'

গ্রিগরি কোনো কথা না ব'লে নিঃশব্দে কিসলিয়াকভেয় মুখের দিকে তাকালো। ঘরের বদ্ধ বাতাস দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে।

সেঙ্কা সসংকোচে জিগেস করলো, 'ওকে একটু জল খেতে দেবো?'

গ্রিগরি সেঙ্কার মুখের দিকে তাকালো, দেখলো ভয়ে ছেলেটা চোখ মুখ শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। 'যা, একটু পরিষ্কার জল নিয়ে আয়।'

সেঙ্কা বেরিয়ে যাবার পর গ্রিগরি কিসলিয়াকভের সামনে এসে দাঁড়ালো। সৌখিন পোশাক পরে বেচারি বিছনার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে, তক্তপোশের কাণাদুটো আঁকড়ে রয়েছে শক্ত করে। ঝকঝকে পালিস-করা সবুজ পাদুটো ঝুলছে বিছনার বাইরে, মাঝে মাঝে অস্থির আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গ্রিগরির কণ্ঠস্বরে কিসলিয়াকভ ক্ষীণ স্বরে জিগেস করলো, 'কে?'

'আমি, গ্রিগরি। কি ব্যাপার পাভলোভিচ, কাল দু পাত্তর বেশি টেনে ছিলে নাকি?'

অ্যাকর্ডিয়ান-বাদক প্রচণ্ড কষ্ট করে কোনো রকমে মুখ ফেরালো। ইস্, চেনাই যায় না! চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে, মণিদুটো আহত পশুর মতো জ্বলজ্বল করছে, পাতার নিচে পড়েছে কালচে ছোপ। মুখখানা সিঁটিয়ে নীল হয়ে গেছে, চোয়ালের হাড়দুটো চামড়া ফুঁড়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সারা মুখে মৃত্যুর বিবর্ণ পণ্ডুরতা, কেবল বিস্ফারিত চোখের মণিদুটো দেখলে বোঝা যায় এখনও বেঁচে আছে। হিমেল আতঙ্কে গ্রিগরির সারা শরীর বিবস হয়ে এলো, গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠলো। ওর ইচ্ছে হলো এখুনি ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়, কিন্তু পারলো না। তার আগেই গাঢ় ছায়ার মতো স্থবির ঠোঁটদুটো নড়ে উঠলো, ঠোঁটের কোলে নীলচে ফেনা। 'আঃ, আমি আর বাঁচবো না!'

অর্ধোচ্চারিত অস্পষ্ট এই অল্প কটি শব্দে গ্রিগরি পাথরের প্রতিমূর্তির মত নিশ্চল হয়ে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে সেঙ্কা ভেতরে প্রবেশ না করলে হয়তো ও সত্যিই ছুটে

পালাতো। সেঙ্কার জামাটা ঘামে ভিজে গেছে, তখনও রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। হাতের বালতিটা সে ঘরের এক কোণে নামিয়ে রাখলো।

'মানুষ নয়, সব কুত্তার বাচ্ছা! এখান থেকে আমাকে কিছুতেই জল নিতে দিতে দিলো না…সেই স্প্রিদোনভদের কুয়ো থেকে আনতে হোলো…' কথা বলতে বলতে এক গেলাস জল তুলে সে গ্রিগরির হাতে দিলো। 'আমাকে বললো কি না, তোদের বাড়িতে কলেরা হয়েছে, এখানে জল হবে না—ভাগ্। আমি বললুম—আমাদের বাড়িতে যখন হয়েছে, তোমাদেরও হবে…তোমরাও অক্কা পাবে। তখন কি করলো জানো, গ্রিগরি-খুড়ো? আমার কানদুটো এ্যাইসান জোরে মুলে দিলো যে এখনও জ্বালা করছে।' কানে হাত বোলাতে বোলাতে সেঙ্কা হাসলো।

গ্রিগরি এক চুমুকে গেলাসের সব জলটুকু নিঃশেষ করে ফেললো।

'আঃ!'

'একটু জল খাবে, প্যাভলোভিচ?' গ্রিগরি ঝুঁকে এলো।

'দাও।'

সেঙ্কা এক ছুটে গেলাসটা আবার ভর্তি করে এনে মুমূর্ষের বিশীর্ণ ঠোঁটের সামনে ধরলো। গ্রিগরি যেন স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পেলো জল খাওয়ার ঢক-ঢক শব্দ, তারপরেই শুনলো সেঙ্কা যেন বলছে—ওর জামা জুতো ছাড়িয়ে বিছনায় ভালো করে শুইয়ে দোবো, গ্রিগরি-খুড়ো? একটু পরে ও শুনতে পেলো রাঁধুনীর গলার স্বর। জানলার সার্সিতে ওর ভয়-বিহ্বল গোল মুখখানা থেবড়ে রয়েছে। সেখান থেকে চোখ বড় বড় করে উঁচু গলায় ও চেঁচিয়ে বলছে, এক গেলাস রামের সঙ্গে দু চামচে ঝুল মিশিয়ে খাইয়ে দাও, দেখবে সেরে যাবে। কে যেন উঠোন থেকে বললো—না না, ভদকার সঙ্গে খানিকটা আচাড় গুলে খাইয়ে দাও। হঠাৎ কি যেন মনে পড়তেই গ্রিগরি চমকে উঠলো। কপালটা দু আঙুলে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরে কি যেন ভাবলো, তারপর এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

ওকে ওই ভাবে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে রাঁধুনী চেঁচিয়ে উঠলো, 'হেই গে, মুচিটাকেও কাল-রোগে ধরেছে!'

মেত্রোনা দাঁড়িয়েছিলো ওর পাশেই, ওর কথা শুনে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে অস্ফুটে বললো, 'ওমা, কি অলুক্ষণে কথা গো! ওর কেন হতে যাবে?'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। রাঁধুনীর অস্থির পরিত্রাহি চিৎকারে পেতুনিকভের বাড়ির চারপাশে, এমনকি সামনের রাস্তাতেও তখন রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। সবার চোখেমুখে একই আতংক। উত্তেজনায় হতাশায় সতর্ক ভঙ্গিতে ফিসফিস করে কথা বলছে, গ্রিগরির বেপরোয়া ওস্তাদি নিয়ে কানাকানি করছে। সেঙ্কা মাঝে মাঝে উঠোনে এসে রোগীর খবর নিয়ে যাচ্ছে। বেলা যত বাড়ছে, ভিড় তত ঘন হচ্ছে।

হঠাৎ ভিড়ে মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই যে, অরলভ আসছে!'

সবাই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো ঘোড়ায়-টানা গাড়ির ভেতরে সাদা পোশাক-পরা ছোকরা ডাক্তারের পাশে গ্রিগরি বসে রয়েছে। কোচোয়ান গাড়িটাকে সোজা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভরাট গলায় সমানে চেঁচাচ্ছে, 'এই, হঠো, হঠো সব—পথ ছাড়ো!'

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে বাড়ির দরজার সামনে এসে গাড়িটা থামতেই গ্রিগরি লাফিয়ে নেমে পড়লো। ওর পেছন পেছন নামলো সেই তরুণ ডাক্তার। টুপিটা মাথার এক পাশে হেলে পড়েছে, মসৃন কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম, হাঁটু ছাপিয়ে নামা ধবধবে সাদা বহির্বাসটার এখানে ওখানে ছোট ছোট কয়েকটা ফুটো, অ্যাসিডে পুড়ে গেছে। আশে-পাশের উৎসুক মুখগুলোর ওপর একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভারি সুন্দর ভঙ্গিতে ও গ্রিগরিকে জিগেস করলো, 'কই ভাই অরলভ, তোমার রোগী কোন ঘরে?'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

পাশ থেকে কে যেন ফিস ফিসিয়ে বললো, 'এইরে, রাঁধুনী-মাসীটা আসচে!'

'দেখো, সাধবান! নইলে এক্ষুনি তোমায় সোজা কড়ায় চাপিয়ে দেবে!'

'অত সস্তা নয়! সেই ঝোল আমি নিজে তার গলায় ঢেলে দোবো!'

ভয়-চকিত উৎকণ্ঠার মধ্যেই সবাই হোহো করে হেসে উঠলো।

স্তব্ধ বিস্ময়ে কে যেন বললো, 'এরা কি লোক গো, একটুও ভয়-ডর নেই!'

'অরলভটা তো একটা পাঁড় মাতাল!'

'ছোট জাতের অত ভড়-ডর করলে চলে না, বুঝলে?'

'ওই যে! ওরা ওকে বয়ে আনচে!'

'না, অরলভটার বুকের পাটা আছে!'

'দেখে, দেখে অরলভ! পাটা বুলছে, আর একটু তুলে ধরো, ভাই! হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার তুলে দাও।' রোগীকে গাড়িতে তোলার পর তরুণ কোচোয়ানকে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি একে নিয়ে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, অরলভ ভাই, তোমাকে যে কথা বলছিলাম—রোগটা তো খুব ছোঁয়াচে, সংক্রামক রোগীর ঘর-দোর ভালো করে সাফ করা দরকার। তুমি কি একাজে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে? তাতে তোমার হাতে-কলমে শেখাও হবে। কি, কোনো আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি? না না, কি যে বলেন!' গর্বে গ্রিগরির ছাতি ফুলে উঠলো।

সেঙ্কা দাঁড়িয়ে ছিলো ওদের ঠিক পাশেই, সে বললো, 'আমিও আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

'তুমি! তুমি যে বড্ড ছোট, ভাই! তুমি এখানে কি কাজ করো?'

'বাড়ি-রঙকরা মিস্ত্রিদের কাছে কাজ শিখি।'

'কলেরায় তোমার আবার ভয় করবে না তো?'

'আমার?' সেঙ্কা অবাক চোখে তাকালো। 'কোনো কিছুতে আমি অত ভয় পাই না।'

'সাব্বাস! এ রকম ছেলেই তো চাই। শোনো, তোমাদের দুজনকে আমি কয়েকটা দরকারী কথা বলবো...' সামনের ভাঙা শ্লেজটার ওপর তরুণ বসলো।

মেত্রোনা কখন উদ্বিগ্ন অথচ হাসি-হাসি মুখে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি। তার পেছনে রাঁধুনী, ওর চোখের পাতাদুটো ভেজা। বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে তখন অনেকেই ওদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ওদেরকে দেখে তরুণ ভাঙা শ্লেজটার ওপর উঠে দাঁড়ালো, দুঠোঁটের মাঝে চাপা মিষ্টি একটুকরো হাসি। '...সব রোগেরই আসল কথা হচ্ছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা। নিজেদের দেহকে যত পরিষ্কার

রাখবেন, ঘরদোর যত পরিচ্ছন্ন রাখবেন, খোলামেলা আলো-বাতাসে যত চলাফেরা করতে পারবেন, রোগের প্রকোপও তত কমে যাবে।'

'রোগশোক হলে লোকে কোথায় ঠাকুরদেবতাকে ডাকবে, তা নয় যত সব অনাসৃষ্টির কথা !' বিস্ফারিত চোখে রাঁধুনী বিড়বিড় করে।

পাশের কে একজন তাকে সমর্থন করলো। 'তা নয় তো কি ? কত বড়লোকেই তো ভালো খাচ্ছেদাচ্ছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরছে, তা বলে কি তারা মরছে না ?'

মেত্রোনার পাশে দাঁড়িয়ে গ্রিগরি একমনে ডাক্তারের কথাগুলো শুনছে আর আকাশ-পাতাল কি সব যেন ভাবছে। এমন সময় কে ওর জামার হাতা ধরে টানলো। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখলো—সেঙ্কা, মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। ফিসফিস করে ও বললো, 'আচ্ছা গ্রিগরি খুড়ো, কিসলিয়াকভটা তো মরতে চললো, আত্মীয়-স্বজন ওর তো কেউ নেই। তাহলে ওর অ্যাকর্ডিয়ানটা কে নেবে ?'

'চুপ কর্, হতভাগা !' গ্রিগরি ওকে ভাগিয়ে দিলো।

সেঙ্কা ফিরে এসে আবার অ্যাকর্ডিয়ান-বাদকের ঘরের জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করে।

তরুণ ডাক্তার তখনও বলে চলেছে, 'ঘর দোর উঠোনে চুণ ছড়াতে একদম ভুলবেন না।'

নানান ঝামেলার মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে দিনটা কোথা দিয়ে যেন কেটে গেলো। বিকেলবেলায় চা খাবার সময় মেত্রোনা জিগেস করলো, 'ওই ডাক্তারের সঙ্গে আজ আবার কোথায় গিয়েছিলিস ?'

গ্রিগরি নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকালো, কোনো জবাব দিলো না।

অ্যাকর্ডিয়ান-বাদকের ঘরদোর সাফ করার পর ও চলে গিয়েছিলো তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে, তারপর তিদটে নাগাদ আবার ফিরে এসেছিলো ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ একটা মন নিয়ে। চায়ের টেবিলে বসার আগে পর্যন্ত বিছনায় শুয়ে চুপচাপ গুম হয়ে পড়েছিলো। দু একবার চেষ্টা করেও মেত্রোনা ওকে দিয়ে একটা কথাও কওয়াতে পারেনি, সবচেয়ে অবাক কাণ্ড গ্রিগরি তার ওপর একবার রেগেও ওঠেনি। মনে মনে মেত্রোনার উদ্বিগ্নতা এতে বাড়তেই থাকে। নারী মন, বিশেষ করে স্বামীকে কেন্দ্র করে যার একমাত্র জগৎ, নিশ্চয়ই তার তো ভয় পাবারই কথা। মানুষটার কি এমন হলো যে মুখে রা নেই, সারাক্ষণ কড়িকাঠের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মেত্রোনা আবার জিগেস করল, 'কি ব্যাপার, অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি তো ?'

পেয়ালার বাকি চাটুকু এক চুমুকে শেষ করে জামার হাতায় গোঁফ মুছে গ্রিগরি পেয়ালাটা মেত্রোনার দিকে ঠেলে দিলো। তারপর ভ্রূ কুঁচকে ম্লান স্বরে বললো, 'ডাক্তারের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলুম।'

মেত্রোনা শিউরে উঠলো। 'ওই কলেরা হাসপাতালে ?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে আরও অনেক রুগী আছে ?'

'কিসলিয়াকভকে নিয়ে তিপ্পান্নজন। ওদের মধ্যে কয়েকজন ভালোও হয়ে গ্যাছে। সকালে তো দেখলুম বেশ হেঁটে-চলে বেড়াচ্চে।'

'সব্বার কলেরা হয়েছিলো না হাতি! আমি বিশ্বাস করি না। হয়তো এমনি ধরে এনেছিলো, এখন লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে—দ্যাখো, কেমন সারিয়ে দিয়েচি!'

'আহাম্মুক আর কাকে বলে। সবাই তোর মতন মাথামোটা মুখ্যু মেয়েমানুষ নয়, বুঝলি ?' ক্রোধে গ্রিগরির চোখদুটো জ্বলে উঠলো। তবু নিজেকে ও সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললো, 'একে তো ঘটে বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, তার ওপর বোঝালেও বুঝবি না। আমার হয়েছে জ্বালা!'

চায়ের পেয়ালাটা আবার ভরে দিয়ে মেত্রোনা ভয়ে ভয়ে জিগেস করলো, 'আমার ঘটে না হয় বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, তা তুই এত সব জানলি কোত্থেকে ?'

গ্রিগরি কোনো কথা বললো না, মাটির চাপড়ার মতো একেবারে চুপচাপ। নিভন্ত উনুনে চাপানো কেটলিটা থেকে মৃদু একটা সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে! ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাসে ভেসে আসছে রঙ-তেল, কার্বলিক আর নোংরা আবর্জনার গন্ধ। পেয়ালার মধ্যে চামচে দিয়ে চিনি নাড়ার শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মেত্রোনা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। চামচটা পিরিচের গায়ে দুএকবার ঠুকে গ্রিগরি নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলো। তারপর হঠাৎই একসময়ে বললো, 'সত্যিই, ওখানের সবকিছু যে কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। নার্স থেকে বেয়ারা-দরোয়ান পর্যন্ত সব্বার ধবধবে সাদা পোশাক। রুগীদের প্রত্যেকদিন ভালো করে চান করানো হয়, ভালো ভালো খেতে দেয়, একটু করে মদ দেয়। শালার গন্ধেই যেন পেট ভরে যায়। তার ওপর সেবা-যত্ন তো আছেই। অথচ এদিকে আমরা বছরের পর বছর গর্তে পড়ে পড়ে পচচি, কেন বেঁচে আছি তাই জানি না। আর ওদিকে লোকটা মরবে জেনেও তার পেছনে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢালচে। আরে বাপু, হাসপাতালে ভালো ভালো খাবার আর মদের পেছনে তোরা যে-টাকা খরচা করচিস, সেই টাকাটা যারা বেঁচে আছে তাদের জন্যে যদি খরচা করতিস তো তারা আর একটু ভালো ভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে পারতো।'

ও কি বলছে মেত্রোনা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, তবে এটুকু বুঝলে ও যা বলছে তা সম্পূর্ণ নতুন এবং ওর বুকের মধ্যে যাকিছু গুমরে উঠছে সে সবই মেত্রোনার নির্বুদ্ধিতার জন্যে। তাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করলো যদি সান্ত্বনায় গ্রিগরির বুকের ভার কিছুটা লাঘব করা যায়। তুই অত ভাবচিস কেন, ওরা যা করবে নিশ্চয়ই ভালো বুঝেই করবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্রিগরি আড় চোখে তাকালো। 'ওরা কি করচে না করচে সে নিয়ে মাথা ঘামাচ্চি না, আমি ভাবচি নিজের কথা। এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো, কবে কলেরা এসে আমাকে ধরবে আর ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালের খাতায় জমা করে দেবে·· উঁহু, সেটি হবে না। পিত্ততর ইভানোভিচ ঠিকই বলেচে—ভাগ্যের মুখে তুড়ি মেরে জোরসে কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়ো, তখন নিজে চোখেই দেখতে পাবে কে জিতচে আর কে হারচে। ঠিক, খুব ঠিক কথা। আমিও মরদের বাচ্চা! তাই কি ভেবেচি জানিস ? ভেবেচি আমিও হাসপাতালের কাজে যোগ

দোবো···তার মানে সোজা সিংহের মুখে আমার মাথাটা পুরে দোবো ! যদি কামড়াতে আসে আমিও ছাড়াবো না, শরীরের সমস্ত তাকদ দিয়ে সোজা লড়ে যাবো। ফি মাসে বিশ রুবল মাইনে, তার ওপর নি-খরচায় থাকা-খাওয়া। তার জন্যে জীবনটাও যেতে পারে, কিন্তু এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

প্রথম দিকে মেত্রোনা ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলো, কিন্তু কথাটা শেষ হতে না হতেই তার ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো। 'নিশ্চয়ই ওই ছোকরা ডাক্তারটাই তোর কানে মোন্তর দিয়েচে ?'

'মোন্তর ! মোন্তর বলতে তুই কি বোঝাতে চাইচিস ?' গ্রিগরি এইসান জোরে টেবিলের ওপর ঘুঁষি মারলো যে পেয়ালা-পিরিচগুলো ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। 'আমার নিজের চোখ-কান নেই, আমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা নেই যে অন্যের কাছে মতলব নিতে যাবো ?'

'বেশ, তা নয় হলো। কিন্তু আমার কি হবে ?'

'কেন, তোর আবার কি হতে যাবে ?'

মুখে বললেও, মনে মনে ভাবলো—তাই তো, এ দিকটা তো ভাবা হয়নি। তাকেও বাড়িতে রেখে যেতে পারে, সবাই তো তাদের বউদের বাড়িতে রেখে রোজগারের ধান্ধায় বেরোয়। কিন্তু মেত্রোনাকে এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়াটা ঠিক নয়। ওই যে কথায় বলে না—ওদের মন নয়, মতি ; এও হয়েছে ঠিক তাই। ওদের চোখে চোখে না রাখলেই পাখি শিকলি ছিঁড়ে ফুড়ুত করে উড়ে পালাবে ! তবু তাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে গ্রিগরি বললো, 'তুই এখানে থাকবি, আমি ফি মাসে তোর জন্যে টাকা পাঠাবো।'

'বেশ, তাই পাঠাস !'

মেত্রোনার শান্ত গলার স্বর, চাপা ঠোঁটের হাসি গ্রিগরির বুকের মধ্যে ঈর্ষার আগুন ধরিয়ে দিলো। নিশ্চয়ই গোপনে কারুর সঙ্গে আশনাই চলছে ! তবু মনের ভাব স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতে ওর ইচ্ছে হলো না। 'আমি চলে গেলে তোর তো খুব মজা, তাই না ?'

'যাস না। আমি তো আর যাবার জন্যে তোকে মাথার দিব্বি দিইনি।'

'দিসনি, কিন্তু মনে মনে তুই তাই চাস ওখানে গিয়ে আমার অসুখ-বিসুখ করুক আর আমি মরে যাই !' কোনো জববে না দিয়ে মেত্রোনাকে চুপ করে থাকতে দেখে গ্রিগরির মাথায় রক্ত চড়ে উঠলো। 'ঠিক আছে, আমিও তোর মজা দেখাচ্ছি !'

কথাটা বলেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে টুপিটা নিয়ে ও ঝড়ের মতো ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মেত্রোনা একা দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো, ভাবার চেষ্টা করলো গ্রিগরি এখন কোথায় যেতে পারে। শুঁড়িখানায় ? সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পারলেও, এটা সে বুঝতে পারলো ওর মজা দেখানোর পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ নতুন। ঘুলঘুলি থেকে বিদায়-সূর্যের একটুকরো রাঙা আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়েছে সামনের দেওয়ালে। চোখে ব্যথা ধরে না যাওয়া পর্যন্ত মেত্রোনা সেদিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। তারপর উঠে পেয়ালা-পিরিচগুলো সরিয়ে রেখে বিছনায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

গ্রিগরি যখন ফিরলো সন্ধ্যে উতরে গেছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেই সে বুঝতে পারলো ও এখন সরিফ মেজাজে আছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বিছনার সমনে এসে ও

মেত্রোনার পাশে বসলো।

মেত্রোনা জিগেস করলো, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?'

গ্রিগরি হাসতে হাসতে বললো, 'বল্ দিকিনি কোথায় ছিলুম ?'

মেত্রোনা বিছনায় উঠে বসলো। 'তা আমি কেমন করে বলবো ?'

'এবার থেকে তুইও আমার সঙ্গে কাজ করতে যাবি।'

'আমি ! কোথায় ?'

গ্রিগরি বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসলো। 'হাসপাতালে, যেখানে আমি কাজ পেয়েচি।'

হঠাৎ দুহাতে গ্রিগরিকে জড়িয়ে ধরে মেত্রোনা ওর মুখে চুমু দিলো, ওর বুকে মুখ ঘষলো। গ্রিগরি এমনটা ঠিক আশা করেনি, নিশ্চয়ই এটা তার স্বামী ভুলানোর কোনো ছলনা। তাই মেত্রোনাকে ও ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না।'

'তার মানে ?'

'মানে আর কি ? তুই কি ভাবিস তোর ন্যাকামির হাড়হদ্দ আমি কিছু বুঝি না ? সব বুঝি।'

'না রে গ্রিগরি, ন্যাকামি করিচি না। সত্যি আমি খুব খুশি হয়েচি, এত খুশি হয়েচি যে তোকে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না।'

'ঠিক বলচিস ?'

'হ্যাঁ রে, আমরা দুজনে বেশ একসঙ্গে কাজ করতে পারবো !'

গ্রিগরি কটমট করে তাকালো। 'আমাকে তুই ভয় করিস না ?'

'না।'

এবার গ্রিগরি মেত্রোনাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো। 'না রে মেত্রোনা, আমাকে তুই ভয় করিস না...আমি তোকে সত্যিই ভালোবাসি !'

অরলভদের শিক্ষানবিসির প্রথম দিনেই হাসপাতালে একগাদা রোগীকে আনা হলো, ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে দুজনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম। এর চেয়ে নিঃশব্দে বসে বসে চামড়া কাটার কাজ আর মাঝে মাঝে ঝগড়া বরং ঢের ভালো। এখানকার কাজের ধারা ওরা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলো না, তবু নিজেদের ধৈর্য দেখে নিজেরাই অবাক হয়ে গেলো। আর পাঁচজনের মতো ওরাও সাধ্যমতো পরিশ্রম করলো, কিন্তু সবকিছু ঠিক যেন কায়দামাফিক হলো না। কয়েকবার তো প্রচণ্ড হতাশায় গ্রিগরির ইচ্ছে হলো হাত-পা ছুঁড়ে অসহ্য জোরে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু চিৎকার তো দূরের কথা, ওর ভুলত্রুটির জন্যে কাউকে একটা কথা পর্যন্তও বলতে না দেখে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

লম্বা-চওড়া দেখতে, টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, মোটা কালো গোঁফ, একজন ডাক্তার যখন কোনো রোগীকে দেখিয়ে গ্রিগরিকে বললেন ওকে স্নান করায় একটু সাহায্য করতে, গ্রিগরি তখন মহা-উৎসাহে তার হাতটা এমনভাবে চেপে ধরলো যে বেচারি যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে না না, রোগা মানুষ, ওভাবে ধরলে হাড়গোড় যে সব গুঁড়িয়ে যাবে।'

গ্রিগরি লজ্জা পেলো। অসুস্থ লোকটা ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'নতুন তো, পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

পরের দিন ওরা হাসপাতালে পৌঁছতে না পৌঁছতেই একজন বড় ডাক্তার, সুন্দর করে ছাঁটা সাদা দাড়ি, বড় বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ, তিনি ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন—কেমন করে রুগীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়, বিভিন্ন অবস্থায় কি রকম ভাবে তাদের পরিচর্যা করতে হয়। বুঝিয়ে দেওয়ার পরেই উনি গ্রিগরি আর মেত্রোনকে জিগেস করলেন ওরা স্নান করে এসেছে কিনা। তারপরেই উনি ওদের ধবধবে সাদা সজ্জাবরণী পরতে দিলেন। বৃদ্ধ ডাক্তারের দরদ-ভরা মিষ্টি কণ্ঠস্বরে দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সাদা পোশাক-পরা কর্মীদের ব্যস্ত তৎপরতা, রুগীদের আর্তচিৎকার, বেয়ারাদের ছুটোছুটি, ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ আর নানান কাজের ঝামেলায় ওরা বৃদ্ধ ডাক্তারের উপদেশগুলো সম্পূর্ণ ভুলো গেলো, হাজার চেষ্টা করেও কুড়িয়ে মনের মধ্যে জড়ো করতে পারলো না।

প্রথমে গ্রিগরির মনে হলো এখানের সবকিছুই কেমন যেন বিশৃঙ্খল, এলোমেলো আর শ্বাসরুদ্ধকর। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ও এই কর্মব্যস্ততার একটা মানে খুঁজে পেলো, আর তখন সবকিছুকে ওর অর্থহীন মনে হলো না। বরং স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো সব ব্যাপারেই ও মনে মনে কেমন যেন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলো।

একজন ডাক্তার জিগেস করলেন, 'স্যালাইন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

ডাক্তারী-বিদ্যা শিখছে রোগা মতন একজন ছোকরা ডাক্তার বললো, 'ওখানে এক বালতি গরম জল দিয়ে এসো তো ভাই।'

'কি নাম বললে তোমার? অরলভ? বাঃ! এর পাটা একটু মালিশ করে দাও তো ভাই। না না, ওভাবে নয়। খুব আস্তে আস্তে···হ্যাঁ, এবার ঠিক হচ্ছে।'

আর একজন ছোকরা ডাক্তার ছুটতে ছুটতে এসে বললো, 'অরলভ, আমি একে দেখছি··· তুমি ট্রলিটা নিয়ে নিচে যাও, একজন নতুন রুগী এসেছে···শিগগির ছোটো!'

আর গ্রিগরি—সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে···ঝাপসা চোখ···এক এক সময় মনে হয় নিজের অস্তিত্বই ও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। চোখের সামনে তখন ভেসে ওঠে কেবল রুগীদের বিবর্ণ মুখ, গর্তের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ধূসর চোখ, হাত-পা শক্ত কাঠ। মৃত্যুর উলঙ্গ, বিভৎস এই ছবি দেখে মাঝে মাঝে গ্রিগরির সারাশরীর গুলিয়ে ওঠে, বমি পায়।

কখনও সখনও দিনে একবার কি দুবার মেত্রোনার সঙ্গে ওর দেখা হয় ঢাকা-বারান্দায়। এ কদিনে বেচারি অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে, মুখখানা থমথমে।

'কি রে মেত্রোনা, তোর কি খবর?'

'ভালো।' অস্পষ্ট একটু হেসেই মেত্রোনা দ্রুত সরে যায়।

এক এক সময় গ্রিগরি ভাবে ওকে এই অভিশপ্তপুরীতে এনে ভুল করেছি। বলা যায় না যদি অসুখ বিসুখ কিছু করে। তাই চোখাচোখি হলেই মাঝে মাঝে ওকে সাবধান করে দেয়, 'ওষুধ-জলে ভালো করে হাত ধুবি, আর সব সময় নিজের শরীরের ওপর যত্ন নিবি।'

মেত্রোনা খিলখিল করে হাসে। 'আর যদি না নিই ?'

গ্রিগরি চটে ওঠে। রঙ-তামাশা করার জায়গা পেলো না। কিন্তু মুখের মতো একটা জবাব খুঁজে পাবার আগেই দ্যাখে মেত্রেনা মেয়ে-মহলে কেটে পড়েছে।

কয়েক মিনিট পরে নিচে গাড়ি এসে থামলো, গ্রিগরি ছুটলো তাকে আনতে। বীটের পাহারাওয়ালা, কাঁচের মতো ঝকঝকে স্বচ্ছ চোখদুটো নীলিম আকাশের দিকে মেলা রয়েছে, নিস্পন্দ নিথর! অথচ কয়েকদিন আগেও মদ খেয়ে রাত্তিরে বাড়ি ফেরার সময় প্রায় প্রতিদিন তার সঙ্গে দেখা হতো আর মাতলামি করার জন্যে ওকে ধমকাতো। আর আজ তার সেই বিশাল দেহটা চুপসে বিকৃত হয়ে গেছে। গ্রিগরির মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। এইভাবে নিঃশব্দে মরার জন্যেই কি সে পৃথিবীতে জন্মে ছিলো ? খাটুলিতে করে বয়ে নিয়ে যাবার সময় অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে গ্রিগরির বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এলো করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস। আর ঠিক তখনই ওর মনে হলো পাহারাওয়ালার বাঁ হাতটা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে যাচ্ছে। বিকৃত ঠোঁটদুটো একবার একটু খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

'শোনো প্রোনিন! দাঁড়াও...' চকিতে থমকে দাঁড়িয়ে গ্রিগরি চিৎকার করে উঠলো। 'একে লাশঘরে নিয়ে যেও না, এখনও মরেনি!'

একটু থেমেই প্রোনিন পাগলের মতো হো হো করে হেসে উঠলো। 'ও কিছু নয়, চলো।'

বিস্ফারিত চোখে গ্রিগরি বললো, 'বিশ্বাস করো আমি নিজে চোখে দেখলুম...'

'তুমি নতুন, তাই জানো না। কলেরায় মরলে এ-রকম হয়... বাঁকা-চোরা হাত-পায়ের খিল খুলে যায়। তখন মনে হয় লোকটা বেঁচে আছে, তার হাত-পা নড়ছে। অনেকে সেই নিয়ে শহরময় গুজব ছড়িয়ে বেড়ায়, আমরা নাকি জ্যান্তো মানুষকে গোরে দিচ্ছি।'

প্রোনিনের শান্ত সহজ কণ্ঠস্বরে গ্রিগরি যেন দম ফেলে বাঁচে। প্রোনিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উৎসাহিত করার ভঙ্গিতে বললো, 'মরতে তো সবাইকে একদিন না একদিন হবেই, আগে থেকে জ্যান্তো মানুষটাকে গোরে দিয়ে আমাদের কি লাভ বলো ? তোমার যদি খুব খারাপ লাগে বরং এক পাত্তর গলায় ঢেলে এসো।'

'সত্যিই খুব খারাপ লাগছে, হলে কিন্তু মন্দ হতো না।'

'তাহলে সোজা আমার ঘরে চলে যাও। খাটিয়ার নিচে দেখবে...না, দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

দুজনে পাহারাওয়ালাকে লাশঘরে নামিয়ে রেখে চলে এলো প্রোনিনের ঘরে। খাটিয়ার নিচে থেকে একটা বোতল বার করে ছোট একটা গেলাসে খানিকটা ঢেলে তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা সুগন্ধি নির্যাস মিশিয়ে প্রোনিন গ্রিগরির হাতে দিলো। 'নাও, এটুকু খেয়ে ফ্যালো।'

'কিন্তু এর সঙ্গে গন্ধওয়ালা আবার কি মিশিয়ে দিলে ?'

'মেনথল। এতে মুখে ভদকার গন্ধ থাকে না। এখানে মদ খাওয়া খুব কড়াকড়ি।'

গেলাসে গুটিকয়েক ছোট ছোট চুমুক দিয়ে গ্রিগরি জিগেস করলো, 'তুমি এখানে অনেক দিন আছো ?'

'আমি ? হ্যাঁ, অনেক দিন। সেই হাসপাতালের প্রায় শুরু থেকে। কত লোককে যে মরতে বাঁচতে দেখলুম, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এখানে বিশ্রাম বড় একটা না মিললেও জায়গাটা মন্দ নয়। ঠিক যেন লড়ায়ের ময়দানের মতন, কে মরবে আর কে বাঁচবে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। তুমি কখনও যুদ্ধে গ্যাছো ? তুর্কি লড়ায়ের সময়ে আমি ফৌজে ছিলুম। আরদাগানে গেছি, কার্সে গেছি...কিন্তু এরা আমাদের মতো সেপাইদের চাইতে অনেক বেশি সাহসী। চারদিকে গোলাগুলি ছুটছে, তার মধ্যেই ডাক্তার-নার্সরা সব ছোটাছুটি করছেন, যেন বাগানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। আমরা বা তুর্কি সেপাই, এঁদের কাছে কোনো ভেদাভেদ নেই, এর ভাঙা হাত-পা জুড়ছেন, ওর পাঁজরার মধ্যে থেকে গুলি বার করছেন, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কখনও কখনও ওঁরাও মারা যান...একটা বোমা পড়লো, ব্যাস্, সব্বাই সাবাড়।'

ভদকা আর প্রোনিনের হালকা কথায় গ্রিগরির মনের জমাট মেঘগুলো সরে গেলো। ও কাজে ফিরে এলো। ভেতরে প্রবেশ করতে না করতেই শুনলো যন্ত্রণায় কে যেন কাতরাচ্ছে, 'উঃ মা গো। একটু জল।'

ডাক্তার ভাসচেঙ্কো বললেন, 'ওকে একটু ব্রাণ্ডি দাও, অরলভ !'

প্রথম দিনের মতো এখন আর এখানের সবকিছুকে ওর ধাঁধার মতো মনে হয় না, বরং মনে হয় অনেক বেশি সুসৃঙ্খল আর অর্থবহ। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই জানলা দিয়ে ওর চোখ গিয়ে পড়ে লাশঘরে, সারা শরীর শিরশির করে ওঠে, মনে হয় এখুনি বুঝি পাহারাওয়ালাটা লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলবে—এ্যাই, কিধার যাতা হ্যায় ! মনে পড়লো কে যেন বলছিলো—কলেরায় মরা গেলে অনেক মড়া নাকি শবধারের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপিও শুরু করে দেয়।

ভাবনার ভুতগুলোকে মন থেকে তাড়াবার জন্যে ও অন্যকিছু ভাবে। আর তখনই ওর মেত্রোনার কথা মনে পড়ে যায়, ইচ্ছে করে হাতের কাজ ফেলে রেখে তাকে একবার দেখে আসে। কিন্তু পারে না, কেমন যেন লজ্জা করে। সত্যি, বিয়ের পর থেকে বেচারি জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। কখনও ভাবে মেত্রোনাকে এখানে আনাটা আদৌ ঠিক হয়নি। ওখানে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আর পাঁচটা পুরুষের মুখ দেখতে পেতো না, এখানে কার সঙ্গে যে কি করছে তা ও-ই জানে। অথচ এটাও সত্যি, জীবনে এত লোককে মিলেমিশে কাজ করতে ও আর কোথাও কখনও দেখেনি। ডাক্তার, ছাত্র, নার্স, কুলি-বেয়ারা—কাজের জন্যে সবাই মাইনে পায়, কিন্তু রুগ্ন দুস্থ মানুষের জন্যে এই যে নিঃস্বার্থ সেবা, এই যে উৎসাহ, তাকে কি কখনও পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব !

কাজের শেষে ক্লান্ত-অবসাদে গ্রিগরির সর্বাঙ্গ যেন ভেঙে এলো। টলতে টলতে বাইরের প্রাঙ্গণে এসে দাওয়াইখানার জানলার নিচে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ফেটে পড়ছে, হাত পা বিবশ, যেন ও আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না। বেলাশেষের আলোয়-রাঙা আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো ভেসে চলেছে। সেদিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্রিগরি একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও স্বপ্ন দেখলো ফুল দিয়ে সুন্দর সাজানো একটা ঘরে কোনো ডাক্তারকে বিদায় অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। সারিসারি চেয়ারে হাসপাতালের সব রুগী আর নার্সরা

বসে রয়েছে। মেগ্রোনা আর সেই বিদায়ী-ডাক্তার ঘরের মাঝখানে নাচছে. গ্রিগরি ওদের সেই নাচের তালে তালে অ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছে। গ্রিগরি যত গম্ভীর হবার ভান করছে, সারসের মতো লম্বা ঠ্যাং ফেলে ডাক্তারকে মেগ্রোনার চারপাশে অদ্ভুতভাবে ঘুরতে দেখে ও ততই হো হো করে হেসে উঠছে। রুগীরাও হাসছে।

হঠাৎ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালাটাকে চিৎকার করে উঠতে দেখে গ্রিগরির পিলে চমকে গেলো। 'লাশঘরে আমাকে ফেলে রেখে তুই এখানে বাজনা বাড়িয়ে ফূর্তি করছিস। দাঁড়া, আমি তোর মজা দেখাচ্ছি!'

হাতটা চেপে ধরতেই গ্রিগরি ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে! ঘুম ভেঙে জেগে উঠতেই দেখলো ডাক্তার ভাসচেঙ্কো ওর হাত ধরে টানছেন।

'আরে, ওঠো ওঠো! এখানে এভাবে শুয়ে কেউ ঘুমোয়? ভেতরে তোমাদের নিজেদের শোবার জায়গা রয়েছে, সেখানে গিয়ে ঘুমোও। কি ব্যাপার, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ঘামছো? না- একটা অসুখ-বিসুখ না বাঁধিয়ে ছাড়বে না দেখছি!'

'ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।' গ্রিগরি বিব্রত বোধ করলো।

'সেটা তো আরও খারাপ। তোমাদের মতো শক্ত-সামর্থ জোয়ানদের এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হলে চলে? তোমাদের এখন কত কাজ! চলো চলো, আমি তোমাকে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি!'

ডাক্তারের সঙ্গে ঢাকা-বারান্দাটা পেরিয়ে গ্রিগরি নিঃশব্দে দাওয়াইখানায় প্রবেশ করলো চোখ-কান বুজিয়ে ডাক্তারের দেওয়া ওষুধটা গিলে ফেললো।

'নাও, এবার তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

ক্লান্ত পায়ে ডাক্তারকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে গ্রিগরি দৌড়ে গিয়ে ওঁর পথ আগলে দাঁড়ালো। 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তারবাবু।'

'কেন, কিসের জন্যে?'

'না, মানে…আপনি নিজে আমার জন্যে এতটা পথ কষ্ট করে…'

'নাঃ, তুমি দেখছি ঠিক আর পাঁচজনের মতো নও।' ডাক্তার ভাসচেঙ্কো অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন, পরক্ষণেই স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওঁর সারা মুখ। 'ঠিক আছে, তোমার যখন যা মনে হবে আমাকে বলবে। কিন্তু তুমি তো নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছ…এখানে কত রুগী, আমাদের সবাইকে একসঙ্গে সমানভাবে পরিশ্রম করে লড়াই করে যমের মুখ থেকে ওদের ছিনিয়ে আনতে হয়। তার জন্যে তোমাদের মতো লোকেদেরও দায়িত্ব আমাদের চাইতে কোনো অংশ কম নয়। কিন্তু নিজের শরীরের যত্ন নিতে হবে সবার আগে, তবেই না তুমি অন্যের সেবা-যত্ন করতে পারবে। না, এখন আর কোনো কথা নয়, সোজা গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

গ্রিগরি নিজের ঘরে ফিরে এলো, ডাক্তারের সামান্য এই কটি কথায়, বিশেষ করে এই লড়ায়ে তারও যে একটা ভূমিকা আছে, সে-কথা ভাবতেই গ্রিগরির বুক গর্বে ভরে উঠলো। অথচ ঘুমিয়ে পড়ার আগেরমুহূর্তে যখন ভাবলো মেগ্রোনা নিজে কানে শুনলো না, তখন ওর মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেলো! কেননা কাল সকালে মেগ্রোনাকে যখন এ সম্পর্কে কিছু বলবে, তখন ও কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো!

পরের দিন ভোরে নিজের ঘরে শুয়ে গ্রিগরি তখনও ঘুমচ্ছে, ঘুম ভাঙালো মেত্রোনার ডাকে। 'ওঠ্ ওঠ্, সকাল হয়ে গ্যাচে। চা খেতে যাবি না ?'

চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো মেত্রোনা ওর বিছনার সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছে। সাত-সকালেই স্নান-টান সেরে চুল আঁচড়ে পরিষ্কার হয়ে নিয়েছে। ধবধবে সাদা পোশাকে ওকে ভারি স্নিগ্ধ আর রূপসী দেখাচ্ছে। গ্রিগরি অবাক হয়ে ভাবলো—ওর যেমন ভালো লাগছে, হাসপাতালের আর সবাই নিশ্চয় ওর দিকে ঠিক এমনিভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে !

গ্রিগরি গোমড়া মুখে বললো, 'তোর চা খেতে যাবো কেন ? আমার নিজের চা নেই বুঝি ?'

ওর রাগ দেখে মেত্রোনা হেসে ফেললো। 'বেশ, চল্…তোর সঙ্গেই চা খাবো।'

গ্রিগরি উঠে পড়লো। 'তুই যা, আমি একখুনি যাচ্ছি।'

মেত্রোনা বেরিয়ে যেতেই গ্রিগরি আবার বিছনায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। মনে মনে ভাবলো মেত্রোনা কেন আমার দিকে তাকিয়ে অমন মুচকি মুচকি হাসলো ? কেন আমার সঙ্গে চা খাবার কথা বললো ? নিশ্চয়ই ওর কোনো মতলব আছে ! গ্রিগরি বিছনা ছেড়ে উঠে পড়লো। প্রথমে ভেবেছিলো মেত্রোনার এই চায়ের নিমন্ত্রণে কিছু কেক নিয়ে যাবে, কিন্তু হাত-মুখ ধুতে ধুতে ভাবলো—না, মেয়ে মনুেষকে অত নাই দিতে নেই।

মেত্রোনার ঘরখানা ছোট। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের দিকে খোলা বড় বড় দুটো জানলা দিয়ে ভোরের কাঁচা-রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। ঘাসের আগায় আগায় চুনিপান্নার মতো ঝিকমিক করছে শিশিরবিন্দু, দূরে ফিকে গোলাপী কুয়াশায় ঢাকা দিগন্তরেখা। আকাশে ভেসে চলেছে স্বচ্ছ মেঘমালা, বাতাসে ভেসে আসছে ভিজে মাটির মিষ্টি একটা সোঁদা গন্ধ।

দুটো জানলার মাঝখানে ছোট একটা টেবিল ঘিরে তিনজনে মিলে চা খাচ্ছে—গ্রিগরি, মেত্রোনা আর মেত্রোনার বান্ধবী ফিলিজাতা ইয়েগরোভনা। মাঝামাঝি বয়েস, লম্বা, একহারা চেহারা। এখনও বিয়ে করেনি। কোনো কলেজ-পরিসংখ্যানবীদের মেয়ে। ও আর মেত্রোনা দুজনে এই ঘরে থাকে। ফিলিজাতা হাসপাতালের চা খেতে পারে না। তাই নিজে হাতে চা বানায়, মেত্রোনাকেও দেয়। মাঝে মাঝে চায়ের আসরে গ্রিগরিকে আমন্ত্রণ জানায়। ফিলিজাতা একাই একশো, সারাক্ষণ অনর্গল কবকব করে, হাসে। চায়ের পেয়ালটা নামিয়ে রেখে ও উঠে পড়লো, তারপর গ্রিগরিকে বললো, 'এই যে মশাই, আমার সময় হয়ে গ্যাছে, আমি চললুম। আপনি বরং জানলার ধারের ওই চেয়ারটায় বসে বসে প্রকৃতির মিষ্টি হাওয়া খান আর বউয়ের সঙ্গে গল্প করুন।'

ফিলিজাতা চলে যাবার পর গ্রিগরি মেত্রোনাকে জিগেস করলো, 'কিরে, কাল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলিস ?'

'খুব। এমন মাথার যন্তন্না হচ্ছিলো যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলুম না।'

'হ্যাঁ রে, এখানে তোর কাজ করতে ভয় করে না তো ?

'না, কাজ করতে ভয় করে না। তবে মড়া দেখলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। জানিস, সত্যি বলচি, তুই বিশ্বাস কর, মরে যাবার পরেও ওরা নড় চড়া করে।'

গ্রিগরি হেসে উঠলো। 'জানি, আমিও নিজে চোখে দেখেচি। কাল আমাদের সেই বীটের পাহারাওয়ালা, নাজারভকে নিয়ে যাবার সময় দেখলুম হঠাৎ ওর একখানা হাত সোজা আকাশের দিকে উঠেই আবার ধপ করে পড়ে গেলো। আমার তো তখন ভয়ে ভিরমি লাগার জোগাড়!'

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই খোলামেলা ঘরের আলো-বাতাস, প্রভাতী চায়ের আসর, কয়েক দিন পরে মেত্রোনাকে একান্ত করে পাওয়ার সুযোগ—সব মিলিয়ে গ্রিগরির নিজেকে কেমন যেন নায়ক-নায়ক মনে হলো। হাসতে হাসতে ও বললো, 'তবু আমি কি ভেবেচি জানিস? যতদিন বাঁচবো, এই কাজ নিয়েই থাকবো। এ কাজে আমি যেন নিজের একটা মূল্য খুঁজে পাই। তাছাড়া এখানের সবাই খুব ভালো, যেন অন্য একটা জগত! ডাক্তার ভাসচেঙ্কোর কাছে শোনা কথাগুলোর ওপরেই খানিকটা রঙ চড়িয়ে ও গড় গড় করে বলে চললো। 'এ যেন ঠিক যমে মানুষে লড়াই করা—একদিকে কলেরা, অন্য দিকে আমরা। দুপক্ষের লড়াই চলছে, কে জিতবে এখনও তার কোনো ঠিক নেই। ডাক্তার ভাসচেঙ্কো কি বলেন জানিস? বলেন, এতে এত ঘাবড়াবার কি আছে, অরলভ? মানুষ চেষ্টা, করলে সব করতে পারে। আসলে কলেরা রোগটা কি, কেন হয়, এ-সব জানতে হবে, তারপর তাকে কাবু করার জন্যে ওষুধ দিতে হবে। সবাই মিলে লড়াই করে রোগকে মেরে রুগীকে বাঁচাতে হবে। আর এ লড়ায়ে তোমার দায়িত্বও কম নয়। উনি আমাকে নিজে মুখে এই সব কথা বলেছেন, বুঝলি?'

কথাটা বলে বুক ফুলিয়ে উজ্জ্বল গর্বিত চোখে গ্রিগরি মেত্রোনার মুখের দিকে তাকালো; মেত্রোনাও এতক্ষণ হাসি হাসি মুখে ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলো, এখন তার মনে হলো বিয়ের পর থেকে গ্রিগরিকে এত সুন্দর বুঝি আর কখনও দেখায়নি।

'আমাদের ওয়ার্ডের মেয়েরাও খুব ভালো—যেমন মিশুকে, তেমনি কাজের। আমাদের একজন বড় মেয়ে-ডাক্তার, আমরা বড় দিদিমণি বলি··· চোখে চশমা, উনি সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেন, কোনো দেমাক নেই। আর উনি সবসময় সবকিছু এমন সহজভাবে বলেন, কারুর বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।'

গ্রিগরি কেমন যেন দমে গেলো। 'তার মানে বলতে চাস, তুই ভালোই আছিস?'

'বাঃ, সে-কথা তোকে আবার বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি! তুই নিজেই হিসেব করে না—আমি পাই বারো রুবল, তুই পাশ বিশ রুবল। দুজনের মিলিয়ে ফি মাসে হলো বত্রিশ রুবল। তার ওপর থাকা-খাওয়ার যখন কোনো খরচা নেই, সবটাই তো আমাদের জমবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা কি জানিস, আমাদের আর কোনোদিন সেই ইঁদুরের গর্তে ফিরে যেতে হবে না!

'হুঁ, তা বটে!' খানিকক্ষণ গুম হয়ে গ্রিগরি কি যেন ভাবলো। তারপর গভীর একটা ফেললো। 'আর কিছু না হোক, আমাদের আর চামড়ায় ছুঁচ ফুঁড়তে হবে না!'

মেত্রোনা ক্ষীণ একটা আশায় যেন চমকে উঠলো। 'তুই শুধু মদ খাওয়াটা ছেড়ে দে, গ্রিগরি।'

'হবে হবে, একটু একটু করে সব হবে। মানুষের মতো বাঁচতে পেলে অভ্যেস বদলাতে আর কতক্ষণ।'

'আঃ, গ্রিগরি। সোনা, আমার রাজা!' মেত্রোনা দুহাতে ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো।

ছাড়াছাড়ি হবার পরেও প্রচ্ছন্ন একটা আশা-আনন্দে দুজনের মন উল্লসিত হয়ে ওঠে, দুজনেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ করে।

তিন চার দিন গ্রিগরি এমন অমিত উৎসাহে কাজ করলো যে ডাক্তার-নার্স সবাই ওর প্রশংসা করলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও আবিষ্কার করলো প্রোনিন আর কয়েকজন শুধু হিংসেই নয়, ওর ওপর কেমন যেন একটা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে। এতে ও খুব দমে গেলো। অথচ ও নিজে থেকেই ভেবেছিলো প্রোনিনের সঙ্গে গলায়-গলায় দোস্তি করবে, তার সঙ্গে প্রাণখুলে আলাপ-আলোচনা করবে, তার কাছে থেকে অনেক কিছু শিখবে। কিন্তু সেদিন ইচ্ছে করে কার্বলিক অ্যাসিডে ওর বুটটা পুড়িয়ে দেওয়ায় গ্রিগরি সত্যিই মর্মাহত হলো। মনে মনে ভাবলো ঠিক আছে, একদিন চোয়ালে কষে এইস্যান এক থাপ্পড় কষাবো, সেদিন ব্যাটাকে আর ট্যা-ফোঁ করতে হবে না!

কিন্তু কাজের নানান উত্তেজনা আর ব্যস্ততায় প্রোনিনের কথা ও প্রায় ভুলেই গেলো। যত দিন যায় গ্রিগরি তত মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করে। এখন শুধু গন্ধ শুঁকেই প্রতিটা ওষুধ ও আলাদা আলাদা করে চিনতে পারে। এই আবিষ্কারের নেশা ওর কাছে মদের নেশার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। ওর এই অনুসন্ধিৎসা, নিপুণ দক্ষতা আর রুগীদের প্রতি অসীম সেবাযত্নের মনোভাবের জন্যে ডাক্তার ছাত্ররা সবাই ওকে দারুণ ভালোবাসে, ওর কাজের রীতিমতো তারিফ করে। আর এই সবকিছুই ওর নতুন জীবনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। ভবিষ্যতে এমন অদ্ভুত একটা কিছু করবে, যা সবাই শুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখবে, সে-আশায় গ্রিগরি মনে মনে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে-কাজ পাঁচজনে পারে না, সেই কাজ করতে ও ছোটে সবার আগে। রীতিমতো দায়িত্বের ঝুঁকি নিয়ে তিন চারজনের কাজ ও একাই করে। তবু মনে স্বস্তি নেই, ও চায় আরও বড় কিছু করতে। ও যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা একটা বিরাট দৈত্য, যে আজ নিজেকে মানুষ বলে চিনতে পেরেছে, অজস্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও যে আজ বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে! এমনিভাবে ব্যাকুল আগ্রহে আত্ম-চেতনা একটু একটু করে একটা মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় রূপ নেয় নবোন্মিষিত আত্মোৎসর্গে।

একদিন বিকেলবেলায় কাজ থেকে ফিরে চা-টা খেয়ে দুজনে বেড়াতে বেরুলো মাঠের দিকে। হাসপাতালটা শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে সবুজ বনানী ঘেরা বিরাট একটা উপত্যকার ওপর। উত্তরে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, সোজা গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তের গায়ে। দক্ষিণে একেবেঁকে বহে যাচ্ছে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী! উপত্যকার বুক চিরে চওড়া একটা পথ চলে গেছে শহরের দিকে। পথের দুধারে মাঝে মাঝে প্রাচীর ঝাঁকড়া গাছ। পশ্চিমে সবুজ নিকুঞ্জের ওপারে গির্জার উঁচু চূড়ার আড়ালে বেলাশেষের সূর্য বিদায় নিচ্ছে। তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রাঙা হয়ে রয়েছে সারা আকাশ, জানলার কাঁচে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে গনগনে অগ্নি-শিখার মতো। সুগন্ধি পর্ণসীর ঝোপের ওপার থেকে বাতাসে ভেসে আসছে

মিষ্টি একটা গন্ধ।

নির্জন ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দুজনে পায়ে পায়ে নদীর দিকে এগিয়ে চললো। খোলা হাওয়ায় ওষুধের বদলে নাম না জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধে ওরা দুজনেই তখন যেন মাতাল।

হঠাৎ একসময়ে মেত্রোনা জিগেস করলো. 'বাজনাটা কোত্থেকে আসছে বলতো ? শহরে না সেপাই-ছাউনি থেকে ?'

'বাজনা !' গ্রিগরি যেন গভীর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো। 'নিকুচি করচে তোর বাজনা। আমার বুকের মধ্যে এখন কি বাজনা বাজচে সেইটে শোন দিকিনি আগে।'

'বুকের মধ্যে বাজনা ! সে আবার কি জিনিস রে ?' মেত্রোনা উদ্বিগ্ন হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। গ্রিগরির আচ্ছন্ন এই তন্ময়তাকে সে মনে মনে ভয় পায়। ও যখন ভাবনার গভীরে তলিয়ে যায় তখন ওকে কেমন যেন দূরের মানুষ আর অজানা রহস্যময় মনে হয়।

'কি জিনিস তা আমি তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি—আমার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে একটা আগুন জ্বলছে, আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ভেতরের যাকিছু অন্ধকার। আমার সবসময় কি মনে হয় জানিস, মনে হয় এমন একটা কিছু করি···বিরাট একটা কিছু, যেমন ধর কলেরার মতো ওই বিশাল দৈত্যটাকে যদি কোনোদিন মেরে তাড়াতে পারি···তাতে যদি মরতে হয়, তবু আমি রাজি ! সবাই তখন আমাকে ওই সবুজ মাঠের ধারে কবর দেবে, পাথরের গায়ে লেখা থাকবে ঃ 'রাশিয়া থেকে কলেরার দৈত্যটাকে যে মেরে হটিয়েচে সেই নির্ভীক বীর গ্রিগরি আঁন্দ্রেয়েভিচ অরলভের স্মরণে।'' ব্যাস, তার বেশি কিছু আমি আর চাইনা।'

মেত্রোনা দুহাতে ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো। 'গ্রিগরি, গ্রিগরি আমার রাজা···'

সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় ওর মুখটা তখন ঝলমল করছে, তিরতির করে কাঁপছে স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো। ···'সহজ সুন্দর জীবনের জন্যে, তাতে যদি মানুষের সত্যিকারের কোনো উপকার হয়—আজ আমি একশোটা ধারালো ছুরি-হাতে দুশমনের বিরুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। কেননা এ কদিনে মানুষ কি জিনিস—সে আমি ওই ডাক্তার ভাসচেঙ্কো আর ডাক্তারি-পড়া ছোকরা কোখরিয়াকভের কাছ থেকে শিখেচি। তুই কি ভাবিস ওঁরা মাইনে পান বলেই কাজ করেন, নারে না, শুধু টাকার জন্যে কেউ ওভাবে কাজ করতে পারে না। ওঁরা সব আশ্চর্য মানুষ ! একবার বড় ডাক্তার যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন. ডাক্তার ভাসচেঙ্কো চার দিন চার রাত ঠায় ওঁর পাশে ছিলেন। বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, এক মিনিটের জন্যে কাছ-ছাড়া পর্যন্ত হননি। তুইই বল, এসব কি কেউ টাকা পয়সার জন্যে করে ? এ'রা করেন শুধু মানুষকে ভালোবাসেন বলে, নিজেদের সুখ-সুবিধের দিকে এ'রা একবার ফিরেও তাকান না। ওই মিশকা, মিশকা উসভ, ব্যাটা পাকা-চোর, বাস্তুঘুঘু একটা ···সবাই জানে ওর জেল হওয়া উচিত। তবু ওর জন্যে ওঁরা সেদিন কি কাণ্ডটাই না করলেন ! কেন ? না, ও ভালো হয়ে উঠবে। যেদিন ও সত্যিই সেরে উঠলো, সেদিন ওঁরা যেন হাতে সগগো পেলেন···সবাই সুখী। সত্যিরে মেত্রোনা, ওঁদের সে-সুখ দেখে মাঝে মাঝে আমার হিংসে হয়, ওঁদের সে প্রাণখোলা হাসির শব্দে আমার মাথার মধ্যে দাউ দাউ

করে আগুন জ্বলে।'

গ্রিগরি আবার তার ভাবনার গহনে ডুবে গেলো। মেব্রোনা কোনো কথা বললো না, কেবল নিঃশব্দ একটা যন্ত্রণায় দ্রুত হয়ে উঠলো তার বুকের স্পন্দন। স্বামীর এই প্রবল উত্তেজনায় সে শঙ্কিত। কেননা ওর বুকের মধ্যে জ্বলন্ত শিখার উত্তাপটুকু স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেও, ওর ব্যাকুল কামনার ধাবন্ত প্রবাহটাকে সে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারলো না। হয়তো সে স্পর্শ করতে চায়ও না। গ্রিগরি তার, তার কাছে একান্ত আপনারই হয়ে থাক, ও কোনো দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠুক তা সে চায় না।

বেড়াতে বেড়াতে দুজনে নদীর ধার পর্যন্ত এলো, এসে সবুজ ঘাসের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসলো। বার্চের কচি পাতাগুলো মৃদুল হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে দুলে উঠছে শাখাগুলো। মৃদু কল্লোলিত স্রোতে ভেসে চলেছে ঝরা পাতা। দুজনে অনেকক্ষণ সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

হঠাৎ একসময়ে মেব্রোনা দুহাতে গ্রিগরির গলাটা জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রাখলো। 'গ্রিগরি···গ্রিগরি সোনা আমার! তুই এখন কত ভালো হয়ে গেচিস, ঠিক আমাদের বিয়ের সেই দিনগুলোর মতন! আজকাল তুই আমাকে আর কষ্ট দিস না, তোর মনে যখন যে-কথা জাগে আমাকে সব বলিস, আমাকে আর মারিস না···'

'কেন, তোর মনে আবার মার খাবার সাধ জাগচে নাকি? আয়, তবে ঘুচিয়ে দিই।'

সকৌতুকে গ্রিগরি মেব্রোনার মাথাটা বুকের মধ্যে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে, কোমল স্নেহে ধীরে ধীরে তার চুলে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে। আর মেব্রোনা ছোট্ট একটা পুষির মতো গুটিসুটি হয়ে আরও ঘেঁসে আসে ওর কোলের কাছে। 'আঃ গ্রিগরি আমার রাজা!

'একটা কথা তুই জেনে রাখিস মেব্রোনা, আমি তোকে সত্যিই ভালোবাসি। আগেও বাসতুম। তখন তোকে বড্ড পীড়ন করেচি, মেরেচি···কিন্তু তখন আমি ছিলুম একটা পশু, অন্ধগুহার মধ্যে বদ্ধ একটা পশু। কোনোদিন আলো দেখেনি, মানুষ কি জিনিস কখনও জানতুম না। কিন্তু অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই আমার চোখ খুলে গেলো আমি জানতে পারলুম তুই-ই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমার সত্যিকারের একজন সাথী। সত্যি বলতে কি জানিস, বেশির ভাগ মানুষই বড্ড নিষ্ঠুর, একজন আর একজনের ওপর অত্যাচার করতে পারলে আর কিছু চায় না। এই প্রোনিন আর ভাসিউকভ জানোয়ার দুটোর কথাই ধর না কেন···নাঃ, ওদের কথা এখন থাক···আমরা এখন মানুষ হয়ে গেচি, মেব্রোনা। এবার থেকে আমরা আরও ভালো ভাবে বাঁচার চেষ্টা করবো। কিরে, কথা বলচিস্ না যে?'

সোহাগে আদরে মেব্রোনার দু চোখ তখন জলে ভরে গেছে, স্পন্দিত আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে তার কণ্ঠস্বর। গ্রিগরি চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো তার সারা মুখ।

'মেব্রোনা, মেব্রা···সোনামণি আমার···'

দুজনে পরস্পরকে চুম্বন করলো, দুজনেরই চোখ বেয়ে নীরবে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা। মিষ্টি একটা আমেজে মুদে এলো মেব্রোনার দুচোখের পাতা, গ্রিগরি অস্ফুট স্বরে অনর্গল বলে চললো নতুন করে পেয়ে-বসা তার স্বপ্নিল ভাবনাগুলোর কথা।

এদিকে অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেছে। আকাশে ফুটে উঠেছে দু একটা টিপটিপ তারা। আর পেছনের মাঠটা নিস্তব্ধ নিঝুম।

*　　　　*　　　　*

পরের দিন সকালে গ্রিগরি নিজেই মেত্রোনাদের চায়ের আসরে এসে হাজির হলো, জানলার ধারের চেয়ারটা টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। ফিলিজাতার অসুস্থতার জন্যে মেত্রোনা একাই ঘরে ছিলো। খুশিতে চলকে উঠে গ্রিগরির মুখের দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠলো। 'কিরে, কি ব্যাপার? অসুখ-বিসুখ করেচে নাকি?'

'না না, আমি বেশ ভালোই আছি।' থমথমে গম্ভীর মুখে গ্রিগরি জবাব দিলো।

'তাহলে তোকে এমন শুকনো দেখাচ্চে কেন?'

'কাল মোটে ঘুমতে পারিনি, সারারাত বিছনায় শুয়ে ছটফট করেচি। কাল তোতে আমাতে দুজনে ছেলেমানুষের মতো যেভাবে চটকা-চটকি করেচি, অতটা ঠিক হয়নি। আজ আমার ভাবতেই লজ্জা করচে। তোদের মতো মেয়েমানুষদের একটুখানি নাই দিলে, অমনি তোরা মাথায় চড়ে বসিস। ভাবিস ও বুঝি তোর কেনা-গোলাম হয়ে গেলো। না, আমি তা হতে দোবো না। একটুখানি আদিখ্যেতা দেখিয়ে আমাকে বশ মানানো অত সস্তা নয়, বুঝলি?'

বাইরের দিকে তাকিয়ে ও কথাগুলো বললেও, মেত্রোনা কিন্তু সারাক্ষণ গ্রিগরির মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিলো, নিঃশব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো তার পাতলা ঠোঁটদুটো। এবার অস্ফুট স্বরে সে বললো, 'তার মানে কাল তুই আমাকে আদর করেছিলিস, চুমু খেয়েছিলিস, সোহাগ করেছিলিস বলে আজ তোর দুখ্যে বুক ভেঙে যাচ্চে? তুই জানিস না গ্রিগরি, তোর এই কথায় আমার বুকের মধ্যে কি কষ্ট হচ্চে। তুই যদি আমাকে ধরে দুঘা পেটাতিস, তাহলেও বুঝি এত কষ্ট হোতো না।' মেত্রোনার বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এলো কাঁপা-কাঁপা বেদনার্ত করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস। 'বেশ, এখন তুই কি চাস? আমাকে ভালোবাসতে চাস না, এই তো?'

'ওরে, না না, তা নয়!' বিশ্রী একটা অস্বস্তিতে গ্রিগরি সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে ফেললো। বিব্রত, বিহ্বল চোখো ও মেত্রোনার দিকে তাকালো। 'কিন্তু তুই তো জানিস, গর্তের মধ্যে কি দুঃসহ জীবন আমরা যাপন করেচি…একটুও আলো নেই, বাতাস নেই। সেখান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গ্যাচে। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি আর এমন হঠাৎ বদলে গ্যালো…তুই, আমি, আমরা দুজনেই! মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ভয় করে…এর পরে কি হবে…'

'তুই এত ভাবচিস কেন, গ্রিগরি? মাথার ওপরে ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন।' চোখের কোণে টলটল করছে দুফোঁটা অশ্রু, তবু মেত্রোনা গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। 'তোর কাছে ছোট্ট একটা মিনতি করচি, কালকের অমন সুন্দর রাতটার জন্যে দুখ্যু করিসনে রে গ্রিগরি।'

'ঠিক আছে, ছেড়ে দে ওসব কথা!' চেয়ারে আয়েশ করে পা এগিয়ে দিয়ে গ্রিগরি বাইরের দিকে তাকালো। 'আসলে কি জানিস, আগের জীবন যেমন ফুলের মতো সুন্দর ছিলো না, এই নতুন জীবনও আমার ঠিক সহ্য হচ্চে না। অথচ দ্যাখ, আজকাল মদ

খাই না, তোকে মার-ধোর করি না, গালাগালিও দিই না…'

'এসব করার তোর ফুরসুৎ কোথায় ?'

'ইচ্ছে থাকলে সময়ের অভাব হয় না, বুঝলি ?' গ্রিগরি হাসতে হাসতে বললো।' কিন্তু আমি তা চাই না, আসলে ওসবে আমার আর রুচি নেই। ভয় না লজ্জা আমি ঠিক বুঝতে পারি না, আমার খালি মনে হয় ·'

'তোর যে কি হয়েছে গ্রিগরি, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না ! হয়তো একটু বেশি খাটতে হয়, তবু এখানে আমরা কত সুন্দর রয়েচি ! ডাক্তারা সব্বাই তোকে কতো ভালোবাসে. তুইও সবার সঙ্গে কতো ভালো ব্যবহার করিস, তবু তোর যে কেন এত অসোয়াস্তি ! এর বেশি তুই আর কি চাস ? আসলে তুই বড্ড চঞ্চল !'

'তুই ঠিকই বলচিস, আমি বড্ড অস্থির রে ! রোজ রাত্তিরে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আমি সারাক্ষণ কেবল ভাবি। পিওত্তর ইভানোভিচ কি বলে জানিস ? বলে সব মানুষ নাকি সোমান ! তার মানে ওতে আমাতে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি—ডাক্তার ভাসচেঙ্কো তো দূরের. আমি কোনোদিন পিওত্তর ইভানোভিচের নখের যুগ্যিও হতে পারবো না। পাঁজির-পাঝাড়া ওই চোর বদমাস মিশকাটাকে সারিয়ে তুলে ওঁরা যখন আনন্দে হাসেন, আমি তখন এর কোনো অর্থই খুঁজে পাই না। কেননা ওর যা জীবন, সত্যি বলতে কি, কলেরার চাইতেও জঘন্য। ওঁরাও তা জানেন, তবু খুশি হন। কিন্তু আমি পারি না, আসলে আমার মন ছোটো।'

'আমাদের ওয়ার্ডেও ঠিক তাই। যখন কোনো গরিব-দুঃখী মেয়ে সেরে উঠে বাড়ি যায়, তখন ওর হাতে টাকা দেয়, ওষুধ দেয়, কত ভালো ভালো উপদেশ দেয়। ওঁরা এত ভালো, আমার দুচোখ ফেটে জল আসে।'

'তোর জল আসে, আর আমার অবাক লাগে · মনে হয় যেন স্বপ্ন !'

'নারে না, স্বপ্ন নয় !' স্বামীর আরও কাছে সরে এসে মেত্রোনা হাসি-হাসি কোমল চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়। 'একটু আগে তুই বলছিলিস না—তোর মন ছোটো, কথাটা সত্যি নয়। তোর মন যদি ছোটো হোতো. তোর মনেও যদি ওঁদের মোতো দরদ না থাকতো, তাহলে তুই বলতে পারতিস না—কলেরার দৈত্যটা আমি মেরে তাড়াতে চাই। এতে তোর নিজের স্বার্থ কোথায় বল্ ? আসলে কলেরার-মড়ক এসেই তোর জীবনটাকে সুন্দর করে দিয়েচে।'

গ্রিগরি হো হো করে হেসে উঠলো। 'বাঃ, বেড়ে বলেচিস ! কলেরার-মড়ক এসেই আমার জীবনটাকে সুন্দর করে দিয়েচে !' হাসতে হাসতেই গ্রিগরি উঠে পড়লো। 'ওদিকে বলে কলেরায় গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্চে, আর আমি এখানে বসে বসে গপ্প করচি, নাঃ আজ চলি।'

হাসপাতালের কাজে ফিরে আসতে আসতে গ্রিগরি সারাটা পথ কেবল মেত্রোনার কথাই ভাবলো। চিরদিন যাকে তুচ্ছ-জ্ঞান করেছে, সেই মেত্রোনাই আজকাল কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে ! আচ্ছা, কোথা থেকে ও এমন সুন্দর কথা বলতে শিখলো ? হঠাৎ রুগীদের আর্ত স্বরে গ্রিগরির চমক ভাঙলো। পোশাক-পালটাবার জন্যে ও দ্রুত পায়ে ঘরে চলে গেলো।

মেত্রোনাও তার নানান কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারবার অনুভব করতে লাগলো দিন দিন স্বামীর কাছে সে যেন কেমন অপরিহার্য হয়ে উঠছে, আর সেই সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার জন্যে তারও চেষ্টার অন্ত নেই। পারতপক্ষে অতীতের কথা সে ভুলেও চিন্তা করে না। স্বামীর অনাদর অবহেলা নিপীড়ন, অন্ধগুহার মধ্যে বসে নোংরা কাজ যদি কখনও আভাসেও তার মনের কোণে ছায়া ফেলে, তাকে সে অতীতের বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। অনাগতের রঙিন স্বপ্নে মাতাল হয়ে সে কাজ করে, হাসপাতালের সবাই তার মমতা নিষ্ঠা আর নিপুণতা দেখে মুগ্ধ হয়।

একদিন রাত-কাজের অবকাশে বড় দিদিমণি তাকে ডেকে তার অতীত জীবন সম্পর্কে জিগেস করলেন। আর মেত্রোনাও নিঃসংকোচে তাঁকে সবকিছু খুলে বললো। বলা শেষ করে সে ম্লান ঠোঁটে হাসলো।

'কি ব্যাপার, হাসছো যে?' বড় দিদিমণি মেত্রোনার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন।

'হাসছি পুরনো সেই দিনগুলোর কথা ভেবে। তা উঃ, সে যে কি ভয়ংকর, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না!'

এই ধরনের কোনো অতীত-চারনার পরেই গ্রিগরির জন্যে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। যদিও ও তাকে কোনদিন মানুষ-জ্ঞান করেনি, তবু গ্রিগরির এই আকস্মিক পরিবর্তনে তার মেয়েলী অন্ধ-ভালোবাসা যেন উথলে ওঠে। কখনও ভাবে ভালো কথায় বুঝিয়ে সে গ্রিগরিকে মানুষ করে তুলবে. কখনও ভাবে গ্রিগরির এই অস্থিরতা, ওর দুঃখের ভারি বোঝা একদিন আপনা থেকেই হালকা হয়ে যাবে। তখন শান্ত স্নিগ্ধ একটা প্রচ্ছন্নতায় ভরে উঠবে তাদের জীবন।

প্রতিদিনের ঘটনাস্রোত দুজনকে পাশাপাশি টেনে আনে, দুজনেই সুখের স্বপ্ন দেখে। কোনো অভাব নেই, দারিদ্র নেই! দুজনেই বয়েসে তরুণ, দেহে শক্তি আছে, মনে বল আছে, ফুলে ফলে কেন তাদের জীবন পল্লবিত হয়ে উঠবে না! কেন সুন্দর, সার্থক হয়ে উঠবে না তাদের জীবন। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই গ্রিগরির বুকের অস্থিরতা, ওর কেমন যেন ক্লান্ত অবসাদ মেত্রোনার মনের রঙীন স্বপ্নটাকে কেবলই বিবর্ণ আর ম্লান করে দেয়।

* * * *

শরতের এক মেঘলা দিনে রুগী নিয়ে গাড়ি ঢুকলো হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। গ্রিগরি আর প্রোনিন ছুটলো রুগী আনতে। নিঃশ্বাস প্রায় পড়ছেই না, বিশীর্ণ একটি কিশোরকে খাটুলিতে তুলতে তুলতে প্রোনিন জিগেস করলো, 'একে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলে?'

চাবুকটা কোমরে গুঁজে গোঁফের একটা প্রান্ত মোচড়াতে মোচড়াতে কোচোয়ান ভারিক্কি চালে জবাব দিলো,' ফকির স্টীটে পেতুনিকভের বাড়ি থেকে।' গ্রিগরির দিকে তাকিয়ে ও মুচকি মুচকি হাসলো। 'তোমাদেরই প্রতিবেশী গো।'

গ্রিগরি চমকে উঠলো। 'সেকি···সেঙ্কা, তুই!' ধরা-অবস্থায় খাটুলির সামনের দিক থেকে গ্রিগরি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো। 'কিরে, আমাকে চিনতে পারছিস?'

গর্তে-ঢোকা চোখের পাতাদুটো কোনোরকমে মেলে সেঙ্কা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে

রইলো। সারা শরীর শুকিয়ে কালচে মে' গেছে। একটু পরে অস্ফুট স্বরে সে বললো, 'হ্যাঁ।'

'ইশ্, এমন প্রাণ-চঞ্চল একরত্তির একটা ছেলে, তারও কি না শেষকালে এই অসুখ হলো!' স্বগত স্বরে কথাটা বললেও বিস্ময়ে হতাশায় আত্মদ্বন্দ্বে গ্রিগরি যেন কাঠের পুতুল বনে গেছে। প্রোনিন তাড়া লাগালো। ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে সেঙ্কাকে বিছনায় শুইয়ে দিলো, তারপর তার গায়ের কম্বলটা খুলে নিলো।

সেঙ্কা কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'আমার বড্ড শীত কোরচে!'

গ্রিগরি বললো, 'দ্যাখ না, এক্ষুনি আমার তোকে গরম জলে গা মুছিয়ে সব ঠিক করে দোবো।'

'আমি আর ঠিক হবো না, গ্রিগরি-খুড়ো!' বাতাসের মতো ফিসফিসিয়ে সেঙ্কা বললো, 'তোমার কানে কানে একটা কথা বলি...অ্যাকর্ডিয়ানটা আমি চুরি করে কাঠ-গুদোমে লুকিয়ে রেখেছিলুম। মাত্র পরশুদিন আমি ওটা প্রথম ছুঁয়েছিলুম. ভারি সুন্দর ...আর তার পর থেকে পেটে কি মোচোড়! আমি পাপ করেচি, গ্রিগরি-খুড়ো। তুমি বরং.. কিসলিয়াকভের এক বোন আছে ..তাকে দিয়ে দিয়ো ..উঃ, মা-গো...' অসহ্য যন্ত্রণায় সেঙ্কা আর কোনো শব্দই উচ্চারণ করতে পারলো না; কেবল বিকৃত হয়ে উঠলো তার শীর্ণ মুখখানা।

যতরকম ভাবে সম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেলো না, বিকেলের দিকে ওরা তাকে লাশ-ঘরে নিয়ে গেলো। গ্রিগরি স্তম্ভিত হয়ে গেছে, ওর কেবলই মনে হচ্ছে কে যেন তাকে সমানে চাবকে চলেছে। মৃত্যুর কাছে মানুষ যে কত অসহায়, এ কথাটা ও আজ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো। ডাক্তাররা পাগলের মতো পরিশ্রম করলেন, ও নিজেও সেবা-যত্নের কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেনি, তবু তাকে বাঁচানো গেলো না। অসম্ভব ক্রোধে বিরক্তিতে গ্রিগরি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। হয়তো একদিন এই রোগ ওর-ও প্রতিটা গ্রন্থি ধরে নাড়া দেবে, সেদিন আর কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না। সব শেষ! নির্জন একাকীত্বের ভয়ে গ্রিগরির বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠলো। আর ঠিক তখনই ওর মেত্রোনার কথা মনে পড়লো।

বুকে পাথরের মতো ভারি হিমেল একটা বোঝা নিয়ে গ্রিগরি ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখলো মেত্রোনা সবে মুখ-হাত ধুয়ে পরিস্কার হয়ে টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। স্টোভে টগবগ করে জল ফুটছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কেটলির মুখ দিয়ে।

গ্রিগরি কোনো কথা বললো না, চুপচাপ চেয়ারে বসে মেত্রোনার মসৃণ কাঁধের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। মেত্রোনাকেও আজ কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। নিঃশব্দে চা ছেঁকে একটা পেয়ালা সে গ্রিগরির দিকে এগিয়ে দিলো।

একসময়ে নীরবতা ভেঙে গ্রিগরিই প্রথম কথা বললো, 'সেঙ্কা মরে গ্যাছে।'

'ওমা, সে কি কথা!' মেত্রোনার গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠলো। 'আহারে বেচারি! ছেলেটা দুষ্টু ছিলো বটে, তবে মনটা...'

'কি ছিলো না ছিলো, সে কথা আর এখন বলে লাভ কি! জল-জ্যান্তো ছেলেটা চোখের সামনে মরে গ্যালো, সেটাই বড় কথা। কিসলিয়াকভের বাজনাটা ও-ই চুরি

করেছিলো…তবু ছেলেটা এমন চালাক-চতুর, ওর ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিলো। বাপ-মা নেই, অনাথ। আমাদের যদি একটা ছেলেমেয়ে থাকতো, জীবনটা তাহলে এত ফাঁকা ঠেকতো না। নইলে কিসের জন্যে আমরা এই বেগার খাটছি? শুধু নিজেদের পেট ভরাবার জন্যে? কিন্তু কেন? আমাদের যদি কোনো ছেলেমেয়ে থাকতো জীবনটা, তাহলে বোধহয় আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারতো।' গ্রিগরির ম্লান কণ্ঠস্বরে মেত্রোনা চমকে উঠলো। কিন্তু গ্রিগরি তা লক্ষ্যই করলো না। 'অথচ দ্যাখ, তুই আমি দুজনেই জোয়ান, তবু আমাদের ছেলেপুলে হয় না। একথা যখন ভাবি, মনটা এত খারাপ হয়ে যায় যে মদ না খেয়ে পারি না।'

'মিথ্যে কথা!' মেত্রোনা চিৎকার করে উঠলো। 'এইসব নিলাজ মিথ্যেগুলো তুই আমাকে শোনাতে আসিস না, বুঝলি? তুই মদ গিলিস তোর বদ স্বভাবের জন্যে…নেশা না করে থাকতে পারিস না, তাই!'

তীক্ষ্ণ কঠিন চোখে মেত্রোনার দিকে তাকাতেই গ্রিগরি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো! মেত্রোনাকে যেন ও চিনতেই পারছে না। এমন ক্রুদ্ধ মূর্তি এর আগে ও আর কখনও দেখেনি, এমন জোর দিয়ে কথা বলতে ও আর কখনও শোনেনি। চেয়ারের হাতলদুটো শক্ত করে চেপে গ্রিগরি বিদ্রূপের স্বরে বললো, 'কিরে থামলি কেন? বল, বলে যা।'

'তুই যদি মিছিমিছি আমার ঘাড়ে দোষ না চাপাতিস, তাহলে হয়তো বলতুম না। তোর ছেলে পেটে ধরি না কেন জানিস? তোর ছেলে আমি আর কোনোদিন পেটে ধরবো না। অসম্ভব! তাছাড়া ছেলেপুলে আমার আর কোনোদিন হবেও না!'

'এত চেল্লাচিস কেন, একটু আস্তে কথা বলতে পারিস না?'

'চেল্লাবো না? একদিন কি মারটাই না মারতিস আমাকে, মনে নেই? এর মধ্যেই ভুলে গেলি?' তীক্ষ্ণ কটাক্ষে অনাবিল হয়ে উঠলো মেত্রোনার কণ্ঠস্বর। 'লাথিয়ে লাথিয়ে তুই আমার পেটটাই নষ্ট করে দিয়েচিস…ড্যালা ড্যালা রক্তে আমার কাপড়-চোপড় ভিজে গ্যাচে, সে খবর কোনো দিন রেখেচিস? আজ ছেলের সাধ জানাতে এসেচিস! মরণ আর কি, লজ্জা হয় না তোর? বছরের পর বছর ছেলেগুলোকে খুন কোরে আজ তুই আমাকে দুষতে এসেচিস! আমি তোর সব…সব সহ্য করতে পারি, শুধু এই কথাগুলো কোনোদিনও ভুলতে পারবো না, বুঝলি? মরার সময়েও না। একটার পর একটা যখনি পেটে এসেচে, টের পেয়েচি, আর রাতের পর রাত জেগে মনে মনে প্রার্থনা করেছি, ঠাকুর এটাকে অন্তত ওই পিশাচটার হাত থেকে বাঁচিয়ে দাও, যেন নষ্ট না হয়! এবার আর নিজেকে সামলাতে না পেরে মেত্রোনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো, রুদ্ধ আবেগে বুজে এলো তার গলার স্বর। 'কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও টেকেনি, আজ আমি বন্ধ্যা হয়ে গেচি, আমার মেয়ে-জন্মের সাধ চিরদিনের মোতো ঘুচে গ্যাচে! অন্যদের ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেচি আর হিংসেয় বুক আমার ফেটে গ্যাচে…আমি আর মা হতে পারবো না, কোনোদিনও না!'

গ্রিগরি পাথরের মতো নির্বাক নিশ্চল। মেত্রোনার এই উগ্রমূর্তি ও কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। অশ্রু-সজল অথচ আদিম জিঘাংসায় স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো যেন ধিকধিক করে জ্বলছে, বুঝি বনবেড়ালের মতো এখুনি লাফিয়ে পড়ে ওর টুঁটিটা ছিঁড়ে নেবে! এবং

এই মুহূর্তে মেত্রোনার পক্ষে তা আদৌ অসম্ভব নয়। বিমূঢ় বিস্ময়ে গ্রিগরি তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসতেও বুঝি ভয় পেলো। অথচ কয়েকদিন আগে হলে কি কাণ্ডটাই ঘটতো সে-কথা ভাবতেই ওর বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠলো।

'তবু তোর সবকিছু আমি মুখ বুজে সহ্য করেচি কেন জানিস ? শুধু তোকে ভালোবাসি বলে। কিন্তু তুই যে জানোয়ার সেই জানোয়ারই হয়ে রইলি…'

'এই, চুপ, অসহ্য জোরে গ্রিগরি ধমকে উঠলো। 'চুপ কর বলচি !'

'তোমরা এখানে এত হল্লা করছো কেন ? ভুলে যেও না এটা হাসপাতাল।'

গ্রিগরির দুচোখ তখন ঝাপসা হয়ে গেছে। দরজার সামনে কে যে এসে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট করে ও চিনতেই পারলো না। প্রচণ্ড ক্রোধে কোনোরকমে টলতে টলতে দরজার সামনে দাঁড়ানো তত্ত্বাবধায়িকাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মেত্রোনা মুহূর্তের জন্যে ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরেই বিছনায় লুটিয়ে পড়ে বালিসে মুখ গুঁজে অঝর কান্নায় ভেঙে পড়লো।

রাত্রি গাঢ় হলো। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তার একফালি ঝিলিমিলি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। কিন্তু একটু পরেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। ঘড়ির দোলকটা টিকটিক করে দুলছে। দুলছে তো দুলছেই। জানলার সার্সির গায়ে বৃষ্টির ধারাগুলো আছড়ে পড়ছে আর সেদিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে মেত্রোনা নিস্পন্দ নিথর হয়ে শুয়ে রয়েছে। যদিও জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে কাঁচের সার্সিতে অদ্ভুত এক রূপকথা সৃষ্টি করছে, তবু তার মনে হচ্ছে ভেতরে বাইরে সারাক্ষণ কে যেন করুণ সুরে বিলাপ করছে। এক সময়ে বৃষ্টি থামলো. তবু মেত্রোনা ঘুমতে পারলো না। 'এবার, এখন কি হবে ?'

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নেশাখোর স্বামীর ভয়ঙ্কর মূর্তিটা যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো। হাজার চেষ্টা করেও মেত্রোনা কিছুতেই মন থেকে সে-মূর্তিটা তাড়াতে পারলো না। গ্রিগরি যদি আবার মদ খাওয়া শুরু করে…ওর সঙ্গে আগের মতো বাস করা অসম্ভব! আগের জীবনের কথা ভাবতেই মেত্রোনার বুক নিঃসীম আতঙ্কে কাঁটা হয়ে উঠলো। নতুন জীবনের স্বাদ না পেলে, অতীত জীবনের কদর্যতাটুকুকেও সে বুঝি কোনো দিন এমনি করে চিনতে পারতো না। 'কিন্তু, নারী-জীবনের এই অপবাদ আমি কেমন করে সহ্য করবো ?'

আচ্ছন্ন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে রাতটা কখন যে কেটে গেলো মেত্রোনা টেরও পেলো না. হঠাৎ চমক ভাঙলো তত্ত্বাবধায়িকার ডাকে। 'কি ব্যাপার মেত্রোনা, তুমি এখনও বিছনায় পড়ে রয়েছো ? আর ওদিকে কাজের সময় হয়ে গেলো ! ওঠো, ওঠো !'

তখনই মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে মেত্রোনা দ্রুত পায়ে হাসপাতালে এসে হাজির হলো, শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে, চোখদুটো বসে গেছে, মুখটা শুকনো। বড় দিদিমণি উদ্বিগ্ন হয়ে জিগেস করলেন, 'কি হয়েছে মেত্রোনা, তোমার শরীর কি খারাপ ?'

'না, ও কিছু নয়।'

'উঁহু, এভাবে চেপে যেও না। শরীর খারাপ লাগলে তোমার জায়গায় অন্য কেউ কাজ করবে। এতে এত লজ্জার কি আছে ?'

মেত্রোনা সত্যিই লজ্জা পেয়েছিলো, ভেবেছিলো কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু বড় দিদিমণির দরদ দেখে মেত্রোনা আর কিছুতেই নিজেকে ধরে পারলো না। দুঃখের মধ্যেও অস্ফুট হেসে সে বললো, 'না, এমনি···মানে·· কাল আমার স্বামীর সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া হয়ে গ্যাচে·· পরে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বেচারি!' বড়দিদিমণি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কেননা উনি মেত্রোনার সব খবরই জানতেন।

মেত্রোনার ইচ্ছে হলো বড়দিদিমণির বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দু চোখ উজাড় করে কাঁদে, কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে সে কোনো রকমে সামলে নিলো। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো।

কাজ শেষ হবামাত্র ঘরে ফিরে এসে মেত্রোনা খোলা জানলার সামনে দাড়ালো বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দেখলো বৃষ্টি মাথায় করেই হাসপাতালের গাড়িটা ধীরে ধীরে প্রাঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করলো। নতুন কোনো রুগী এলো। দূরে মাঠের বুকে কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেত্রোনা চেয়ারে ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইলো।

'এবার, এখন কি হবে?' ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন তার বুকের অতল থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো।

অনেকক্ষণ ধরে সে চেয়ারে গুম হয়ে বসে রইলো আর ক্ষণে ক্ষণে বারান্দায় জুতোর শব্দ শুনে চমকে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রিগরি যখন এলো, দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো, মেত্রোনা চমকে উঠলো না। এমন কি চেয়ার ছেড়ে একটুও নড়লো না। যেন শরতের একটুকরো মেঘলা-আকাশ চেপে বসেছে তার বুকের পরে।

গ্রিগরি ভেতরে প্রবেশ করলো, কিন্তু এগিয়ে এলো না। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললো, ঝোড়ো কাকের মতো সর্বাঙ্গ ভিজে জব জব করছে। মুখে ম্লান একটুকরো হাসি। মেত্রোনা অবাক হয়ে গেলো। 'কিরে, এ কি মূর্তি হয়েচে তোর?'

'আমি তোর পায়ে ধরে মাফ চাইতে এসেচি, মেত্রোনা।'

মেত্রোনা কোনো কথা বললো না।

'বেশ, বল্, কি হলে তুই আমাকে ক্ষমা করবি? জানিস, কাল সারা রাত আমি ঘরময় পায়চারি করেচি আর ভেবেচি। সত্যিই রে, তোর ওপর অনেক অত্যাচার করেচি! হ্যাঁ, আমি নিজে মুখে স্বীকার করচি—আমি অন্যায় করেচি! আজ আমি তোর কাছে মাফ চাইতে এসেচি, মাপ করবি না?'

এবারেও মেত্রোনা কোনো জবাব দিতে পারলো না। তার মনে হলো গ্রিগরির মুখ থেকে ভক ভক করে বেরিয়ে আসা ভদকার গন্ধে সে বুঝি এখুনি জমে পাথর বনে যাবে।

চাপা ধমকের সুরে গ্রিগরি বললো, 'কিরে, কথা বলচিস না যে বড়?'

'তুই মদ খেয়ে মাতাল হয়েচিস। যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'না, আজ সারা দিন আমি মদ ছুঁইনি। তাছাড়া নেশা করা আমি অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েচি। সারাদিন পাগলের মতো ঘুরেচি বলে তোর এ রকম মনে হচ্চে।'

মেত্রোনা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'কিরে, কথা বলবি না ?'

'তোর সঙ্গে আমি আর কথা বলতে চাই না।'

'চাস্ না !' তীব্র ক্রোধে গ্রিগরি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। 'কেন, আমি যেচে তোর কাছে মাপ চাইতে এসেচি বলে ?'

কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠার ভঙ্গি, ক্রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে ওঠা চোখের দীপ্তি দেখে এই মুহূর্তে মেত্রোনার সেই শনিবারগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। মনে পড়ে গেলো তাদের অস্তিত্বের সেই দুর্বিসহ দিনগুলির কথা। নাঃ, যা হবার হয়ে গেছে, আর তাকে প্রশ্রয় দেবো না। তাই, ঢেউ-খেলানো সুরে বললো, 'ও বাব্বাঃ, মানুষের খোলোশ ছিঁড়ে তোর জানোয়ারটা যে আবার বাইরে বেরিয়ে আসচে রে !'

'কি বল্লি ! জানোয়ার ? বেশ, তাই যদি হয়, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ? তুই কি ভাবিস--মাপ না করলে আমার দিন চলবে না ? খুব চলবে। তবু ভেবেচি আমি নিজে গিয়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইবো, তাই এসিচি। তুই মাপ করবি নাকি শুধু তাই বল ?'

'তুই এখান থেকে চলে যা গ্রিগরি, আমি তোকে মিনতি করচি।'

'চলে যাবো ? আর তুই এখানে একা একা মজা লুটবি ?' গ্রিগরি কুৎসিত ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে উঠলো। 'উঁহু, ওটি হবে না, চাঁদ ! এটা কি দেখেচিস্ ?'

গ্রিগরি মেত্রোনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, ডান হাতে ঝকঝকে একখানা ছুরি।

'সত্যিই তুই যদি খুন করতে পারতিস, বেঁচে যেতুম ! কিন্তু ভগবান অত সুখ আমার কপালে দেননি, বুঝলি ?' ঘৃণায় নাক কুঁকচে মেত্রোনা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মেত্রোনার কণ্ঠস্বর, তার উপেক্ষা করার ভঙ্গি দেখে গ্রিগরি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। অথচ একটু আগে হলে ও অনায়াসেই তার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু এখন আর পারলো না। বিশেষ করে ওর দিকে পেছন ফিরে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গ্রিগরি নিঃসীম হতাশায়, ক্রোধে ছুরিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ভয়ঙ্কর স্বরে বললো, 'তুই কি চাস আমার কাছে ?'

'কিচ্ছু না। ছুরি নিয়ে মারতে এসেচিস তো ? মার, মেরে ফ্যাল !'

মেত্রোনার মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রিগরি নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ভেবে পেলো না ঠিক এই মুহূর্তে ও কি করবে। ও এসেছিলো মেত্রোনার মন জয় করতে। কাল রাতে অপমানের গ্লানিতে ও মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। তবু ভেবেছিলো ও যেচে ক্ষমা চাইলে মেত্রোনা ওকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। কেননা পৌরুষের অবমাননা কোনো পুরুষই সহ্য করতে পারে না। ও ভেবেছিলো গতকালের মতো যদি মেজাজ দেখায়, ছুরি দিয়ে তাকে ভয় দেখাবে। আর এখন বিজয়ীনির ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে জানলার সামনে। লজ্জায় দুঃখে অপমানে গ্রিগরি যেন মরমে মরে গেলো।

'শোন মেত্রোনা, পাগলামি করিস না। তুই তো আমাকে চিনিস, রেগে গেলে আমি সব করতে পারি। কিন্তু আমি তো সে জন্যে তোর কাছে আসিনি, এসেছিলুম মাপ চাইতে। আমি তো বলেচি, আমার অন্যায় হয়ে গেচে। তুই-ই বল, এভাবে কি বাঁচা যায় ?' মেত্রোনা তখনও ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছে, মনে পরতে পরতে ভেসে উঠছে অতীত দিনের

ছবি। গ্রিগরি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আমার বুকে যে কি অসহ্য জ্বালা সে যদি তোকে দেখাতে পারতুম! একে কি বাঁচা বলে? এই যে গাদাগাদা কলেরা রুগী আসচে, কেউ মরচে কেউ বাঁচচে, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ? কলেরা রোগের যে যন্ত্রনা, আমার বুকের যন্ত্রনা কি তার চাইতে কম? সে আমি কাউকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তবু আমি জানি এভাবে বাঁচা আমার পক্ষে অসম্ভব! হাসপাতালের রুগীদের কথাই ধর না কেন, ওদের কত আদর-যত্ন। আর আমি? যেহেতু আমি এখনও সুস্থো, তাই কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। অথচ মনের জ্বালায় পলে পলে যে আমি মৃত্যু যন্ত্রনাই ভোগ করচি, সে-খবর কেউ রাখে না। তবু তুই কিনা বলিস আমি শয়তান, আমি পিশাচ, আমি মাতাল!'

শান্ত স্থির আবেগে কথাগুলো বলে গেলেও, তা মেত্রোনাকে স্পর্শ করতে পারলো না। অতীতের স্মৃতিতে তার মন তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। একটু নিস্তব্ধতার পর গ্রিগরি জিগেস করলো, 'কিরে জবাব দিচ্চিস না যে? কি চাস তাই বলবি তো?'

'কিচ্ছু না। তোর কাছ থেকে আমার কিচ্ছু চাওয়ার নেই। কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করচিস? বরং তুই কি চাস, তাই বল্?'

'তবে রে মাগী, তোর বড্ড বাড় বেড়েচে! পায়ের গোলাম হয়ে মাথায় চড়তে চাস? নাঃ, আজ তোকে আমি খুনই করে ফেলবো।' মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে গ্রিগরি ধেয়ে এসে মেত্রোনার চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দিলো, অসম্ভব জোরে মেত্রোনার মাথাটা ঠুকে গেলো টেবিলের কোণে। গ্রিগরি স্পষ্টই বুঝতে পারলো ওদের দুজনের মধ্যে যে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, তা আর কোনোদিনই ভরবার নয়। তাই ক্রোধে মরিয়া হয়ে ও পাগলের মতো গর্জন করে উঠলো। 'তোর বেগম হওয়ার সাধ আজ আমি চিরজন্মের মতো ঘুচিয়ে দোবো!'

ঘুঁষি খেয়ে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মেত্রোনা উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র ঘৃণায় বিষচোখে গ্রিগরির দিকে তাকালো। 'কিরে হাত গুটিয়ে রইলি কেন? মার।'

'চুপ! চেল্লাবি না।'

'আয়, মারবি আয়।'

'ফের চেল্লাচিস?'

'তোর চোখ-রাঙানি অনেক সহ্য করেচি, আর করবো না।'

অসম্ভব ক্রোধে গ্রিগরি গর্জে উঠলো, 'তুই চুপ করবি নাকি তাই শুনতে চাই?'

'না।' গ্রিগরির গলা ছাপিয়েও শোনো গেলো মেত্রোনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

দাঁতে দাঁত চেপে গ্রিগরি সবে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় দরজা ঠেলে ডাক্তার ভাসচেঙ্কো ভেতরে প্রবেশ করলেন। 'কি ব্যাপার, তোমরা কি শুরু করেছো এখানে?'

উনি যে মর্মাহত হয়েছেন সেটা ওঁর মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেলো। গ্রিগরি কিন্তু দমলো না। ছোট্ট একটু ম্লান হেসে ও বললো, 'আজ্ঞে না, তেমন কিছু নয়···স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই একটু বোঝাপড়া···'

গ্রিগরির এই অবজ্ঞায় ভাসচেঙ্কো বিরক্ত হলেন। 'আজ কাজে যাওনি কেন?'

'যেতে পারিনি। নিজের একটা জরুরী কাজ ছিলো।'

'কাল রাত্তিরে কে এখানে চিৎকার চেঁচামেচি করছিলো ?'

'আমরা।'

'বাঃ, চমৎকার ! হাসপাতালটাকে নিজেদের ঘরবাড়ি বানিয়ে তুলেছো দেখছি ! নিয়মকানুনের কোনো বালাই নেই…'

'হাসপাতালে কাজ করি বলে আমরা কারুর ক্রীতদাস নই।'

'চুপ করো ! এটা তাড়িখানা নয়, বুঝলে ?'

একটা কথায় অসহ্য ক্রোধে শরীরে সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে চলকে উঠলো প্রতিটি শিরা উপশিরায়। ইচ্ছে হলো দুহাতে চারপাশের সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। গ্রিগরি অনুভব করতে পারলো অদ্ভুত-কিছু করার এই একটি মাত্র সুযোগ, যা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে। আর কথাটা ভাবতেই হিমেল একটা শিহরণ খেলে গেলো ওর বুকের মধ্যে। 'তাড়িখানা নয়, এটা যে কসাইখানা তা আমি খুব ভালো কোরেই জানি।'

'কি, কি বললে ?' ভাসচেঙ্কো বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

গ্রিগরি বুঝতে পারলো রাগের মাথায় কথাটা ও ঠিক বলেনি। তবু ক্ষমা না চেয়ে বরং আরও উত্তেজিত স্বরে বললো, 'ঠিক আছে, আপনাদের যখন অসুবিধে হচ্চে, আমরা না হয় চলেই যাচ্ছি। নে মেত্রোনা, তোর জিনিসপত্তর সব বেঁধে নে।'

'শোনো অরলভ, আমি তোমাকে ঠিক একথা বলতে চাইনি ! আমি শুধু…'

'চুপ করুন ! আর নাটক করবে না !' ভ্রূ কুঁচকে রূক্ষ কঠিন স্বরে গ্রিগরি দ্রুত ওঁকে থামিয়ে দিলো। 'আপনি কি ভেবেচেন কলেরার মড়ক লেগেচে বলে আমাদের মাথা-গুলোকে একেবারে কিনে নিয়েচেন ?'

'এ তুমি কি বলছো, অরলভ ?' স্তম্ভিত বিস্ময়ে ডাক্তারের মুখ দিয়ে তখন কথা সরছে না। ইতিমধ্যে বারান্দার দরজার সামনে অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

গ্রিগরি ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না। 'কি বলচি আমি ভালো করেই জানি। তাছাড়া আমাদের মতো মানুষদের ভাগ্য চিরদিনই এক, তাকে অত সহজে পালটানো যায় না, ডাক্তারবাবু ! আয়রে মেত্রোনা, চলে আয়।'

'আমি কোথাও যাবো না।' মেত্রোনার দৃঢ় কণ্ঠস্বরে শুধু গ্রিগরি নয়, সবাই চমকে উঠলো।

ভাসচেঙ্কো বললেন, 'অরলভ, তুমি তো মাতাল বা পাগল নও, তাহলে এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছো না ?'

'বুঝতে আমি চাই না। আপনারা চেষ্টা করলে হয়তো কলেরা সারাতে পারেন, পারেন তিল-তিল করে ক্ষয়ে-যাওয়া নিঃস্ব রিক্ত মানুষের মনগুলোকে সারিয়ে দিতে ? জানি আপনারা তা পারেন না। তাহলে আর মিছিমিছি বলে কি লাভ ?' হঠাৎ মেত্রোনার দিকে ফিরে তাকিয়ে ও বললো, 'কিরে, তুই যাবি না ?'

'না।'

'আমি কিন্তু এই শেষবারের মতো তোকে বলচি— তুই আসবি কিনা ?'

'না না না—আমি তোর সঙ্গে কোথাও যাবো না।'

'বেশ !' দাঁতে দাঁত চেপে গ্রিগরি চাপা স্বরে গর্জে উঠলো। 'তুই কি ভেবেচিস্ তোর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না ? সেদিন তোর কলজে আমি ছিঁড়ে উপড়ে নেবো।'

'আচ্ছা, শয়তান তো !' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ডাক্তার ভাসচেঙ্কো যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—এমন আশ্চর্য সুন্দর, অনুসন্ধিৎসু, নিরলস একজন কর্মী কি করে এত দ্রুত এমন ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। এই মুহূর্তে তিনিও যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আমার উচিত তোমাকে পুলিসে দেওয়া।'

গ্রিগরি মাথাটা কেমন যেন আপনা থেকেই নুয়ে এলো। মনে হলো ও সত্যিই হেরে গেছে। এত লোকের সামনে সবাই মিলে যদি ওকে মারতো কিংবা ধরে সত্যিই পুলিসে দিতো, তাহলেও বোধহয় বুকের মধ্যে এমন কষ্ট হতো না। তবু কোন রকমে মুখ তুলে বিষণ্ন চোখদুটো মেলে দিলো। 'দেখুন, আমাকে আর মিছিমিছি ঘাঁটাবেন না। কারুর গায়ে আঁচড় না কেটে এই যে এমনি-এমনি চলে যাচ্ছি, জানবেন এ আপনাদের ভাগ্য।'

কি যেন বলতে গিয়েও না বলে, মেঝে থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে গ্রিগরি সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। কাউকে বিদায় জানালো না, কিংবা কারুর দিকে ফিরেও তাকালো না।

দরজার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ভাসচেঙ্কো ম্লান স্বরে বললেন, 'ওর-যে হঠাৎ কি হলো, মাথা-মণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !'

'আমিও না !' ঘটনার স্রোতে মেত্রোনাও কম বিস্মিত হয়নি।

'কিন্তু ও এখন চললো কোথায় ?'

'কোথায় আবার ? মদ গিলতে।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার ভাসচেঙ্কোও ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মেত্রোনা দেখলো অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। জানলার শিক ধরে মেত্রোনা অনেকক্ষণ সেদিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর একসময়ে ঘরের এক কোণে ফিরে এসে পবিত্র প্রতিমূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসলো। অঞ্জলিবদ্ধ দুহাতে করুণ প্রার্থনা জানাতে গিয়েও পারলো না, নিরুদ্ধ ঝরনার মতো আঝর কান্নায় ভেঙে পড়লো।

* * *

একদিন কোনো শহরে কারীগরী একটি শিক্ষায়তন পরিদর্শন করতে গিয়ে আমার স্বল্প-পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, যিনি শুধু আমার পরিদর্শকই নন, কারীগরী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্যক্তাও বটে।

নকশা-ঘরগুলো ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে উনি আমাকে বললেন, 'আপাতত কাজকর্ম যেভাবে চলছে, সত্যিই খুব আশার কথা. বিশেষ করে তরুণরা…বুঝতেই পারছেন, এতটুকুন একটা প্রতিষ্ঠান আজ দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে উঠলো…এর জন্যে গর্ব না করে পারি না। এখানে কয়েকজন শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা হাতে-কলমে শেখান পড়ান, তাদের অধ্যাবসায় নিষ্ঠা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমি একজনের কথাই বলি…

আমাদের জুতো-তৈরির বিভাগে একজন মহিলাকে পেয়েছি, এমন চমৎকার স্বভাব আর অপরিসীম ধৈর্য। অথচ উনি খুব সাধারণ একজন মুচির ঘরের মেয়ে। কিন্তু যেসব ছেলে-মেয়েদের শেখান, তাদের দ্যাখেন ঠিক নিজের সন্তানের মতো আর শেখানও ভারি সুন্দর সহজ পদ্ধতিতে। সত্যি, আপনি নিজে চোখে তাঁকে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না। এখানেই থাকেন, মাসে মাইনে পান মাত্র বারো রুবল···তারই মধ্যে দুটো অনাথ শিশুকে পালন করছেন। চলুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

ভদ্রমহিলার প্রশংসা শুনে কৌতূহলী হলাম। নাম শুনলাম মেত্রোনা অরলভ। উনি নিজে মুখেই আমাকে তার দুঃখের জীবন-কাহিনী শোনালেন। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে গ্রিগরি এক মুহূর্তের জন্যে ওঁকে শান্তি দেয়নি। মদ খেয়ে মাতলামি করেছে দিনের পর দিন, হাসপাতালের ফটকের বাইরে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছে, কখনও কখনও নির্মমভাবে প্রহারও করেছে।

কলেরার মড়ক শেষ হয়ে যাবার পর হাসপাতালটা যখন উঠে যায়, বড়দিদিমণি ওঁকে এই শিক্ষায়তনে নিয়ে আসেন এবং গ্রিগরি যাতে এখানে এসে হৈ-হুল্লা না করে তার ব্যবস্থাও করে দেন। মেত্রোনা এখন এখানে বেশ শান্তিতেই জীবন যাপন করছেন। সহকর্মী একজন ধাত্রীর কাছ থেকে লেখা-পড়া শিখেছেন, অনাথ দুটি শিশুকে নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে আছেন। প্রতিষ্ঠানের সবাই ওঁকে দারুণ ভালোবাসেন, সম্মানও করেন। শুধু খুকখুকে শুকনো কাসিতে মাঝে মাঝে কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়েন, তাছাড়া বয়েসও বাড়ছে। না, এছাড়া এখানে ওঁর আর কোনো অসুবিধে নেই। অতীতের স্মৃতি-চারণার সময় আমি লক্ষ্য করলাম ওঁর দু'চোখে কেমন যেন ম্লান একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠছিলো।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আমি গ্রিগরির সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। ওকে খুঁজে পেলাম শহরের জঘন্য একটা নোংরা পল্লীতে। কয়েকবারের আলাপে একটু অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠলো। ওর মুখ থেকে যে কাহিনী শুনলাম, তা হুবহু ওর স্ত্রীর জীবন-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। শুধু শেষের দিকে বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বললো, 'হ্যাঁ, ম্যাক্সিম সাহেব, ব্যাপারটা ঠিক এমনি ভাবেই ঘটে গ্যালো। আসলে আমি অনেক ওপরে উঠতে চেয়েছিলাম, তাই হঠাৎ আবার পাঁকে মুখ-গুজে পড়লাম। তারপর থেকে আর কিছুই হলো না, তবু এখনও আশা ছাড়িনি। এখনও সুযোগ পেলে আমি অনেক বড় কিছু করবো, যা সবাই হাঁ-হয়ে দেখবে। আর কিছু না পারি অন্তত পায়ের নিচে দুনিয়াটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবো! কি পেয়েছি জীবনে? একঘেঁয়ে বিষণ্ণতায় মুখ রগড়ে এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ? মেত্রোনার বোঝা ঘাড় থেকে নেমে যাবার পর মনে মনে ভাবলুম—যাক নোঙর যখন ছিঁড়েচি, নৌকো নিয়ে এবার অকুল দরিয়া পাড়ি দেবো। কিন্তু সেভাবে ঘুরেও তো কিছু করতে পারলাম না, চারদিকেই দেখলুম হাঁটু-জল। ভাবলুম পাহাড়ের চূড়ায় উঠবো, সেখান থেকে সবাই আমাকে দেখতে পাবে। কিন্তু সেখানে ওঠার একটা পথও খুঁজে পেলাম না। তবু এখনও মনে বিরাট একটা কিছু করার সাধ আছে। কেমন করে তা অবশ্য জানি না। আসলে কি জানেন ম্যাক্সিম সাহেব, জীবনে আমি কেবল অস্থিরতা নিয়েই জন্মেচি, তাই দুনিয়া ঘুরে কোথাও শান্তি পেলুম না। কি-

বললেন, ভদকা ? হ্যাঁ, খাই বইকি। প্রাণ ভরে খাই। এই একটিই মাত্র জিনিস যা আমার বুকের দাউ দাউ আগুনটা কেবল নিভিয়ে দিতে পারে। এছাড়া আর সবকিছুই কেমন যেন নরক বলে মনে হয়! এই কি জীবন!'

আধো আলো-ছায়ায় যে পানশালার ভেতরে আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করছিলাম, মাঝে মাঝেই তার ভারি পাল্লাদুটো খুলে যাচ্ছে আর প্রতিবারেই কব্জার বিশ্রী একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে। পানশালার ভেতর থেকে দরজাটাকে মনে হচ্ছে যেন বিশাল একটা হাঙরের ধারালো দুটো চোয়াল নিঃশব্দে হাঁ হয়ে যাচ্ছে আর একের পর এক রাশিয়ার নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলোকে উদরস্থ করছে, গ্রিগরির মতো যারা অস্থির চঞ্চল, তাদের, আর যারা নয়, তাদেরও।

খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎই কনভালভের নামটা আমার নজরে পড়লো, আর তখনই হুমড়ি খেয়ে পড়তে শুরু করলাম ঃ

'স্থানীয় কারাগারের তিন নম্বর কুঠরিতে গতকাল রাত্রে আলেকসেন্দার ইভানভিচ কনভালভ নামে মুরমের চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন কয়েদি চিমনির আংটার সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে। ভবঘুরে বৃত্তির জন্যে পস্কভে গেফতার করে তাকে একবার দেশের গ্রামেও পাঠানো হয়েছিলো। কারা-কর্তৃপক্ষের ধারণা অনুযায়ী ও ছিলো শান্তিপ্রিয় আর চুপচাপ ধরনের মানুষ। কারাচিকিৎসকের বিবৃতি অনুসারে বিষাদ-উম্মাদনাই ওর আত্মহত্যার অন্যতম কারণ।'

সংক্ষিপ্ত এই বিবরণটুকু পড়ে মনে হলো শান্ত চুপচাপ মানুষটির আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে আমি বোধহয় অন্য অনেকের চাইতে বেশি আলোকসম্পাত করতে পারি। কেননা আমি ওকে চিনি। আর ওর সম্পর্কে কিছু বলার এটাই বোধহয় একমাত্র সময়। সত্যিই ও ভারি চমৎকার মানুষ। এমন মানুষ এ দুনিয়ায় বড় একটা চোখে পড়ে না।

কনভালভের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হয় তখন আমার বয়েস আঠেরো। সে সময়ে আমি রুটি তৈরির একটা কারখানায় প্রধান কারিগরের সহকারী হিসেবে কাজ করছি। প্রধান কারিগর ছিলো ফৌজী-বাদকদলের একজন প্রাক্তন সৈনিক, পাঁড় মাতাল, প্রায়ই ময়দার তাল নষ্ট করে দিতো। মাতাল হলেই ও শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজতো কিংবা হাতের কাছে যা পেতো তাই দিয়েই আঙুলে তাল ঠুকতো। রুটি নষ্ট করার জন্যে কারখানার মনিব যদি কখনও ওকে ধমকাতো, ভীষণ রেগে গিয়ে উলটে ও মনিবকেই গাল-মন্দ দিতো আর বোঝাবার চেষ্টা করতো যে ও একজন সংগীত বিশারদ।

'ময়দার তাল নষ্ট হয়েচে…রুটি পুড়ে গ্যাচে…ভিজে সপ্ সপ্ করচে!' কারিগর চিৎকার করে উঠতো, লালচে দিঘল গোঁফজোড়াটা ওর খাড়া হয়ে যেতো, পুরু ঠোঁটদুটো কাঁপতো থরথর করে। 'জাহান্নমে যাও, টেরা-চোখো হায়না কোথাকার! তুমি কি মনে করো এইসব করার জন্যে আমি জন্মেচি? চুলোয় যাক তোমার কাজ। তুমি জানো আমি কত উঁচু দরের বাজনদার? বীণা বাঁশি কোনোটাই আমার আটকায় না। এ অঞ্চলে কর্নেটে আমার মতো একটা জুড়ি খুঁজে পাবে তুমি? তুম-তারা-তুম-তুম, হ্যাঁ রে কাতসাপ, এই রইলো তোর কাজ! আমি চল্লুম।'

'তুই চোর বদমাস খুনে শয়তান একটা!' কুমড়ো-পটাসের মতো গোলগাল চেহারা, গোদা গোদা পা ছুড়ে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে চোখ রাঙিয়ে মনিব হুঙ্কার ছাড়বে। 'তোকে যদি আমি এখন পুলিসে দিই, তখন কি হবে?'

'আমাকে। জারের পা-চাটা ওই কুত্তাগুলোর কাছে?' চোখ পাকিয়ে ঘুঁষি বাগিয়ে কারিগর ধীরে ধীরে মনিবের দিকে এগুবে আর মনিব রাগে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে

দেওয়ালের দিকে পৌঁছিয়ে যাবে। সত্যি বলতে কি মনিবের কিছুই করার নেই। গ্রীষ্মের এই সময়ে ভলগা শহরে রুটি তৈরির ভালো কোনো কারিগর পাওয়া না।

এই ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটতো। মাতাল হয়ে কারিগর তাল তাল মাখা ময়দা নষ্ট করতো, ওয়াল্‌জ কিংবা ফৌজী-বাজনার গৎ ধরতো আর মনিব দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করতো। ফলে আমাকেই দুজনের কাজ একলা হাতে করতে হতো।

সেবার আমার স্পষ্ট মনে আছে, ঝড়ের মতো হুড়মুড় করে মনিব ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো, দুচোখ থেকে উপছে পড়ছে বিজয়ীর চাপা হাসি। 'এই যে, সৈনিকপ্রবর! একটা ফৌজী গান গাও তো শুনি।'

কারিগর যথারীতি মাতাল হয়েই ঝিমুচ্ছিলো, হঠাৎ চোখ ঘোঁচ করে তাকালো। বিষণ্ণ স্বরে অবাক হয়ে জিগেস করলো, 'তার মানে?'

'কুচকাওয়াজে বেরুতে হবে।'

মনিবের চাপা উল্লাসধ্বনি শুনে কারিগর বুঝতে পারলো কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। তাই বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে ও জিগেস করলো, 'কোথায়?'

'যেখানে তোমার খুশি।'

'কি বলতে চাইচো তুমি?' সৈনিক ফোঁস করে উঠলো।

'বলতে চাইছি আমি আর তোমাকে রাখছি না। টাকা পয়সা নিয়ে যেদিকে তোমার দুচোখ যায় ফৌজী হাঁক ছেড়ে সোজা বেরিয়ে যাও।'

কারিগর ভালো করেই জানতো তাকে ছাড়া মনিবের চলবে না, তাই ও যখন-তখন তড়পাতো, মনিবকে ধমকাতো, কিন্তু মনিবের এই সোচ্চার ঘোষণায় ও কেমন যেন মিইয়ে গেলো। কেননা এটাও ওর অজানা ছিলো না যে সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্য কোনো কাজ যোগাড় করা ওর পক্ষে অত সহজ নয়। তাই টলমলে পায়ে ও কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালো, উদ্বিগ্ন স্বরে জিগেস করলো, 'ধাপ্পা দিচ্চো না তো?'

'ধাপ্পা? আরে না না!' মনিব হো হো করে হেসে উঠলো। 'মানে মানে এই বেলা সরে পড়ো!'

'সরে পড়বো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেটে পড়ো!'

'তার মানে কাজ খতম, এ্যাঁ?' হতাশ ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে কারিগর চিল-চেঁচানি জুড়ে দিলো। 'এত দিন আমার বুকের রক্ত শুষে ছোবড়া বানিয়ে আজ আমাকে হাঁকিয়ে দিচ্চিস্। আচ্ছা ধেড়ে মাকড়শা তো তুই!'

'কি বল্লি, আমি মাকড়শা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই···তুই একটা রক্তচোষা মাকড়শা!'

টলমলে পায়ে ওকে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে মনিব শয়তানের মতো বিশ্রী কুতকুতে চোখে হাসলো, দু চোখের মণি থেকে ঠিকরে পড়লো আনন্দের ঝিলিক। 'দ্যাখো চেষ্টা করে কেউ যদি তোমায় নেয়। মাগনায় কাজ করতে চাইলেও কেউ তোমাকে নেবে না, আমি সব্বাইকে তোমার গুনের কথা বলে রেখেছি!'

আমি জিগেস করলাম, 'নতুন কোনো কারিগর খুঁজে পেয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, ও ছিলো আমার পুরনো কারিগর। কাজ জানে বটে, সোনা নিয়ে ওজন করা যায়! অবশ্য ও-ও পাঁড় মাতাল। নইলে তিন-চারমাস এক নাগাড়ে ষাঁড়ের মতো খাটতে পারে…একটুও ঘুমবে না, বিশ্রাম নেবে না বা মাইনের জন্যে বিরক্ত করবে না। খালি কাজ করবে আর গান গাইবে! আর সে কি গলা, সোজা গিয়ে পৌঁছবে, তোমার কলজের মধ্যে। গানের পালা চুকলে অমনি বসবে ভদকার বোতল নিয়ে। আর একবার শুরু করলে বুনো ঘোড়াও ওকে থামাতে পারবে না…আরে, ওই তো ও আসছে!' মনিব দরজার দিকে দু কদম এগিয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার সাশা, বরাবরের জন্যে এলে তো?'

'বরাবরের জন্যে।' শোনা গেলো ভরাট একটা কণ্ঠস্বর।

দরজার বাজুতে হেলান দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছর ত্রিশ বয়েস, লম্বা চাওড়া পেল্লাই চেহারা, বলিষ্ঠ কাঁধ। ভবঘুরের মতো শতচ্ছিন্ন জীর্ণ পোশাক, এক পায়ে রবারের চপ্পল, অন্য পায়ে চামড়ার জুতো। মুখখানা ঠিক শ্লাভদের মতো দেখতে, লালচে দাড়ি, এলোমেলো রুক্ষ চুলে খড়ের কুটো লেগে। টানাটানা সুন্দর দুটো নীল চোখ, কিছুটা বিষণ্ণ ম্লান ঠোঁটে চাপা একটুকুরো ক্ষমা-সুন্দর হাসি। ভঙ্গিটা অনেকটা এই রকম—আমি যা আছি তাই, আমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কিছু নেই!'

'এসো সাশা, এসো', নতুন কারিগরের বাড়িয়ে দেওয়া বিরাট থাবাটা মনিব মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো। তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এই হচ্ছে তোমার সহকারী।'

আমরা পরস্পরে কুশল বিনিময় করলাম। ও বেঞ্চিতে গিয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসলো, তারপরনিজের পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে বললো, 'আমার জন্যে দুটো কামিজ আর এক-জোড়া জুতো কিনে দিও, ভাসিলি সেমিয়ার্নভিচ…আর টুপির জন্যে খানিকটা কাপড়।'

'সব পাবে, কিচ্ছু ভেবো না। টুপি আমার কাছে আছে, আজ সন্ধ্যেবেলাতেই কামিজ আর পাজামা কিনে আনবো। আমি তো তোমাকে জানি তুমি কত ভালো লোক…তুমি যখন কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না, কেউ তোমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করবে না। মালিক হতে পারি, কিন্তু আমারও দিল বলে একটা জিনিস আছে। একদিন আমি নিজে হাতে এই কাজ করেছি, জানি কিসে মানুষের চোখে জল আসে। ওসব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। নাও, এখন চটপট কাজে লেগে পড়ো।'

মনিব চলে যাবার পরেও কনভালভ কোনো কথা বললো না, হাসি মুখে চারদিকে কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

নিচু ছাদওয়ালা এই কুঠরিটা মাটির নিচে, রাস্তার সমান্তরাল রেখায় পর পর তিনটে জানলা। নোংরা ধুলো আর ময়দার গুঁড়োয় কাঁচের সার্সিগুলোতে এমন পুরু আস্তরণ পড়েছে যে ঘরের ভেতরে আলো-বাতাস প্রায় ঢোকে না বললেই চলে। দেওয়ালের গায়ে বিরাট বিরাট তিনটে পাত্র, একটা খালি, অন্যটাতে ময়দা মাখা হচ্ছে, তৃতীয়টায় রাখা হচ্ছে তাল তাল মাখা-ময়দা। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড উনুনটার আশেপাশে নোংরা মেঝেতে রাখা ময়দার বস্তাতেই ঘরের এক-তৃতীয়াংশ ভরে গেছে। উনুনের মধ্যে বড় বড় কাঠ জ্বলছে আর রক্তিম শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে ধূসর দেওয়ালের গায়ে। দিনের আলোর সঙ্গে মিশে উনুনের এই টকটকে লালচে আভা চোখের দৃষ্টিকে কেমন যেন ক্লান্ত করে তোলে।

রাস্তা থেকে অবিরাম আসছে অস্পষ্ট কোলাহল। এই সব দেখে শুনে কনভালভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এখানে অনেক দিন কাজ করছো ?'

'হ্যাঁ।'

দুজনে আবার পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। এক সময়ে ও বললো, 'কয়েদখানা আর কাকে বলে! চলো, বাইরের বেঞ্চিটাতে গিয়ে একটু বসা যাক।'

আমরা তাই করলাম, দেউড়ির সামনে বাঁধানো বেঞ্চিতে এসে বসলাম।

'উঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো! হালে আমি সমুদ্দুর থেকে ফিরেছি, কাস্পিয়ান সাগরে কাজ করতুম…বুঝতেই পারছো, তোমাদের এই ছুঁচোর গর্তে নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ সময় লাগবে।'

আমার দিকে করুণ চোখে হেসে ও পথের ওপর দৃষ্টি রাখলো। স্বচ্ছ নীল চোখে ফুটে উঠেছে ম্লান একটা বিষণ্ণতা। পথ-চলা মানুষের ভিড়ে রাস্তাটা মুখর। বাড়িগুলোর দীর্ঘ ছায়ার দিকে পিঠ রেখে ও রেশমের মতো কোমল দাড়িতে অঙুল জড়াচ্ছে। একটু লম্বাটে ওর বিমর্ষ গোল মুখখানার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি এমন এত ভাবছে ও ? মুখ ফুটে কিন্তু সে-কথা জিগেস করতে সাহস পেলাম না। একে ও আমার ওপরওয়ালা, তার ওপর আমাকে ও কেমন যেন একটা সমীহর চোখেই গ্রহণ করেছে। তবু জানার কৌতূহলটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না, তাই ঘুরিয়ে বললাম, 'আমাদের কিন্তু কাজের সময় হয়ে গ্যাছে।'

'হ্যাঁ, চলো।'

ওজন করে দুজনে দুতাল ময়দা ঠাসার পর আমরা চায়ের গেলাস নিয়ে বসলাম, কনভালভ কমিজের পকেট হাতড়ে আমাকে জিগেস করলো, 'তুমি কি পড়তে পারো ? এটা পড়ে দ্যাখো তো কি লেখা আছে,' এই বলে ভাঁজকরা জীর্ণ একটা কাগজ ও আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমি পড়লাম :

"প্রিয় সাশা"।

তুমি আমার আদর আর ভালোবাসা নিও। আমি এমন নিঃসঙ্গ আর অসুখী যে তোমার সঙ্গে মিলনের দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না। যদিও প্রথম প্রথম বেশ ভালো লেগেছিলো, তবু একঘেয়ে এ জীবনে আমি ক্লান্ত আর অসুস্থ হয়ে পড়েছি। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো কেন। দোহাই তোমার, যত তাড়াতাড়ি পারো চিঠি দিও। তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছি। তুমি একটা আস্তো বোকা, নইলে আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে কেন এমন করে চলে গ্যালে! হতাশ হলেও আমি কিন্তু তোমার ওপর রাগ করিনি, কেননা আমি চিরদিনই তোমার কাছে যে সুখে ছিলাম, সে সুখ আমি আর অন্যকারুর কাছে কখনও পাবো না। আমাকে তুমি তোমার মন থেকে মুছে ফেলো না। তুমি যদি আমার সঙ্গে আর একটু ভালো ব্যবহার করতে, আমি চিরদিন তোমার পোষা কুকুর হয়ে থাকতাম। তোমার পক্ষে আমাকে ভুলে যাওয়া সহজ, কিন্তু আমার পক্ষে অত সহজ নয়। তাই তুমি যখন আমাকে দেখতে এসেছিলে, আমি

কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমাকে যে জীবন কাটাতে হচ্ছে তার জন্যে তোমাকে একটা কথাও বলিনি।

আমার ভালোবাসা নিও। বিদায়।

তোমার কাপিতোলিনা।"

আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে কনভালভ অন্যমনস্কভাবে ভাঁজ করে রাখলো, তার পর দাড়িতে আঙুল জড়াতে জড়াতে প্রশ্ন করলো, 'তুমি লিখতে জানো ?

'জানি।'

'তোমার কাছে কালি আছে ?'

'হঁ্যা।'

'তাহলে ওকে একটা চিঠি লিখে দাও তো, পারবে ? নইলে আমার সম্পর্কে ও যাতা ভাববে, ভাববে আমি বোধহয় ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। নাও লেখো…'

'তা না হয় লিখছি, কিন্তু মেয়েটা কে ?'

'একজন বেশ্যা। পুলিসের কাছে ওকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিলে বেশ্যার তালিকায় ওরা ওর নাম কেটে দেবে। ওর ছাড়পত্রটাও ফেরত দেবে। তবে ও মুক্তি পাবে, বুঝতে পেরেছো ?'

প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা মুসাবিদা খাড়া করা গেলো। কনভালক উৎসুক হয়ে জিগেস করলো 'এবার পড়ো তো দেখি কেমন শোনাচ্ছে ?'

চিঠিটা এই রকম দাঁড়ালো ঃ

"প্রিয়তমা কাপা,

তোমাকে ভুলে যেতে পারি এমন নীচমনা আমাকে ভেবো না। তোমাকে আমি ভুলিনি, কিন্তু আমার যাকিছু ছিলো মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছি। আমি আবার নতুন করে কাজ শুরু করেছি, আগামীকাল মনিবের কাছ থেকে আগাম কিছু টাকা নিয়ে ফিলিপের কাছে পাঠিয়ে দেবো, দফতরের তালিকা থেকে ও তোমার নামটা বাদ দিয়ে দেবে। শিগগিরই তোমাকে এখানে আসার মতো গাড়ি ভাড়ার টাকা পাঠাবো। এখনকার মতো বিদায়।

তোমার

আলেকসেন্দার।"

'হু-ম্' মাথা চুলকে চুলকে কনভালভ ঠোঁট বাঁকালো। 'কিন্তু লেখকের মতো তেমন কিছু হলো না। আসলে চিঠিটার মধ্যে কোনো আর্তি নেই। তাছাড়া তোমাকে বেশ কড়া ভাষায় লিখতে বলেছিলুম, তাও তুমি লেখোনি।

'কি হবে কড়া ভাষায় লিখে ?'

'যাতে ও বুঝতে পারে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় আমি কতটা লজ্জিত। এটা তো তোমার শুকনো খটখট করছে, চোখের জল কোথায় ?'

দু এক ফোঁটা চোখের জল না পড়া পর্যন্ত কনভালভ আমাকে কিছুতেই ছাড়লো না। সব শেষে খুশি হয়ে সউল্লাসে আমার কাঁধে থাবা বসালো। 'বাঃ, এই তো বেশ ভালো লিখেছো ! নাঃ, তুমি দেখছি খাসা ছোকরা, আমাদের সময়টা কাটবে মন্দ নয়।'

তাতে আমারও কোনো সন্দেহ ছিলো না! আমি ওকে কাপিতোলিনার কথা জিগেস করলাম।

'কাপিতোলিনা? যদিও তরুণী, তবু দেখলে মনে হবে ঠিক যেন ছোট্ট একটা বাচ্ছা মেয়ে! ভিয়াতকা থেকে এসেছে। ওর বাবা ছিলো সওদাগর। দুর্ভিখ্যের সময় গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পর যত এগিয়েছে ততই খারাপের দিকে গ্যাছে, শেষে এসে ঠেকেছে একটা বেশ্যাখানায়। আমি যখন ওকে প্রথম দেখেছি' অবাক হয়ে ভেবেছি কি করে এমন হলো? ও তো এখনও কিশোরী! দু একদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। ও কান্নাকাটি করলো। আমি বললুম, 'কিচ্ছু ভেবো না। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে ঠিক এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো।' টাকা পয়সা আর অন্য সব ব্যবস্থা পাকাও কোরে রেখেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মাতাল হয়ে পড়লুম। যখন সুস্থ হয়ে উঠলুম, দেখলুম আমি অস্ত্রোকানে রয়েছি। সেখান থেকে এখানে চলে এলুম। একজন লোক ওকে আমার ঠিকানা দিয়েছিলো, আর সেই ঠিকানায় ও এই চিঠিটা লিখেছে।'

জিগেস করলাম, 'এখন কি করবে ভাবছো, ওকে বিয়ে করবে নাকি?'

'বিয়ে করবো আমি! মাতাল কি কখনও বিয়ে করতে পারে? না না, পুলিসের খাতা থেকে আমি শুধু ওর নামটা কাটিয়ে দেবো, তখন ও যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। হয়তো এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাবে, যেখানে ও ভদ্রভাবে বাঁচতে পারবে।'

'কিন্তু ও তো তোমার সঙ্গেই থাকতে চায়?'

'ওটা ওর একটা ছেলেমানুষী। অবশ্য সব মেয়েরাই সমান। এ জীবনে কত মেয়ে যে দেখলুম, আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি! এমন কি একসময়ে কোনো ধনী বণিকের রূপসী বউকেও চিনতুম। আমি তখন সার্কাসদলে সহিসের কাজ করি, হঠাৎ তার নজর পড়লো আমার ওপর। বললো, 'এসো, আমাদের বাড়িতে কোচওয়ানের কাজ করবে।' সার্কাসের কাজ আমার ভালো লাগছিলো না, তাই রাজি হয়ে গেলুম। গেলুম একটার জন্যে, হয়ে গেলো অন্য আর একটা। ওদের মস্ত বড় বাড়ি, দাসদাসী চাকর-বাকরে সারাক্ষণ গমগম করছে! ঠিক যেন একটা প্রাসাদ। ওর স্বামীটা ছিলো আমাদের মনিবের মতো বেঁটে আর গোলগাল, কিন্তু বউটা ছিলো ছিপছিপে আর বেশ লম্বা। বেড়ালের গায়ের মতো যেমন মসৃণ, তেমনি চালাক। যখন-তখন দুহাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখের মধ্যে চুমু দিতো, আর চুমু তো নয় যেন গনগনে জ্বলন্ত কয়লা! এমন ভাবে চুমু খেতো, ভয়ে আমার অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে উঠতো। কাঁপতো ওর ও সারা শরীর। আমি জিগেস করতুম, 'কি ব্যাপার ভেরা, এমন কাঁপছো কেন?' ও জবাব দিতো, 'তুমি একটা ছোট্ট বাচ্ছা সাশা, কিচ্ছু বোঝো না।' সত্যি, আমি এমন বোকা ছিলুম যে কিচ্ছু বুঝতুম না। কেন, কিসের জন্যে, কিভাবে বাঁচা উচিত—আমি আজও বুঝতে পারি না।'

কথা থামিয়ে সাশা এমন বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকালো, তার আয়ত সে চোখের দৃষ্টিতে আধো-ভয় আধো-বিস্ময় আধো-বিষণ্ণতা মিশে মুখের রেখাকে আরও অনন্য, আরও মোহময় করে তুললো।

'তারপর', আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। 'ভেরার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন হলো কেমন করে?'

'তুমি বোধহয় জানো না, মাঝে মাঝে আমি এমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ি যে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তখন মনে হয় এ দুনিয়ায় আমিই বুঝি একমাত্র প্রাণী, অন্য কোথাও আর কেউ বেঁচে নেই। তেমন কোনো মুহূর্তে আমার নিজেকে পর্যন্ত ঘেন্না হয়। এ এক ধরনের অসুখ। সেই থেকেই আমি মদ খেতে শুরু করি। তাই আমি ওকে বললুম, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ভেরা মিখাইলোভনা ; এসব আর ভাল্লাগে না।' ভেরা হেসে উঠলো, 'কেন, আমাকে নিয়ে তুমি কি ক্লান্ত হয়ে গ্যাছো ?' আমি বললাম, 'তোমাকে নিয়ে ক্লান্ত নয় ভেরা, ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি নিজেকে নিয়েই।' প্রথমে ও বুঝতে পারেনি, চিৎকার করে আমাকে তো খুব বকাঝকা করলো। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো চোখের পাতা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'তাহলে যাও।' সুন্দর কালো চোখদুটো তখন জলে টলটল করছে, থোকা থোকা কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের চারপাশে। ও তো আর বড়লোকের মেয়ে ছিলো না, ছিলো খুব সাধারণ একটা গরিব ঘরের মেয়ে। ওর জন্যে আমার দুখ্যু হলো, ঘেন্না হতে লাগলো আমার নিজের ওপরেই। তাছাড়া ময়দার বস্তার মতো অমন একজন স্বামীর সঙ্গে ওর পক্ষেও বাস করা কঠিন। অনেকক্ষণ ধরে ভেরা কাঁদলো, ততক্ষণে ওর সঙ্গে আমার একটা ঝমঝাওতা হয়ে গ্যাছে। সত্যি বলতে কি, ওর ওপর আমার একটু বেশিই দুর্বলতা ছিলো···প্রায়ই ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো দোলাতুম। ঘুমিয়ে পড়লে বিছনায় শুইয়ে দিয়ে ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকতুম—তখন ওকে এত সরল আর সুন্দর দেখাতো ! পাতলা দু ঠোঁটের মাঝে জড়িয়ে থাকতো মিষ্টি একটা হাসি। গ্রীষ্মকালে গাঁয়ে বাস করার সময় কখনও কখনও আমরা বাইরে বেড়াতে যেতুম। ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছোটাতে ও ভালোবাসতো। যখন বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতুম, গাছের গায়ে ঘোড়া বেঁধে আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তুম। ভেরা আমার কোলে মাথা রেখে বই থেকে পড়ে আমাকে শোনাতো, আর আমি শুনতে শুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তুম। ও যে গল্পগুলো পড়তো খুব ভালো। তার মধ্যে গেরাসিম নামে একজন বোবা আর তার কুকুরের গল্পটা আমি কোনোদিনও ভুলবো না। বোবা লোকটা ছিলো ভূমিদাস আর একেবারে নিঃসঙ্গ, কুকুরটা ছাড় আর কেউ তাকে ভালো-বাসতো না। লোকে তাকে নিয়ে মজা করলে কুকুরটাও কাছে গিয়ে ও চোখের জল ফেলতো। সত্যি, সে ভারি করুণ! একদিন গিন্নীমা ওকে বললেন, 'গেরাসিম, তোমার কুকুরটা বড্ড চেঁচাচ্ছে। যাও, ওটার গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে এসো।' গেরাসিম চলে গেলো, কুকুরটাকে নিয়ে উঠলো একটা নৌকোয়। ভেরা যখন এই জায়গাটা পড়তো আমার গা শিরশির করে উঠতো! ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখো একবার, যে কুকুরটা তার এক-মাত্র সান্ত্বনা, তাকেই কিনা ও জলে ডুবিয়ে মারতে চলেছে ! এমন কাজ কেউ কখনও করে ? সত্যিই, গল্পটা যেমন সুন্দর তেমনি বাস্তব ! এই রকম আরও অজস্র গল্প ভেরা আমাকে শোনাতো। আজ ওর জন্যে সত্যিই আমার দুখ্যু হয় এ আমার দুর্ভাগ্য, না হলে ওকে অমন একলা ফেলে চলে আসি ! এমন সর্বস্য উজাড় করে ভালোবাসতে পারতো, আসলে ওর হৃদয়টাই ছিলো কোমল। অন্য মেয়েদের মতো আমরা সবকিছুই করতুম, কিন্তু সব ছাপিয়ে নেমে আসতো এমন একটা নিবিড় শান্তি যে আমি অবাক হয়ে ভাবতুম সত্যিই ও কত ভালো। মনে হতো ভেরা যেন আমার কোলজের রক্তের মধ্যে মিশে

গ্যাছে, আর আমি যেন পাঁচ বছোরের ছোট্ট একটা শিশু, মায়ের সঙ্গে কথা বলছি। তা সত্তেও আমি ওকে ছেড়ে এলুম। এইটেই আমার সবচেয়ে দুখ্যু। এই যন্তন্নাই আমাকে দিনরাত কুরে কুরে খাচ্ছে, আমাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

এই ধরনের অজস্র গল্প আমি শুনেছি। বিশেষ করে ছন্নছাড়া প্রায় সব ভবঘুরেই ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে তাদের প্রেমের কাহিনী হয়তো বা কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই বলে বেড়ায়। কিন্তু কনভালভের এই কাহিনীর মধ্যে সততা, আর এমন একটা আন্তরিক আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গি রয়েছে যা আমি এর আগে আর কখনও শুনিনি—যেমন বই পড়া, সত্যিকারের দুঃখী কোনো মানুষের ব্যাথায় কষ্ট পাওয়া, সুস্থ সবল কোনো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ছোট্ট শিশুর সঙ্গে তুলনা করা, এইসব।

আমি কল্পনা করে নিলাম নারীর শান্ত একটা মুখচ্ছবি ওর দু বাহুর দোলনার মধ্যে ঘুমোয়, ওর চওড়া বুকে মাথা রেখে স্বপ্ন দ্যাখে। ছবিটার মধ্যে এমনই একটা স্নিগ্ধতার স্পর্শ রয়েছে যে এ সত্য আমি উপলব্ধি না করে পারলাম না। তাছাড়া আগাগোড়া ও এমন বিষণ্ন আর কোমল স্বরে স্মৃতিচারনা করে গেলো, যা সাধারণত প্রকৃত কোনো ভবঘুরে, মেয়েদের সম্পর্কে এসব কথা কখনও বলে না ; বরং ওরা এমন একটা ভাব দেখায় যেন এ দুনিয়ায় পবিত্র বলতে কিছু নেই।

'কি ব্যাপার, কিছু বলছো না যে ? তুমি ভাবছো আমি মিথ্যে বলছি ?' উদ্বিগ্ন, নীল চোখদুটো মেলে দিয়ে কনভালভ আমার মুখের দিকে তাকালো, কপালে ফুটে উঠেছে গভীর কয়েকটা বলীরেখা। এক হাতে চায়ের গেলাস, অন্য হাতে ধীরে ধীরে দাড়ি চুমরোচ্ছে। 'মিথ্যে নয়, সত্যি। তাছাড়া মিথ্যে বলে কি লাভ ? আমি জানি অনেকে মিছিমিছি রূপকথা বানাতে ভালোবাসে। কিন্তু বানায় তারা, যারা সত্যিকারের জীবনের মূল্য জানে না। বিশ্বাস করো, আমার এ কাহিনীর মধ্যে এক বর্ণও মিথ্যে নেই, যেমন নেই অবাক হবার মোতো কিছু। ভেরা জীবনে আনন্দ বলতে কোনোদিন কিছু পায়নি। হলেই বা আমি কোচোওয়ান তাতে কি এসে যায় ? মেয়েদের কাছে কোচোওয়ান, অফিসার বলে কিছু নেই। ওদের কাছে আমরা সবাই পুরুষ। আর আমি বোকার হদ্দ হলে কি হবে, আমার মধ্যে ওরা দ্যাখে—আমি ওদের কখনও কষ্ট দিই না, ওদের নিয়ে কখনও রঙ্গ-তামাশা করি না। পাপ করার পর মেয়েরা সব চাইতে বেশি ভয় পাছে ওদের নিয়ে কেউ হাসি-ঠাট্টা করে। মেয়েদের লজ্জা যে আমাদের চাইতে অনেক বেশি। অথচ ওদের নিয়ে রগড় করার পর হাটে হাঁড়ি-ভাঙতেও আমরা একটুও দ্বিধা করি না ঃ "আঃ, তুই যদি দেখতিস্, কাল রেতে যা একটা ছুকরি পাকড়ে ছিলুম ন্যা !" কিন্তু যত চালাকই হোক না কেন, মেয়েরা তা নিয়ে কখনও গর্ব করতে পারে না। সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মেয়েরও লাজ্জা আমাদের চাইতে অনেক বেশি।'

সাশার কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে শুনতে অবাক হয়ে ভাবছিলাম—ওর মতো মানুষের কাছ থেকে এই ধরনের অদ্ভুত সংবেদনশীলতা আশা করা সত্যিই দুর্লভ। সবচেয়ে অবাক লাগছিলো শিশুর মতো স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ও যেভাবে গল্প বলছিলো।

দৈত্যের মতো বিরাট উনুনটায় কাঠ পুড়ছে, তার উজ্জ্বল গোপালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে

সারা ঘরে। জানলার চৌকফ্রেমে ধরা পড়েছে একটু করো নীল আকাশ, তাতে জ্বল জ্বল করছে নক্ষত্র—যার একটা বেশ বড়, পান্নার মতো ঝিকমিক করছে, অন্যটা তার তুলনায় অত্যন্ত অস্পষ্ট।

* * *

সপ্তা খানেকের মধ্যে কনভালভ আর আমি বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম। একদিন আমার পিঠে বিরাট থাবা বসিয়ে হাসতে হাসতে ও বললো, 'না দোস্ত, তুমি বড্ডো সরল। আর এই রকম সাধাসিধে মানুষই আমার বেশি পছন্দ।'

নিজের কাজে কনোভলভ একজন পাকা শিল্পী। অবলীলাক্রমে সাত পুড ময়দা মেখে তোলে, ঠাসে, লেচি বানায়। দেখতে দেখতে ভরা বারকোশটা আবার খালি হয়ে যায়। প্রথম প্রথম ভয় হতো তাড়াহুড়োয় রুটিগুলো, ও এমন ঘেঁষাঘেঁষি উনুনে সাজাচ্ছে যে পুড়িয়ে না ফ্যালে। কিন্তু তিন দফায় একশো কুড়িটা সেঁকার পর যখন দেখলাম প্রত্যেকটা রুটির রঙই সমান বাদামী আর পালকের মতো হালকা, তখন বুঝলাম ও কত উঁচুদরের কারিগর। তাছাড়া নিজের কাজকে ও মনেপ্রাণে ভালোবাসে। ঠিকমতো আঁচ না ধরলে বা খারাপ ময়দা আনলে মনিবকে যেমন গালমন্দ করতো, তেমনি ভাবে রুটিগুলো সম্পূর্ণ গোল আর ফোলা ফোলা হলে বাচ্ছাদের মতো ও খুশিতে চলকে ওঠতো। কখনও কখনও বারকোশ থেকে সবচেয়ে ভালো মুচমুচে, গরম রুটিটা তুলে নিয়ে সহাস্যে দু হাতে লুফতে লুফতে বলতো, 'দ্যাখো, কি সুন্দর! তুমি আমি দুজনে মিলে বানিয়েছি।'

এমন তন্ময় হয়ে ও কাজ করে, সত্যি. দেখলেও আনন্দ হয়। আর, যার যে কাজই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই উচিত কাজের মধ্যে ঠিক এমনিভাবে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া।

একদিন হঠাৎই ওকে জিগেস করলাম, 'সাশা, তুমি গান গাইতে পারো?'

'পারি। কিন্তু যখন আমার মনের মধ্যে দুখ্যু হয় তখনই কেবল গান গাই। কিংবা যখন গান গাইতে শুরু করি তখনই আমার দুখ্যু এসে হাজির হয়। দ্যাখো এ নিয়ে যেন আবার জ্বালাতন শুরু কোরো না বাপু। ঠিক আছে, হাতের কাজ শেষ হোক, তখন দুজনে মিলে একসঙ্গে গাইবো, কেমন?'

আমি রাজি হলাম। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সুরগুলো বুকের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে, তখনই আপন মনে গুনগুন করে উঠছি, আর কনভালভ মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাকে ধমকাচ্ছে, 'থাক থাক, তোমার ওই গুনগুনানি এখন থামাও তো বাপু।'

সেদিন তোরঙ্গ থেকে একটা বই বার করে জানলায় বসে পড়ছি, পাতা ওলটানোর শব্দে কনভালভ ঘুম-জড়ানো চোখদুটো কোনো রকমে মেলে দিয়ে জিগেস করলো, 'কি পড়ছো?'

'পদালিপোভাইতেস্'

'আমাকে পড়ে শোনাও।'

জানলার গোবরাটে বসেই আমি জোরে জোরে পড়তে শুরু করলাম, আর ও উঠে এসে আমার হাঁটুতে মাথা রেখে বসে বসে শুনতে লাগলো। মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে

ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম—ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে গেছে, তার মাঝে ঝিকমিক করছে সাদা দাঁতের সারি তন্ময় আয়ত দুটো চোখ, চওড়া কপালে পড়েছে গভীর ভাঁজ, সুসংলগ্ন হাঁটুদুটো চেপে রয়েছে দু হাতের মুঠোয়। সেই ছবি আজও আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারলাম পিলা ও সিসইকার বিষণ্ণ কাহিনী ওকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে।

আমাকে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কনভালভ জিগেস করলো, 'কি, শেষ হয়ে গেলো ?'

'না না, এখনও অর্ধেক হয়নি।'

'সবটা পড়ে শোনাবে না আমাকে ?'

'তুমি চাইলে নিশ্চয়ই পড়ে শোনাবো।'

'আঃ,' মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে ও শিউরে উঠলো, যেন কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। কেবল চোখদুটো কুঁচকে সরু হয়ে গেলো। কাহিনীটা ওকে এমন ভাবে নাড়া দেবে আমি আশা করিনি। 'সত্যি, তুমি এমনভাবে পড়লে—অ্যাপ্রস্কা, পিলা, সবাই আলাদা আলাদা লোক, সবাই জীবন্ত! সত্যি, ভারি মজার! আচ্ছা, তারপর কি হলো ? ওরা এখন কোথায় যাবে ? ওরা তো সত্যিকারের এক একটা চরিত্র, সৎ চাষী, ওদের চোখ মুখ কণ্ঠস্বর—সব সত্যিকারের, তাই কি না বলো ? শোনো ম্যাক্সিম, রুটিগুলো আগে উনুনে চাপিয়ে দিই, তারপর আরোও খানিকটা পড়া যাবে।'

এক দফা রুটি চাপিয়ে ও সেঁকতে লাগলো, আমি পড়তে শুরু করলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরে সব রুটি সেঁকা হবার পর আমরা আবার নতুন করে ময়দা ঠাসলাম, ময়েম মেশালাম। কোনো কথা না বলে এ সবকিছুই করলাম অসম্ভব দ্রুত হাতে। মাঝে মাঝে ভ্রূ কুচকে কনভালভ আমাকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেলো।

বইটা শেষ হতে হতে প্রায় ভোর হয়ে গেলো। জিভ তখন আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দু হাতে হাঁটু চেপে কনভালভ ঠায় আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, ওর দু চোখের মণিতে অজানা এক অভিব্যক্তি।

আমি ওকে জিগেস করলাম, 'কি, কেমন লাগলো ?'

চোখ ঘোঁচ করে ও ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর বাতাসের মতো ফিসফিস করে জিগেস করলো, 'বইটা কে লিখেছে ?'

তখনও ওর দু চোখ থেকে মুছে যায়নি বিস্ময়ের গাঢ় রেশ, বরং গভীর একটা অনুভুতিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে সারা মুখ। চোখের পাতায় কাঁপছে তারই ছাপ।

আমি ওকে লেখকের নাম বললাম।

'সত্যি, কি আশ্চর্য মানুষ! একেবারে খাঁটি কথা, যাকে বলে বাস্তব। শুনতে শুনতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে। আচ্ছা, ওই লেখকের কি হলো···এর জন্যে ও কি পেয়েছে ?'

'তার মানে ?'

'মানে ওকে পুরোস্কার-টুরোস্কার কিছু দেওয়া হয়নি?'

'কেন, পুরস্কার দেবে কেন ?'

'কুকুরের জীবন নিয়ে এমন সুন্দর একটা বই লেখার জন্যে। তাছাড়া পিলা, সিসইকা, এরা সবাই খুব সাধারণ দুখ্যি মানুষ…কারুর না কারুর উচিত এদের সাহায্য করা।' আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ও চোখের পাতা নামিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'তাহলে ওকে কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি ?'

'না।'

কনভালভ আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে উলটে পালটে দেখলো, তারপর আবার মুড়ে রাখলো ! সত্যি, কি গভীর ! একটা লোক এই বইটা লিখলো…কিছুই না, কেবল কাগজের ওপর কয়েকটা আঁচড়। আচ্ছা, লোকটা কি মরে গ্যাছে ?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটা মরে গ্যাছে, অথচ তার বই এই সবাই এখনও পড়ছে। নিজে চোখে যা দেখেছিলো, সেই কথাগুলোই এখানে লিখেছে, আর অন্য লোকে কোনো কিছু না দেখেও জানতে পারছে পিলা, সিসইকা অ্যাপ্রসকা নামে কয়েকজন লোক একদিন এখানে বাস করতো। তাদের চোখে না দেখেও সবাই তাদের জন্যে দুখ্যু পায়। এমনি তো কত হয়— রাস্তায় কত লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু যেই তাদের কথা বয়েতে লেখা হলো, অমনি তাদের দুখ্যে সবার বুক ফেটে যেতে লাগলো। তুমি এর কি ব্যাখ্যা করবে শুনি ? তাহলে লেখক-লোকটা জীবনে কোনো পুরোস্কার ছাড়াই মারা গ্যালো…সত্যি, বড় দুখ্যের কথা !' বুক খালি করে কনভালভ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বাঁ গোঁফের প্রান্তটা ঠোঁটের কোণে চেপে চিবুতে লাগলো।

আমি তখন ওকে রুশ বুদ্ধিজীবী মহলে পানশালার শোচনীয় প্রভাব সম্পর্কে বোঝাতে লাগলাম, বিশেষ করে এক ঘেঁয়ে কঠোর জীবনযাত্রার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সত্যিকারের দরদী মহান সাহিত্যিকরাও কি ভাবে ভদকায় নিজেদের প্রতিভাকে নষ্ট করেছেন তার কথা বোঝলাম।

'তাহলে ওইসব লোকরাও মদ খায় ?' শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কনভালভ অস্ফুটে প্রশ্ন করলো। ওর আয়ত দুচোখে ফুটে উঠেছে সেইসব মানুষের জন্যে অজানা একটা উদ্বেগ, আশঙ্কা, হয়তো বা করুণা। 'আমার তো মনে হয় এইসব বই লেখার পরেই তারা মদ খেতে শুরু করে, তাই কিনা বলো ?'

ওর প্রশ্নে তেমন কোনো বক্তব্য খুঁজে না পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম।

'অবশ্য মদ খেলে কি হবে, এইসব লেখকরা অন্যের দুখ্যে ঠিক আঠার মতো লেগে থাকে। এ ব্যাপারে ওদের যেন বিশেষ চোখ আছে। হৃদয়ও আছে। অনেক দিন ধরে জীবনকে কাছ থেকে দেখলে তবেই তাদের দুখ্যুকে ওরা বইতে ঢেলে দিত পারে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না, দুখ্যু একবার ওদের স্পর্শ করলে, বুকগুলোকে একেবারে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেয়। তখন ওদের একটা মাত্তরই পথ খোলা থাকে—নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা। সেই জন্যেই ওরা মদ খায়, ঠিক বলিনি বলো ?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিতে ও আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

'তবু আমার মনে হয় ওদের পুরোস্কার দেওয়া উচিত।' কনভালভ যেন লেখকদের মনের গহনে প্রবেশ করতে চায় এমনি ভাবে বলে চললো, 'কেননা অন্যের ভুলভ্রান্তিগুলো

ওরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। এই আমার কথাই ধরো না কেন—আমি কি ? একজন মাতাল ভবঘুরে, কোনো কাজেরই নয়। আমার এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না। কারুর কাছে আমার এ জীবনের কোনো মূল্যে নেই। বউ নেই, ছেলেপুলে নেই, নিজের ঘরবাড়ি বলতে কিছু নেই, এমন কি আমার জন্যে ভাবারও কেউ নেই। আমি কেবল আমার দুখ্যু কষ্ট নিয়েই বেঁচে আছি, অথচ কেন তা কেউ জানে না। আমি নিজেও না। আসলে আমার বুকের মধ্যে কোনো ঝলক নেই, শক্তি নেই। তাকে তুমি যা-ই বলো না কেন, আমার মধ্যে কোথাও কিচ্ছু নেই। শুধু আমি বেঁচে আছি, কিছু একটা খুঁজছি, কিছু একটার জন্যে প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু সেটা যে কি তা আমি নিজেই জানি না।'

দুহাতে জড়ানো হাঁটুর ওপর থেকে মুখ তুলে ও আমার দিকে তাকালো। মনের গহনে রূপ নিচ্ছে যেসব ভাবনা, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ওর সারা মুখে।

আমিও আর দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলাম না। 'হুঁ, তা বটে।'

'আমি জানি না ঠিক কিভাবে তোমাকে বোঝাবো, তবে আমার মনে হয় এই সব লেখকরা কেউ এসে আমার দিকে তাকালে হয়তো আমার জীবনের ব্যাখ্যা দিতে পারবে, পারবে না ? তোমার কি মনে হয় ?'

আমার মনে হলো আমি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিতে পারি এবং সেই মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছিলো খুব সহজ করে ওকে বোঝালাম। নানান ঘটনাবলী, কদর্য পারিপার্শ্বিকতা, অসাম্য এবং যারা এ জীবনের প্রভু, যারা তার হাতের শিকার, তার সম্পর্কে ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

কনভালভ মন দিয়ে সব শুনলো। ও বসে রয়েছে আমার ঠিক মুখোমুখি। চিবুকটা হেলানো রয়েছে দুহাতে জড়ানো হাঁটুর ওপর, আয়ত দু চোখে ফুটে উঠেছে ভাবনার গাঢ় ছায়া, কপালে গভীর কয়েকটা বলিরেখা। যেন নিশ্বাস নিতেই ভুলে গেছে, এমনিভাবে প্রতিটা শব্দকে ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

এতে আমি মনে মনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। অমিত উৎসাহে ওরই জীবনের ছবি এঁকে ওকে দেখালাম যে এ জীবনের জন্যে দায়ী নয়, অন্য আর পাঁচজনের মতো ও-ও কেবল ইতিহাসের সেই অনাদিকাল থেকে চলে আসা অন্যায়ের শৃঙ্খলে বাঁধা সামাজিক ঘটনাবলীর একজন তুচ্ছ শিকার মাত্র। তাই বললাম, 'এর জন্যে তুমি তোমার নিজেকে দোষ দিতে পারো না। বরং এতে তোমারই প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়েছে।'

সেই মুহূর্তে ও কিছু বলতে পারলো না, অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। আমি লক্ষ্য করলাম ওর চোখের গভীরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে উজ্জ্বল একটা হাসির রেখা। জবাবের প্রতীক্ষায় আমিও স্থির হয়ে বসে রইলাম।

একটু পরে মৃদু হেসে মেয়েদের মতো কোমল ভঙ্গিতে ও আমার কাঁধে হাত রাখলো। 'সত্যি, কেমন সহজ কোরে তুমি বুঝিয়ে দিলে। এসব তুমি কোথায় পেলে, দোস্ত ? বই থেকে ? নিশ্চই তুমি পড়াশোনা কোরেছো ? ইশ, আমি যদি একটু লেখাপড়া জানতাম ! কিন্তু আসল জিনিস হলো, তুমি মানুষের দুখ্যুকে অনুভব কোরতে পারো। এর আগে এই ভাবে কথা বোলতে আমি আর কখনো কাউকে শুনিনি। সবচেয়ে

আশ্চর্য্যের ব্যাপার—নিজেদের দুখ্যু-কষ্টের জন্নে সবাই অন্যকে দায়ী করে, কিন্তু তুমি এ সমাজকে, তার পদ্ধতিকে দোষারোপ কোরছো। তোমার মতে নিজের দোষের জন্নে মানুষ একা দায়ী নয়, সে যদি ভবঘুরে হয়ে জন্মায় তবুও না। আর অপরাধীদের সম্পর্কে যে কথা বললে তা সত্যিই অদ্ভুত। কোনো নির্দ্দিষ্ট কাজ না থাকায় তারা চুরি কোরতে বাধ্য, কেনোনা তাদেরও পেটের যোগাড় করতে হয়। ঠিক, খুব ঠিক কথা! নাঃ তোমার মনটা দেখছি খুব নরম।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে আমি যা বললাম তা ঠিক, কি তাই তো?'

'ঠিক কি বেঠিক সে তুমি আমার চাইতে বেশি ভালো কোরে জানো। তুমি লিখতে-পড়তে পারো। অন্য লোকের কথা ধরলে আমার মনে হয় তুমি ঠিক, কিন্তু যদি আমার কথা ধরো...'

'বলো?'

'আমি একটা সিষ্টিছাড়া। এই যে আমি মাতাল, এর জন্নে কাকে দায়ী করবে? আমার ভাই প্যাভেল মদ খায় না। পার্মে তার নিজের একটা ধুটির কারখানা আছে। কারিগর হিসেবে আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ...তবু আমি ভবঘুরে আর মাতাল। অথচ আমরা দুজনে একই মায়ের পেটে জন্মেছি। তাহলে দেখছো আমার মধ্যে নিশ্চই কোনো গোলমাল আছে। আমি বোধহয় গোলমাল নিয়েই জন্মেছি। তুমি বোলছো সব লোক সমান, কিন্তু আমি হচ্ছি একটা সিষ্টিছাড়া। অবশ্য আমি শুধু একা নই, আমার মতো আরোও অনেকে রয়েছে। আসলে আমরা হচ্ছি জনগণের যে প্রকৃত ছবি ঠিক তার উল্টো পিঠে—কারুর জন্নে ভালো কিছু কোরতে পারিনি, এ পৃথিবীতে কেবোল অন্য লোকের জায়গা জুড়ে বসে রয়েছি। এর জন্নে কাকে দায়ী কোরবে বলো? এর জন্নে আমরা নিজেরাই দায়ী। কেননা জীবনের প্রতি আমাদের কোনো ভালোবাসা নেই, এমন কি আমাদের নিজেদের প্রতিও নয়!'

দৈত্যের মতো বিরাট মানুষটা শিশুর মতো স্বচ্ছ চোখ নিয়ে নিজেকে এমন সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করলো, নিজেকে অপদার্থ বলে চিহ্নিত করলো, হৃদয় বিদ্ধ করা এমন করুণ হেসে এ পৃথিবীতে নিজেকে অপাংক্তেয় বলে ঘোষণা করলো যে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এর আগে আর কোনো দিন কোনো ছন্নছাড়া ভবঘুরের মধ্যে এমন আত্মধিক্কার দেখিনি, ওদের অধিকাংশেরই স্বভাব সবকিছু থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, সবকিছুর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা। এ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তারা সবাই অপরের খুঁত ধরতে, অপরকে দোষারোপ করতেই ব্যগ্র। নিজেদের ব্যর্থতার জন্যে তারা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কিংবা অপরের নিষ্ঠুর শঠতার ওপরেই দোষারোপ করে। কনভালভ ভাগ্যের দোহাই দিলো না বা অপরকে দোষারোপ করলো না। জীবনের এই চরম বিপর্যয়ের জন্যে সে একাই নিজেকে দায়ী করলো। পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতার শিকার বলে আমি যত প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম ও ততই জোর দিয়ে নিজেকে এই দুর্ভাগ্যের জন্যে একমাত্র দায়ী বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। ওর কথায় যতই মৌলিক আবেদন থাক, এতে আমি রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। আর ও

ততই নিজেকে আত্মনিপীড়ন করে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো। ওর স্বচ্ছ দুচোখেও ফুটে উঠলো উল্লসিত আনন্দের সেই প্রতিচ্ছবি!

এ দুনিয়ায় সবাই তার নিজের প্রভু, অথচ আমি এমনই একটা হতচ্ছাড়া যে আমার জন্নে কেউ দায়ী নয়।'

সংস্কৃতিসম্পন্ন কোনো মানুষের মুখ থেকে এমন কথা শুনলে আমি বিস্মিত হতাম না, কেননা 'চিন্তাশীল' নামে পরিচিত ব্যক্তির মানসিক গঠনের সঙ্গে এ ধরনের ব্যাধির প্রকপই শোভা পায়। যদিও এ শহরের ক্ষুধার্ত, ক্রুদ্ধ, নগ্ন, আধামানুষ আধাপশুদের তুলনায় কনভালভ একজন 'চিন্তাশীল ব্যক্তিই বটে, তবু ওর মতো অতিসাধারণ, রুক্ষ, সংস্কৃতিহীন মানুষের মুখ থেকে একথা শুনলে অবাক লাগে বইকি। যদিও আমার ইচ্ছে নয়, তবু কনোভালভ যে আর পাঁচ জনের থেকে স্বতন্ত্র এ কথা স্বীকার না করে কোনো উপায় ছিলো না।

বাইরের চেহারায় হাবভাবে ও যতই জঘন্যতম ভবঘুরে হোক না কেন, ওকে যত বেশি করে চিনছিলাম আমার ততই বিশ্বাস হচ্ছিলো ভবঘুরেদের মধ্যে যে নিজস্ব একটা বৈচিত্র আছে কনভালভ তাদের অন্যতম—যারা একাধারে যেমন অমিত উৎসাহি, তেমনি অবাধ্য অথচ কোনো মতেই নির্বোধ নয়।

আমাদের তর্ক ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগলো।

'শোনো কনভালভ। চারদিক থেকে যখন নানা ধরনে বাধা, কদর্যতা মানুষকে ঘিরে ধরে, তখন সে একা কেমন করে নিজের পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

কনভালভের চোখদুটো দৃপ্ত জ্বলে উঠলো। 'কোনোকিছুকে সে শক্ত কোরে আঁকড়ে ধরুক।'

'সেই কোনোকিছুটা কি?'

'সেটা তাকেই খুঁজে বার কোরতে হবে।'

'তাহলে তুমি তা করছো না কেন?'

'তুমি একটা আস্তো বোকা! তোমাকে কি বলিনি যে এর জন্নে আমিই দায়ী। শক্ত কোরে আঁকড়ে ধরার মোতো কোনোকিছুকে যে আমি এখনও খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না।'

রুটির কথা ভেবে আমাদের উঠে পড়তে হলো, নতুন করে আবার কাজে মন দিলাম। তখনও আমরা পরস্পরে নিজেদের মতামতকে সুষ্ঠ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম, অবশ্য প্রমাণ আমরা কিছুই করতে পারিনি। তারপর যখন কাজ শেষ হলো ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম।

মেঝেতে চ্যাটাই বিছিয়ে শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কনভালভ ঘুমিয়ে পড়লো। কয়েকটা ময়দার বস্তার ওপর শুয়ে আমি ওকে লক্ষ্য করলাম—ওকে এখন ঠিক গল্পের কোনো নায়কের মতো দেখাচ্ছে। ঘরের বদ্ধ বাতাসে থমথম করছে পোড়া কাঠ, গরম রুটি আর মাখা-ময়দার টকসা গন্ধ। একটু একটু করে নিশান্তিকার আলো ফুটতে লাগলো। ময়দার গুঁড়োয়-ভরা কাচের সার্সি দিয়ে দেখা গেলো এক চিলতে ধুসর আকাশ। রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে একটা শকট চলে গেলো, দূরে শোনা গেলো পশুপালকে

জমায়েত করার রাখালিয়া শিঙাধ্বনি।

কনভালভ নাক ডাকাচ্ছে। ডাকাতের মতো পেল্লাই বুকটা ওর ধীরে ধীরে উঠছে নামছে। সে দিকে তাকিয়ে কি করে ওকে দ্রুত আমার মতের স্বপক্ষে আনা যায় সে কথা ভাবতে ভাবতে আমিও এক সময়ে ঘুমে ঢলে পড়লাম।

সকালে উঠে আমরা ময়েম মেশালাম, হাত-মুখ ধুলাম, এবং চা খাবার জন্যে একটা কোণতে এসে বসলাম।

'তোমার কাছে আর অন্য কোনো বই আছে ?' কনভালভ জিগেস করলো।

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো আমাকে পড়ে শোনাবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'বাঃ, বেশ ভালো কথা। শোনো, আমি যখন কত্তার কাছ থেকে মাসের মাইনে পাবো তার থেকে তোমাকে অর্ধেক দোবো।'

'কেন, কিসের জন্যে ?'

'বই কেনার জন্যে। তোমার জন্যে যা খুশি বই কিনতে পারো, কিন্তু আমার জোন্যে দুটো বই কিনে দিও—চাষীদের সম্পর্কে। পিলা, সেসইকার মতো লোকদের সম্পর্কে। কিন্তু দেখো, বইগুলো যেন দরদ দিয়ে লেখা হয়…কতকগুলো বই আছে একদম রোদ্দি, জঞ্জাল—যেমন ধরো প্যানফিলকা ও ফিলাতকা'। যদি সত্যিকারের যুদ্ধ-সীমান্তের কোনো ছবি থাকতো, তবু না হয় বুঝতুম। এমন কি পোশেখন্তাস ও অন্যান্য রূপকথাও আমার পছন্দ নয়। এ ধরনের বাজে বই আমার চাই না। তুমি যে ধরনের বই পড়লে এ রকম কোনো বই আছে আমি তাইই জানতাম না।'

'স্তেনকা রাজিনের গপ্প শুনতে তোমার ভালো লাগবে ?'

'কেন, ওটা কি ভালো নাকি ?'

'খুব ভালো।'

'তাহলে শোনাও।'

আমি ওকে কস্তোমারভের 'স্তেনকা রাজিনের অভ্যুত্থান' পড়ে শোনাতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমার বিমুগ্ধ শ্রোতা এই মহাকাব্যের রস ঠিক গ্রহণ করতে পারলো না।

বইয়ের দিকে তাকিয়ে ও জিগেস করলো, 'আচ্ছা এতে কোনো কথাবার্তা নেই কেন ?'

যখন আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম ও বিরাট একটা হাই গোপন করার চেষ্টা করলো। এতে অবশ্য ও লজ্জিতই হলো। 'ঠিক আছে, পড়ে যাও। আমার কথা কিছু ভেবো না।'

কিন্তু শিল্পীর নিপুণতায় ঐতিহাসিক কস্তোমারভ যেখানে স্তেনকা রাজিনের ছবিকে 'ভলগার স্বাধীন জনগণের প্রতিভূ' হিসেবে মূর্ত করে তুলেছেন, সেখানে কনভালভের মধ্যে এক ভাবান্তর দেখা গেলো। এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রান্ত, উদাসীন আর চোখের পাতা ভারি হয়ে থাকলেও, এবার ও ধীরে ধীরে উঠে এলো এবং আমার ঠিক সামনে বসে হাঁটুদুটো দুহাতে মালার মতো জড়িয়ে তার ওপর চিবুক রাখলো। হাঁটুদুটো ঢেকে গেলো তার ঘন দাড়িতে। ভ্রুদুটো ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ও আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো। আগে ওর দু চোখে শিশুর মতো যে সরল বিস্ময় দেখেছিলাম, এখন আর তা নেই। নারীসুলভ নম্র-

মৃদুল নীলভ স্বচ্ছতা মিলিয়ে গিয়ে ওর চোখের মণিদুটো এখন হয়ে উঠেছে আরও গভীর আর কুচকুচে কালো। শিরাবহুল হাতের পেশীগুলো টানটান।

পড়া থামাতেই শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে ও বলে উঠলো, 'থামলে কেন, পড়ে যাও।'

'কি ব্যাপার ?'

'আঃ, পড়োই না।'

ওর বিরক্তির মধ্যেই এমন একটা আন্তিকতা ছিলো যে আমি আবার মন দিয়ে পড়তে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম ও যেন ক্রমশ উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ওর সেই ভঙ্গি দেখে আমিও কেমন যেন মাতাল হয়ে উঠলাম। শেষে স্তেনকা যেখানে ধরা পড়ছে সেখানে আসতেই কনভালভ চেঁচিয়ে উঠলো, 'তাহলে ওরা ওকে ধরে ফেল্লো।'

সত্যি, ওর চিৎকারটা যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ। কপালে টলটল করছে মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, চোখদুটো বিস্ফারিত। ছিটকে লাফিয়ে উঠে ও সোজা বিরাট একটা দৈত্যের মতো আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াও, দাঁড়াও ম্যাক্সিম, পোড়ো না এখন।' বিশাল থাবায় আমার কাঁধ ধরে ও নাড়া দিলো। 'না, তার আগে বলো ওর কি হবে। ওরা কি ওকে খুন করবে ?'

অনেকের মনে হতে পারে ও বুঝি কনভালভ নয়, ও যেন স্তেনকা রাজিনেরই ভাই ফ্রোলকা তিনশো বছর ধরে যে তার ভবঘুরে জীবনে স্তেনকারই রক্তের ধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। তাই আজও দেহের সমস্ত শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা নিয়ে ও 'কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরার' চেষ্টা করছে, তিনশো বছর আগে ধরা পড়া স্বাধীনতা-প্রেমিক বিপ্লবীর জন্য যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা অনুভব করছে।

'দোহাই মাক্সিম, থেমো না, পড়ে যাও !'

আমি পড়ে চললাম। কনভালভের উৎকণ্ঠা আর যন্ত্রণা, স্তেনকা রাজিনের নির্যাতন গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে আমাকেও। বুকের মধ্যে দ্রিমি দ্রিমি মাদলের মতো অবিরাম কি যেন একটা বেজে চলেছে। শিগগির আমরা সেই জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে রাজিনকে পীড়ন করা হচ্ছে।

কনভালভ দাঁতে দাঁত চেপে রইলো, ওর নীলাভ চোখদুটো জ্বলছে। আমার কানের কাছে ও এত জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে যে কাপালের ওপর থেকে চুলগুলো উড়ে এসে পড়ছে আমার চোখের ওপর। আর আমি বার বার চুলগুলো ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছি। সেই দেখে কনভালভ আমার কাপালের ওপরের চুলগুলো ওর ভারি হাতের তালুতে চেপে রইলো। আমি পড়ে চললাম :

"তারপর রাজিন এত জোরে দাঁতে দাঁত চাপলো যে থ্যাতলানো মাড়ি থেকে কয়েকটা দাঁত খুলে গেলো, রক্ত সমেত ওপড়ানো দাঁতগুলো সে থু-থু করে মাটিতে ফেলে দিলো..."

'থামো থামো, আর সহ্য করতে পারছি না !' আমার কাছ থেকে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে ও ঘরের কোণে টানমেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর চিৎকার করে কেঁদে ওঠার ভয়ে লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো। আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষাই খুঁজে পেলাম না। এক সময়ে নোংরা সুতীর পাজামায় চোখ মুছে কনভালভ হাঁটুর মধ্যে

থেকে মুখ তুলে তাকালো। 'একবার ভেবে দ্যাখো ম্যাক্সিম—পিলা, সিসইকা, এখন আবার স্তেনকা—এদের কি চরম পরিণতি! নিজের দাঁত থু থু করে ফেলে দেওয়ার কথাটা ভেবে দ্যাখো একবার!'

স্তেনকার দাঁত ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটাতে ও বিশেষ ভাবে মর্মাহত হয়েছে, সে কথা বলতে বলতে বারবার ওর কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। সত্যি বলতে কি, স্তেনকার ওপর নির্মম অমানুষিক অত্যাচারে আমারই মাথা তখন ঝিমঝিম করছিলো। বইটা আবার মেঝে থেকে কুড়িয়ে এনে আমার হাতে দিয়ে কনভালভ বললো, 'ওই জায়গাটা আর একবার পড়ো তো দেখি। না, তার আগে দাঁতের কথাটা কোথায় লেখা আছে দেখিয়ে দাও তো।'

পংক্তিগুলো দেখিয়ে দিতে ও স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

'সত্যিই কি ওই কথাগুলো এখানে লেখা আছে—রক্ত সমেত ওপড়ানো দাঁতগুলো সে থু থু কোরে মাটিতে ফেলে দিলো? এখানকার এই ওক্ষোরগুলো তো দেখছি ঠিক অন্য ওক্ষোরের মতো। আহারে, দাঁতগুলো ওপড়ে আসার সময় ওর কতো কষ্ট হয়েছিলো! আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত স্তেনকার কি হোলো? ওরা কি ওকে খুন করবে?'

দীপ্ত উদ্ভাসিত চোখে এমন গভীর ব্যাকুলতা নিয়ে ও কথাগুলো বলল যে স্তেনকার মৃত্যু আশঙ্কায় আমি পর্যন্ত কেঁপে উঠলাম।

দিনের বাকি সময়টা আমরা ঝিম-ধরা একটা ক্লান্ত অবসাদের মধ্যে কাটালাম, সারাক্ষণ কেবল স্তেনকার কথাই বললাম, তার জীবনের ঘটনাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। তার ওপর লেখা গানগুলোর দু একটা গাইতে গিয়েও কনভালভ মাঝপথে হঠাৎ থমকে গেলো।

সেই দিন থেকে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার আরও নিবিড় হয়ে উঠলো।

'স্তেনকা রেজিনের অভ্যুত্থান' 'তারাস বুলবা' 'অভাজন' বইগুলো আমি ওকে বহুবার শুনিয়েছি। আমার বিমুগ্ধ শ্রোতা তারাস বুলবার দ্বারা প্রভাবিত হলেও কস্তোমারভের বইয়ের গভীর অনুভূতিকে ও কিছুতেই অতিক্রম করতে পারলো না। তাছাড়া আভাজনে মাকার দেভুসকিন এবং ভারিয়ার ব্যাপারটা ও প্রায় কিছুই বুঝতে পারেনি। সম্ভবত মাকারের চিঠির ভাষা, বিশেষ করে বুড়োর প্রতি ভারিয়ার মনোভাব ওকে বিরক্তই করে তুললো। 'চুলোয় যাগ্‌গে এসব। পিলা, সিসইকা, ওরা হলো অন্য জাতের···যাকে বলে সত্যিকারের মানুষ। বেঁচেছে, সংগ্রাম কোরেছে, দুখ্যু-কষ্টো পেয়েছে। কিন্তু এরা কি? খালি চিঠি লিখছে, খালি চিঠি লিখছে···বিরক্তিকর। আসলে এরা জ্যান্তো নয়, তৈরি লোক। অথচ তারাস আর স্তেনকা···হা ভগবান ওরা যদি কোনোদিন একসঙ্গে মিলতে পারতো, হয়তো ওরা অনেক কিছু কোরতে পারতো! হয়তো ওরা পিলা আর সিসইকার নতুন জীবন দিতে পারতো!'

কাল সম্পর্কে কনভালভের ধারণাটা ভারি গোলমেলে। ওর ধারণা সমস্ত প্রিয় চরিত্রই সমকালীন। তাদের দুজন বাস করে উসলেইতে, একজন ইউক্রেনে আর চতুর্থজন বাস করে ভলগায়। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে পিলা আর সিসইকা যদি ভলগা পাড়ি দিতোও, তবু ওরা কোনোদিন স্তেনকাকে খুঁজে পেতো না, আর স্তেনকা যদি ডন পেরিয়ে ইউক্রেনে যেতো, তবু কোনোদিন বুলবার সঙ্গে তার দেখা

হতো না।

কালের ব্যবধান সম্পর্কে প্রকৃত সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে কনভালভ মর্মাহত হলো। আমি ওকে পুগাচেভ বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কনভালভের মনে তেমন কোনো দাগ কাটতে পারলো বলে মনে হলো না।

ছুটির দিনে আমরা নদী পেরিয়ে মাঠের দিকে চলে যেতাম। ভোর হতে না হতে সঙ্গে কিছুটা ভদকা, রুটি আর একটা বই নিয়ে আমরা কনভালভের ভাষায় 'হাওয়া খেতে' বেরিয়ে পড়তাম।

আমরা সাধারণত 'কাঁচের ঘর'টায় যেতেই বেশি পছন্দ করতাম। এই নামের বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। শহর থেকে দূরে চারদিক-খোলা মাঠের মধ্যে এই বাড়িটার নাম দেওয়া হয়েছিলো 'কাঁচের ঘর'। তিনতলা পাকা বাড়ি, ফুটো ছাদ, ভাঙা জানলা, নিচের ঘরগুলোয় গ্রীষ্মকাল ধরে দুর্গন্ধে ভরা পচা জল জমে থাকে। নড়বড়ে জীর্ণ বাড়িটা তার কাঁচের ভাঙাচোরা জানলা নিয়ে নির্বাসিত পঙ্গু মুমূর্ষু মানুষের মতো নির্নিমেষ চোখে শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বছরের পর বছর বসন্তের বন্যায় মাঠের মাঝখানে দ্বীপের মতো ঠায় একা দাঁড়িয়ে থেকে পুলিসের হঠাৎ-হঠাৎ হানার হাত থেকে নিজেকে টিঁকিয়ে রেখেছে। ফুটো ছাদের নিচে আশ্রয় নিয়েছে নানা ধরনের সন্দেহজনক ভবঘুরের দল।

সেখানে সব সময় তাদের ভিড় লেগেই রয়েছে। অর্ধ-নগ্ন ক্ষুধার্ত দেহে এরা ধ্বংসস্তূপে পেঁচার মতো বাস করে! কনভালভ আর আমি তাদের কাছে সম্মানীয় অতিথি, কেননা যখনই আসতাম সাদা রুটি, আধ বোতল ভদকা আর কষা মাংস কিনে আনতাম। মাত্র দু'তিন রুবল খরচা করেই কনভালভের ভাষায় 'কাঁচের মানুষদের' আমরা বেশ ভালো ভাবে খাওয়াতে পারতাম। তার বদলে ওরা আমাদের সত্যি-মিথ্যের মেশানো ভয়ঙ্কর সব গল্প শোনাতো। আমিও অনেক সময় ওদের বই পড়ে শোনাতাম, আর ওরা অবাক হয়ে মন দিয়ে শুনতো।

জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, অথচ জীবন সম্পর্কে ওদের গভীর জ্ঞান দেখে মাঝে মাঝে আমি স্তম্ভিত হয়ে যেতাম, সাগ্রহে শুনতাম ওদের গল্প। কনভালভও শুনতো, তবে মাঝে মাঝে ও ওদের দার্শনিক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতো আর কখনও আবার আমাকেও সেই বিতর্কের মধ্যে টেনে আনতো।

ডাকাতের মতো দেখতে কেউ যখন তার অতীত কাহিনী শোনাতো, কনভালভ মুচকি মুচকি হেসে মাথা নাড়তো। বক্তা সেটা লক্ষ্য করে বলতো, 'কি ব্যাপার সাশা, গল্পটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'নিশ্চই, কেন বিশ্বাস হবে না? লোকে যখন কিছু বলবে তখন তাকে বিশ্বাস করতে হবে বইকি। এমন কি মিথ্যে বলছে জেনেও তোমাকে তা বিশ্বাস করতে হবে এবং কেন মিথ্যে বলছে তোমাকে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। সময় সময় সত্যের চাইতে মিথ্যেটাই তাকে ভালোভাবে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে, আর তা থেকেই তুমি জানতে পারবে আমাদের জীবনটা কি রকম তুচ্ছ, অসার। সেই জন্যেই তো আমরা

মিথ্যে দিয়ে নিজেদেরকে সাজাই, তাই কিনা বলো ?'

'তা অবশ্য ঠিক।' বক্তা গম্ভীর হয়ে জিগেস করতো, 'কিন্তু তখন অমনভাবে মাথা নাড়লে কেন ?'

'তার কারণ ব্যাপারটা তুমি ঠিক মতো বোঝাতে পারোনি। তুমি এমনভাবে কথাটা বললে যেন তুমি নিজে বানাওনি, বানিয়েছে যার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয়েছিলো, সে কেন লোকটাকে তুমি ভেতরে ঢুকতে দিলে ? কেন তুমি তাকে বাধা দিলে না ? আমরা সবসময় অপরকে দোষ দিই···কেউ যদি আমাদের পথে বাধা সিষ্টি করে আমরাও তার পথে বাধা দিই, ঠিক কিনা বলো ?'

পাশ থেকে কে যেন বলতো, 'নিশ্চয়ই, জীবনটাকে এমন ভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে সকলের জন্যে পর্যাপ্ত স্থান থাকে, যাতে কেউ কারুর পথ না আগলে রাখে।'

'কিন্তু সেটা করবে কে ?' প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে কনভালভ আবার নিজেই তার জবাব দিতো, 'করতে হবে আমাদেরই। অবশ্য কেমন করে করতে হয় না জানলে, জীবনে ভালো কিছু করতে না শিখলে, কি করে করবো সেটাও ভেবে দেখতে হবে। তবে কাউকে তাড়াবার আগে তাড়াতে হবে নিজেদেরই, কেননা আমরা কি তা তো আর কারুর জানতে বাকি নেই।'

সবাই আপত্তি জানালেও কনভালভকে তার যুক্তি থেকে এক চুলও সরানো যেতো না, নিজের মতামতকে ও শক্ত করে আঁকড়ে থাকতো—প্রতিটা মানুষ তার ব্যর্থতার জন্যে নিজেই দায়ী, এর জন্যে অন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

এমনি অবস্থায় আমার পক্ষে ওকে নড়ানো হয়ে উঠতো প্রায় অসম্ভব। অথচ জনগণ সম্পর্কে ওর ধারণা—একদিকে যেমন ওরাই জীবনকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম যাতে সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি আবার ওরা এমন দুর্বল আর মেরুদণ্ডহীন যে পরস্পরকে দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

সাধারণত এইসব বির্তকের পালা শুরু হতো দুপুরে আর শেষ হতো সেই মাঝ রাতে। তারপর আমরা দুজনে 'কাঁচের মানুষদের' ছেড়ে গাঢ় অন্ধকারে এক-হাঁটু কাদা ছপছপ করতে করতে ফিরে আসতাম আমাদের যক্ষপুরীতে।

একবার তো এঁদো একটা ডোবায় আমরা প্রায় ডুবেই মরছিলাম, আর একবার গোনা কুড়ি 'কাঁচের মানুষদের' সঙ্গে কাটাতে হয়েছিলো পুলিস-হাজতে। কিন্তু যখন আমাদের মন দার্শনিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতো না, নদী পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম মাঠের দিকে, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তাম বসন্তের বন্যায় এনে ফেলা ছোট ছোট মাছে ভরা কোনো হ্রদের ধারে। কখনও কখনও কনভালভ অদ্ভুত খেয়ালী স্বরে বলতো, 'দ্যাখো ম্যাক্সিম, আকাশটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো কি সুন্দর!'

ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আমরা সীমাহীন নীলিম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। প্রথম দিকে আমরা পাতার অস্পষ্ট ফিসফিসানি আর জল-ঢেউয়ের: মৃদু মর্মর শুনতে পেতাম, অনুভব করতে পারতাম পিঠের নিচের মাটির স্পর্শ। কিন্তু অচিরেই ধীরে ধীরে নীল আকাশ নেমে আসতো আমাদের বুকের ওপর। আমরা হারিয়ে ফেলতাম সমস্ত চেতনা, আমাদের অস্তিত্ব। যেন মাটি থেকে তুলে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা নীলিম মগ্নতায়

আমাদেরকে প্রসারিত করে দেওয়া হচ্ছে, আর নড়েচড়ে বা কথা বলে আমরা সেই ধ্যান-মগ্নতাকে কোনোমতেই ভাঙতে চাইতাম না।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দুজনে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম, তারপর আবার নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সতেজ হয়ে ফিরে যেতাম আমাদের কাজে।

অব্যক্ত প্রেম আর প্রকৃতিকে কনভালভ সত্যিই নিবিড় করে ভালোবাসতো। যখনই ও মাঠের মধ্যে কিংবা নদীর ধারে বসে থাকতো, শিশুর মতো সরল মগ্ন একটা তন্ময়তায় ডুবে যেতো, কখনও কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, 'হুঁ, তাহলে ব্যাপারটা হলো এই।'

সব চেয়ে সংবেদনশীল কোনো কবির বহু উচ্ছ্বাসের চাইতে বরং ওর এই ছোট্ট উক্তিতেই ধরা পড়তো প্রকৃতির যাকিছু অপার সৌন্দর্য।

এমনিভাবে দিনের পর দিন দুটো মাস কেটে গেলো। স্তেনকা রাজিনের অভ্যুত্থান বইটা এতবার পড়ে শুনিয়েছি যে গল্পটা আগাগোড়া ও নিজের ভাষায় বলে যেতে পারতো। আর ওর কাছে তা সুন্দর একটা রূপকথার মতো মনে হতো। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কাপিতোলিনা, প্রথম দিন যার চিঠি আমি কনভালভকে পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং জবাব লিখে দিয়েছিলাম, এ পর্যন্ত তার সম্পর্কে আর একটা কথাও হয়নি।

ফিলিপের মারফত তাকে ও টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলো এবং তার কথা পুলিসকে বলার জন্যে অনুরোধও করেছিলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিলিপ বা মেয়েটির কাছ থেকে কোনো জবাব আসেনি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ময়দা মেখে সবে উনুনে চড়াতে যাবো, হঠাৎ রুটির কারখানার দরজাটা খুলে গেলো, আর অন্ধকারের ওপার থেকে শোনা গেলো মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর, 'এই যে, শুনছেন?'

কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন নম্র অথচ ·: ষাত্মক মনে হলো।

আমি জিগেস করলাম, 'কি চান বলুন?'

'কারিগর কনভলভ কি এখানে কাজ করেন?'

মেয়েটিকে এবার দরজার সামনে দেখা গেলো, ঝুলন্ত বাতি থেকে আলো এসে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। মাথায় সাদা পশমের একটা শাল জড়ানো, তার চারপাশ ঘিরে গোল বেশ সুন্দর একটা মুখ, টুকটুকে লাল ঠোঁটে হাসার সময় চিবুকে টোল পড়ছে। আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ করে।'

'করে, করে।' হাতের বারকোসটা মেঝেতে ফেলে কনভালভ উল্লাসে প্রায় চিৎকারই করে উঠলো। তারপর বড় বড় পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

মেয়েটি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, 'সাশা, তুমি!'

দুহাত বাড়িয়ে ঝুঁকে কনভালভ মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। 'কেমন আছো? কখন এখানে এলে? যাক, এখন তাহলে তুমি মুক্তো তো? কি, সেদিন তোমাকে বলেছিলুম না? এখন আর তোমার সামনে কোনো বাধা নেই। এবার মাথা উঁচু

কোরে সোজা সামনে এগিয়ে যাও, কোনো ভয় কোরো না।' দরজার ওখান থেকেই ও চেঁচিয়ে আমাকে বললো, ম্যাক্সিম,'আজকের কাজটা তুমি একাই চালিয়ে দাও ভাই, আমি একে একটু দেখি। তারপর কোথাও থাকবে বলে ঠিক করেছো, কাপা ?'

'এখানে তোমার সঙ্গে।'

'এখানে ? এখানে তুমি থাকতে পারো না, কাপা। আমরা এখানে রুটির কাজকম্মো করি...তাছড়া আমাদের মনিব খুব কড়া লোক। রাতের মতো তোমাকে অন্য কোথাও থাকার ব্যাবস্থা করতে হবে...হয়তো কোনো সরাইখানায়। চলো, দেখি কি করা যায়।'

ওরা বেরিয়ে গেলো। আমি রুটি সেঁকার কাজে মন দিলাম। ভেবেছিলাম ভোরের আগে কনভালভ আর ফিরবে না, কিন্তু ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ও ফিরে এলো। প্রত্যাশা মতো মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে খুশির বদলে বিষণ্ন আর ম্লান হতে দেখে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেলো। 'কি ব্যাপার কনভালভ, তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ?'

একটু নিস্তব্ধতার পর ও ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'কিছু না।'

আমি জেদ ধরলাম, 'কিন্তু তোমাকে যে ...'

'তাতে তোমার কি ?' ক্লান্ত ভঙ্গিতে ও নিজেকে টানটান করে মেলে দিলো বেঞ্চির ওপরে। 'হাজার হোক ও তো বেশ্যা।'

ওর কাছ থেকে কথা বার করতে আমাকে রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যেতে হলো, তবু শেষমেষ গজগজ করতে করতেই বললো, 'বল্লুম না ওটা একটা বেশ্যা। আমি যদি এত বোকা না হতুম, তাহলে এসব ঘটতো না, বুঝলে ? তুমি তো শুধু বলেই খালাস—মেয়েরাও মানুষ। আমিও জানি ওরা পেছনের পায়ে হাঁটে না বা ঘাস চিবোয় না, ওরা কথা বলতে জানে, হাসতে পারে, তবু ওরা ঠিক আমাদের মতন নয়। কেন, তা অবশ্য জানি না। এই কাপার কথাই ধরো না কেনো, ওর বক্তব্য হচ্ছে—আমি তোমার সঙ্গে বউয়ের মতো থাকতে চাই, তোমার পেছন পেছন কুকুরে মতো ঘুরতে চাই। পাগলের মতো এ রকম কথা শুনোছো কোনো দিন ? আমি ওকে বুঝিয়ে বললুম, তা হয় না কাপা। কি করে তুমি আমায় সঙ্গে বাস করবে ? নিজেই একবার বিচার করে দ্যাখো—প্রথমত আমি মাতাল, দ্বিতীয়ত আমার মাথা গোঁজার কোনো আস্তানা নেই, তৃতীয়ত আমি ভবঘুরে, দীর্ঘদিন কোথাও একটানা বাস করতে পারি না...' এই রকম আরও কত কারণ দেখালুম। ও বললো, মাতাল তো কি হোয়েছে, সব মজুররই তো মাতাল, কিন্তু তাদের তো বউ আছে আর মাথা গোঁজার ঠাঁই বলছো ? বউ হলে দেখবে ঠিকই একটা আস্তানা জুটে গ্যাছে। তখন আর তোমাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে না।' আমি বললুম, না কাপা, আমি এ ধরনের জীবনের উপযুক্ত নই, আর হবোও না কোনোকালে। ও বললো, আমি কিন্তু তাহলে নদীতে ঝাঁপ দোবো। আমি বললুম, আচ্ছা বোকা মেয়ে তো ! ও কিন্তু সে কথা কানেই নিলো না, যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ করলো, তুমি শঠ, পাজি, বদমাইশ, আমাকে ঠোকিয়েছো ! পালিয়ে পথ না পাওয়া পর্যন্ত ও বকবক করলো, তারপর কাঁদতে শুরু করলো ! আমাকে যদি না চাও তো কেন ওখান থেকে চলে আসতে বললে ? এখন আমার কি হবে ? হতভাগা, বদমাইশ, ছুঁচো...তুমিই বলো ম্যাক্সিম, ওকে নিয়ে এখন আমি কি করি ?'

'সত্যিই তো, কেন তুমি ওকে এখানে আসতে দিলে ?'

'আচ্ছা বোকা তো তুমি ! ওর জন্যে আমার দুখ্যু হয়েছিলো। কাউকে পাঁকে ডুবতে দেখলে দুখ্যু লাগে না বুঝি ? তা বলে এভাবে নিকেকে জড়িয়ে ফেলতে পারি না। আমি যদি সংসারই করতে চাইতুম, অনেক আগেই বিয়ে করতে পারতুম। কত সুযোগ ছিলো, আর যৌতুকেরও কোনো অভাব হতো না। কিন্তু যা আমার ক্ষমতার বাইরে, তা আমি কেমন করে করবো বলো ? সারাক্ষণ ও প্যানপ্যান করলো। সেটাও অবশ্য খুব খারাপ। কিন্তু কি করবো ? আমি তা পারি না।'

বেঞ্চি থেকে উঠে মাথা নুইয়ে দুহাতে দাড়ি চোমরাতে চোমরাতে ও সারা ঘর পায়চারি করতে লাগলো ! 'সত্যিই তা পারি না !' একটু বিরতির পর বিব্রত ভঙ্গিতে সাশা আমার সামনে এসে দাড়ালো। 'আচ্ছা ম্যাক্সিম, তুমি ওকে একবার বুঝিয়ে বলতে পারো না ?'

'কি বলবো ?'

'যা সত্যি তাই বলবে। বলবে ওকে নিয়ে আমি সংসার পাততে পারি না। কিংবা অন্য কিছুও বলতে পারো—বলতে পারো আমার কোনো খারাপ অসুখ আছে।'

আমি হেসে ফেললাম। 'কিন্তু সেটা তো সত্যি নয় ?'

'নয়, কিন্তু ওজর হিসেবে এটা খুবই ভালো। চুলোয় যাগ্‌গে, যত্তোসব গোলমেলে··· তাছাড়া এ দুনিয়ায় আমি বউ নিয়ে করবোটা কি বলো ?'

হতাশ হয়ে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে ও হাত ছুঁড়লো যে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো ওর বউয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ এমন হাস্যকর ভঙ্গিতে কাহিনীটা বলে গেলো যে তার নাটকীয় পরিণতিটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুললো—মেয়েটার এখন কি হবে ! আর কনভালভ আপন মনে পায়চারি করতে করতে যেন স্বাগত স্বরেই বলে চললো, 'তার ওপর ওকে আমি একটুও পছন্দ করি না। ও আমাকে একটা এঁদো ডোবায় টেনে নামাতে চাচ্ছে, ধরেই নিয়েছে আমি ওর ভাতার। বোকা আর কাকে বলে ! যেমন বোকা, তেমনি লাজুক।' সন্দেহ নেই, ভবঘুরে মনোবৃত্তি, স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ বিপন্ন হবার আশঙ্কায় কনভালভ মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'আমিও বাবা গভীর জলের মাছ, অতো সহজে ওর জালে ধরা দিচ্ছি না !'

পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ ঘরের মাঝখানে ও স্থির হয়ে দাঁড়ালো, দুঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো মৃদু হাসির রেখা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাবটা পড়ার চেষ্টা করতে যাবো, এমন সময় সাশা বলে উঠলো, 'চলো ম্যাক্সিম, আমরা বরং কুবানে পালিয়ে যাই !'

এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ওর সম্পর্কে আমার কয়েকটা পরিকল্পনা ছিলো। ভেবেছিলাম ওকে লিখতে পড়তে শেখাবো, যতটা সম্ভব আমার অর্জিত জ্ঞান ওকে দিয়ে যেতে পারবো। তাছাড়া কথা ছিলো গ্রীষ্মকালটা পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো, এতে আমারও পড়াশোনার কিছুটা সুবিধে হবে, আর এখন ও কিনা···খুবই দমে গেলাম। 'এ তুমি কি যাতা বলছো, কনভালভ ?'

'তাহলে আমি কি করবো বলো ?' ও প্রায় খেঁকিয়েই উঠলো।

আমি ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম কাপিতোলিনার অভিপ্রায় যতটা ও সাংঘাতিক বলে মনে ভাবছে ততটা নয়, বরং একটু অপেক্ষা করে দেখাই যাক না শেষ

পর্যন্ত কি ঘটে।

উনুনের সামনে জানলার দিকে পেছন ফিরে আমরা মেঝের ওপর বসে ছিলাম। তখন প্রায় মাঝ রাত, কেননা কনভালভ ফিরে আসার পরেও ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে। হঠাৎ জানলার সার্সি ভাঙার শব্দে আমরা চমকে উঠলাম এবং পরক্ষণেই বেশ বড় আকারের একটা পাথর কাঁচের সার্সি ভেদ করে এসে আছড়ে পড়লো ঘরের মেঝেতে। দুজনেই ভয়ে লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে ছুটে গেলাম।

'যাঃ, ফসকে গেলো!' মেয়েলি গলায় নাকী সুরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো। 'ইশ্, আর একটু যদি...'

'ঠিক আছে, এখন চলে এসো,' শোনো গেলো ভরাট গলার গর্জন। 'পরে ওকে দেখে নেবো।'

ভাঙা সার্সির মধ্যে দিয়ে ভেসে এলো উন্মত্ত হাসির স্খলিত তরঙ্গ, এমনই তীক্ষ্ণ আর চড়া যে বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

কনভালভ বিমর্ষ চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'নিশ্চই ওর কাণ্ড।'

জানলার ভাঙা ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে ঝোলানো দুটো পা ছাড়া আমি কিন্তু আর কিছুই দেখতে পেলাম না। পাদুটা এদিক ওদিক দুলছে, ইঁটের দেওয়ালে গোড়ালি ঠুকছে, যেন পা রাখার মতো একটা জায়গা খুঁজছে।

ভরাট সেই পুরুষ কণ্ঠস্বর এবার বিড়বিড় করে বললো, 'চলো এসো, চলে এসো বলছি।'

'যাবো যাবো, দাঁড়াও...এত জোরে টেনো না! আমার কথাগুলো আগে শেষ করতে দাও। বিদায় সাশা, বিদায়...'

এর পরে যা ঘটলো বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কাপিতোলিনাকে ভালো করে দেখবো বলে আমি জানলার আরও কাছে সরে এলাম। দেখলাম ঝুঁকে ভাঙা সার্সির মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে ও ভেতরে উঁকি মারার চেষ্টা করছে। মাথার সাদা শালটা খসে গেছে, এলো-মেলো খোলা চুলগুলো বুকের ওপর আর কাঁধের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে, গলার কাছ থেকে জামাটা ফালফাল হয়ে ছিঁড়ে গেছে। কাপিতোলিনা তখন পুরো মাত্রায় মাতাল, টলছে, হিক্কার তুলছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে, গাল পাড়ছে, ফুলো ফুলো মুখটা চোখের জলে ভিজে গেছে।

লম্বা-চওড়া চেহারার একজন লোক ওকে পেছন থেকে টেনে আনার চেষ্টা করছে। এবার মরিয়া হয়ে সে হুঙ্কার ছাড়লো, 'আঃ, চলে এসো বলছি।'

'সাশা, তুই...তুই একটা শয়তান। মনে রাখিস তুই আমাকে ধ্বংস করেছিস। ভগবান তোকে শাস্তি দেবেন! আমি তোর ওপর নির্ভর করেছিলাম, তুই আমার মুখে থুতু দিয়েছিস। ঠিক আছে, আমি এর প্রতিশোধ নেবো। আমার কাছ থেকে লুকিয়ে কোথায় পালাবি? লজ্জা করে না তোর, শুয়োর-মুখো দৈত্য কোথাকার...'

জানলার সামনে বেঞ্চি থেকে কনভালভ ধরা ধরা গলায় কোনো রকমে বললো, 'আমি কারুর কাছ থেকে পালাই না, পালাচ্ছিও না। আর তোমারও কারুর সম্পর্কে এভাবে বলা উচিত নয়। আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, ভেবেছিলাম এতে বোধহয়

তোমার ভালো হবে, কিন্তু তুমিই সব মাটি করে দিলে।'

'সাশা ! তুই···তুই আমাকে খুন করতে পারিস ?'

'মাতাল হলে কেন ? আগামীকাল কি হবে না হবে কেউ কিছু বোলতে পারে না ?"

'তুই···তুই আমাকে ডুবিয়েছিস !'

পুরুষ কণ্ঠে শোনা গেলো, 'নেমে পড়ো। চলে এসো বলছি।'

'হতভাগা নচ্ছার কোথাকার ! কেন তুই নিজেকে ভদ্র বলে পরিচয় দিয়েছিলিস ?'

'অ্যাই, এত গোলমাল কিসের ? এখানে তোমরা কি করছো ?' নৈশ প্রহরীর রুক্ষ-কণ্ঠস্বর এবং বাঁশির শব্দে চকিতে সমস্ত নির্জনতা খান খান হয়ে গেলো।

পরমুহূর্তেই শোনো গেলো ককিয়ে ও কাপার আর্দ্র কণ্ঠস্বর, 'শয়তান, তোকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম আর তুই কিনা শেষে···'

হঠাৎ কে যেন ওকে টানতে টানতে অন্ধকারে নিয়ে গেলো, তারপরেই শোনা গেলো চাপা গর্জন আর হুটোপুটির শব্দ।

'না না, আমাকে থানায় নিয়ে যেও না···সা-শা-আ-আ !' পাথর-বাঁধানো পথে ভারি বুটের আওয়াজ, বাঁশির শব্দ, আর কাপার বুক-ফাটা করুণ ক্রন্দন। 'সা-শা-আ-আ আমাকে বাঁ-চা-ও-ও !'

মনে হলো ওর ওপর কে যেন নৃশংস অত্যাচার করছে, তারপর সমস্ত রলোরোল বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নের মতো ধীরে ধীরে রাতের অতল অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

জানলার সার্সি ভাঙার শব্দ, কান্না, চিৎকার-চেঁচামেচি, নৈশ প্রহরীর গর্জন, বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ, আর্তনাদ—এ সব কিছুই এমন অসম্ভব দ্রুত ঘটে গেলো যে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যি, যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কেবলই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কনভালভ এতক্ষণ শান্ত অপলক চোখে জানলা দিয়ে বাইরের নির্জন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলো, এবার ছোট্ট করে শুধু বললো 'ব্যাস, খেল খতম !'

জানলার কপাটদুটো ধরে ও আবার সেই একই নিশ্চল ভঙ্গিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। দীর্ঘক্ষণ নিটোল নিস্তব্ধতার পর শোনা গেলো ওর ম্লান কণ্ঠস্বর, 'তাহলে মাতাল হয়ে ও আবার সেই পুলিসেরই হাতে ধরা পড়লো। হুম, তার মানে মনস্থির করতে ওর একটুও সময় লাগেনি।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও জানলার কাছ থেকে সরে এলো, ময়দার একটা বস্তার ওপর বসে দুহাতে মাথাটা চেপে রইলো। তারপর একসময়ে রুদ্ধস্বরে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আচ্ছা ম্যাক্সিম, কেন এমন হলো বলতে পারো ?'

আমি ওকে বললাম। বললাম যে প্রত্যেক মানুষেরই সবার আগে জানা উচিত সে কি চায়, এবং প্রতিটা পদক্ষেপ বাড়ানোর আগে তাকে ভাবতে হবে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে। চোখ কান খোলা রেখে কনভালভ এসব কিছুই করেনি, সুতরাং যা ঘটেছে তার জন্যে কনভালভই দায়ী। সত্যি বলতে কি এ ব্যাপারে আমি ওর ওপর বেদম চটে উঠেছিলাম। কেননা মাতাল সেই কণ্ঠস্বর 'চলে এসো' এবং কাপার করুণ আর্তনাদ এখনও আমার কানে বাজছে। তাই আমি বন্ধুর ওপর দাক্ষিণ্য দেখাবার কোনো চেষ্টাই করলাম না।

এতক্ষণ মাথা নিচু করে ও সব শুনছিলো, এবার শঙ্কাতুর দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকালো এবং আমার বলা শেষ হবার আগেই ও ফোঁস করে উঠলো, 'এটা কি-

রকম হলো। আমি কেমন করে জানবো যে কাপা এইসব কাণ্ড ঘটাবে?' আগে যদি জানতে পারতুম, তাহলে কি ওকে একা একা ছেড়ে দিতুম।'

ওর অনুশোচনা, ওর অপরাধ স্বীকারের মধ্যে এমন আন্তরিক, এমন শিশুসুলভ একটা অসহায়তা ছিলো যে ওর জন্যে সত্যিই আমার মায়া হলো এবং এমন রূঢ়ভাবে ওকে বলার জন্যে মনে মনে রীতিমতো অনুতপ্ত হলাম।

'হা ভগবান, কেন আমি ওকে মরতে এখানে আনতে গেলুম! ও এখন আমাকে কি ভাবছে!' যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে উঠলো সাশার কণ্ঠস্বর, পরমুহূর্তেই ও চকিতে লাফিয়ে উঠলো। 'না, থানায় গিয়ে আমি ওকে ছাড়িয়ে আনবো। দেখি কি করতে পারি··· এখানে আমি ছাড়া ওকে সাহায্য করার তো আর কেউ নেই! ম্যাক্সিম, এদিকের কাজটা তুমি একটু চালিয়ে নিও ভাই, আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো।'

ওর গর্বের বস্তু সেই পুরনো ছেঁড়া জুতোজোড়ার কথা ভুলে গিয়ে শুধু টুপিটাই মাথায় চড়িয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। আমি আমার হাতের কাজ গুছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোরে যখন ঘুম ভাঙলো, ঘরের সেই পরিচিত কোণটায় কনভালভকে দেখতে পেলাম না।

সাশা ফিরলো সেই সন্ধ্যেবেলায়, বিষণ্ণ গম্ভীর কপালে পড়েছে গভীর কয়েকটা বলিরেখা, নীল চোখের নিচে গাঢ় ছায়া। কোনো কথা না ও নিঃশব্দে খানিকক্ষণ আমার হাতের কাজ লক্ষ্য করলো, তারপর ঘরের সেই কোণটায় শুয়ে পড়লো।

আমি জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?'

'দেখা করার জন্যেই তো গিয়েছিলুম।'

'তারপর, কি হলে?'

'কিচ্ছু না।'

স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ওর কথা বলার ইচ্ছে নেই। তাই ওকে আর বিরক্ত করলাম না, নিশ্চিন্ত ছিলাম ওর এই মনোভাব কেটে যাবে। কিন্তু পরের দিন সামান্য দুচারটে কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথাই হয়নি। সারাক্ষণ কেবল চোখের পাতা নামিয়ে অছন্ন একটা মন নিয়ে মন্থর হাতে কাজ করে গেছে, যেন ওর বুকের ভেতরের সমস্ত আলো কে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যের পর সবে যখন শেষ দফার রুটি উনুনে চড়িয়েছি, পুড়ে যাবার ভয়ে শুয়ে পড়ারও কোনো উপায় নেই, কনভালভ হঠাৎ বললো, 'স্তেনকা থেকে কিছু পড়ে শোনাও তো।'

আমি ওকে স্তেনকার নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা থেকে পড়ে শোনাতে লাগলাম, কেননা জানতাম এই দুটো জায়গাতেই ও সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয়ে পড়ে। মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে ঝুলকালি-ভরা কড়িকাঠের দিকে ও অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। পড়া থামাবার পর কনভালভ ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ ফেরালো। 'তাহলে ওরা এইভাবে লোককে সরিয়ে দেয়। সত্যি, আজকালকার দিনে এমন অনেক লোক আছে, বাইরে থেকে যাদের দেখলে মনে হবে খুব নিরীহ, অথচ ভেতরে ভেতরে কেউই এদের বুঝতে পারে না, কেউ তাদের সাহায্য করে না, সারা জীবন এরা একা একাই সংগ্রাম করে।'

ঝোপ বুঝে হঠাৎ জিগেস করলাম, 'কাপিতোলিনার খবর কি ?'

'কে ? কাপা ?' হাত নাড়ার ভঙ্গিতে ও বুঝিয়ে দিলো, 'সব শেষ।'

'তাহলে সব সম্পর্ক মিটিয়ে দিলে ?'

'মিটিয়ে আমি দিইনি, দিয়েছে ও-ই।'

'কেমন করে ?'

'খুব সহজেই। ও ওর লক্ষ্য থেকে এক পাও সরেনি। ফলে যেখান থেকে এসেছিলো আবার সেখানেই ফিরে গ্যাছে। শুধু আগে মদ খেতো না, এখন থেকে খেতে শুরু করেছে। নাও, বুটিটা এবার বার করে নাও, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

বুটি কটা তাকের ওপর গুছিয়ে রেখে আমিও শুয়ে পড়লাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। চোখ বুজিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। মাঝে মাঝে জানলার বাইরে নৈশপ্রহরীর হাঁক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম কনভালভ নিঃশব্দে উঠে কাস্তোমোরভের বইটা খুলে খুব গম্ভীর মুখে ছাপা হরফগুলোর ওপর আঙুল বোলাচ্ছে আর পাতা উলটাতে উলটাতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। মনে হলো তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ও কি যেন একটা খুঁজছে, এমন অদ্ভুত দৃষ্টি আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি।

কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার কনভালভ, ওখানে কি করছো ?'

'এ্যাঁ, এখনো জেগে আছো ? আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছো।' বইটা হাতে নিয়ে ও আমার পাশে এসে বসলো। 'শোনো ম্যাক্সিম, কয়েকদিন ধরেই ভেবেছি তোমাকে একটা কথা জিগেস করবো। আচ্ছা, জীবনের নিয়মকানুন···মানে, কি করা অন্যায়, কোনটে ঠিক এসব শেখার কোনো বই নেই ? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। আসলে আমি যা করেছি তাতে বড্ড বিব্রত হয়ে পড়েছি। শুরুটা ভালো হলেও শেষটা মোটেই ভালো হচ্ছে না। এই কাপার কথাই ধরো না কেন···'গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও করুণ মিনতি করলো, 'দোহাই ম্যাক্সিম, এ রকম একটা বই খুঁজে আমাকে পড়ে শোনাও।'

ঠিক তখনই কোনো জবাব দিতে পারলাম না। নিটোল কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলো।

'ম্যাক্সিম ?'

'বলো ?'

'সেদিন কাপা আমাকে যেসব কথা বোলেছিলো···'

'তাতে কি হয়েছে ? ভুলে যাও কনভালভ।'

'হ্যাঁ, তাতে অবশ্য কিছুই এসে যায় না। কিন্তু তোমার কি মনে হয় এসব কথা বলার ওর কোনো অধিকার ছিলো ?'

প্রশ্নটা খুবই জটিল, তবু একটু চিন্তা করে বললাম, 'হয়তো ছিলো।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

বিমর্ষ ভঙ্গিতে কথাটা বলে ও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো।

অবশেষে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরে যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম ও বেরিয়ে

গেছে। ফিরলো সেই সন্ধোবেলায়। সর্বাঙ্গ ধুলোয় ঢাকা, উদ্ভ্রান্ত দুচোখে একটা কঠিন অভিব্যক্তি। টুপিটা তাকের ওপর ছুড়ে দিয়ে আমার পাশে এসে বসলো।

'কি ব্যাপার, কোথায় গিয়েছিলে?'

'কাপাকে দেখতে।'

'তারপর?'

'তখন যা জেনেছিলুম, তাই—সব শেষ!'

'ওর মতো মেয়েকে নিয়ে সত্যিই কিছু করার নেই।' আসলে আমি ওকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করলাম এবং আপাতত ওর এই বিধ্বস্ত মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় এমন সব ভালো ভালো কথা বললাম। আমার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কনভালভ নত চোখে চুপচাপ বসে রইলো।

'না, ম্যাক্সিম, না আমার মনে হয় গোড়াতেই তুমি ভুল করছো। আসলে আমি হলুম একটা বিচ্ছিরি রোগের মতন—খালি বিষ ছড়াই। যে-কেউ আমার কাছে আসে, অমনি অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুখ্যু ছাড়া এ পৃথিবীতে কারুর জন্যে আমি কিচ্ছু আনতে পারি না। জীবনে কতো লোককে জানি, অথচ কাউকেই সুখী করতে পারিনি। কাউকে না। আমার মধ্যে নিশ্চই খারাপ একটা কিছু আছে।'

'বাজে কথা।'

'বাজে নয়, এইটেই ঠিক।'

আমি যত প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম এটা ঠিক নয়, ও ততই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে এইটেই প্রমাণ-করতে চাইলো যে এ পৃথিবীতে সে-ই বাসের উপযুক্ত নয়।

গত কয়েকদিনে কনভালভের মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। প্রায় সম্পূর্ণ নির্বাক, নিশ্চুপ, বইয়ের ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই, আগের মতো উদ্দীপনা নিয়ে আর কাজ করে না। অবসর সময়ে মেঝের ওপর শুয়ে একদৃষ্টে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখে শিশুর মতো সেই উজ্জ্বল দীপ্তিও আর নেই।

আমি জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার, সাশা?'

'শিগগিরই আমার ভদকায় মজে যাবার পালা শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে। বুকের ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গ্যাছে। কাপা এখানে না এলে বোধহয় আরো কিছুদিন নিজেকে সামলেসুমলে রাখতে পারতুম। হ্যাঁ ঠিক তাই। ভাবলুম আমি একজনের উপোকার করছি, আর হলো ঠিক তার উলটো। আসলে কি করে লোকের উপকার করতে হয় তার নিয়মটা জানা দরকার, যাতে ওরা পরস্পরকে বুঝতে পারে। নইলে এত বড়ো পিথিবীতে একজন আর একজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচবে কেমন করে। সবার তো আর জীবনকে সুশৃঙ্খলধারায় বয়ে নিয়ে যাবার মতো বুদ্ধি নেই…'

জীবনকে সুশৃঙ্খলধারায় বয়ে নিয়ে যাবার চিন্তায় ও এমনই মগ্ন যে আমার কোনো কথাই ওর কানে ঢুকলো না। আসলে দেখলাম ও আমাকে কেমন যেন এড়িয়ে চলতে চাইছে। জীবনের পুনর্গঠন সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ মতামত শোনার আগেই ও তেলে-বেগুনে

জ্বলে উঠলো। 'থামো থামো, এসব কথা আমি ঢের শুনিছি। এর জন্যে জীবনকে দোষ দেয়া যায় না, দোষ জনগণের। জনগণই হলো আসল ব্যাপার, বুঝলে ? তুমি যা বলছো তাতে অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জনগন যেখানে ছিলো সেখানেই তাকে থাকতে হবে। সবার আগে জনগণকে পরিবর্তন করতে হবে, তাকে দেখাতে হবে কোথায় কি ভাবে কাজ করতে হয়, তবেই এই জটিল অবস্থার পরিবর্তন হবে। তখন আর কেউ কারুর পথ আগলে থাকবে না। জনগণের জন্যে এই কাজটাই আমাদের করতে হবে—ওদের ঠিক পথে যাবার শিক্ষা দিতে হবে।'

আপত্তি জানালেই হয় ও রেগে ওঠে, নয় তো বিমর্ষ হয়ে যায়। 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও তো বাপু।'

একবার সন্ধ্যেবেলায় ও বেরিয়ে গেলো, সেদিন রাত্তিরে বা পরের দিনেও কাজে ফিরে এলো না। ওর পরিবর্তে মনিব এলো, রীতিমতো উদ্বিগ্ন। 'সাশা মাতাল হয়ে 'দেওয়াল' ভাটিখানায় বসে রয়েছে। আমাদের অন্যকোনো কারিগর যোগাড় করতে হবে।'

'হয়তো ও শিগগিরই আবার কাজে ফিরে আসবে।'

'কোনো সম্ভাবনা নেই আমি তো ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি।'

মনিব ফিরে যাবার পর দেওয়াল'এ এসে হাজির হলাম। পাথরের দেওয়ালে নানান শিল্পিক কারুকার্যের জন্যে পানশালাটার এই নাম দেওয়া হয়েছে। এর সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য কোথায় কোনো জানলা নেই, ছাদের ঘুলঘুলি থেকে আলো আসে। আসলে পানশালা না বলে এটাকে মাটির নিচে ছোট একটা খুপরি বলাই ভালো। বদ্ধ বাতাসে থমথম করছে নানা ধরনের মদ আর ভদকার গন্ধ। সবসময়ে সন্দেহজনক মানুষের ভিড়ে ঠাসা। দিনের পর দিন ওরা এখানে টেবিল আঁকড়ে পড়ে থাকে আর এমন কোনো শ্রমিক-মজুরের জন্যে প্রতীক্ষা করে, যে মদ খেয়ে ফতুর হয়ে যাচ্ছে আর যার টাকায় ওরাও মদ খেতে পারবে।

কনভালভ বসে রয়েছে পানশালার মাঝখানে, আর ওর বড় টেবিলটা ঘিরে বসে রয়েছে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা আরও ছজন লোক। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন হোফম্যানের কাহিনী থেকে উঠে-আসা সব বিভিন্ন চরিত্র। ভদকা আর বিয়ারের বোতল আঁকড়ে ভ্রূ কুঁচকে তারা কনভালভের কথা মন দিয়ে শুনছে। 'চালাও দোস্ত, প্রাণভরে চালাও ! আমার যা টাকা আছে এখনো তিনদিন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ভদকা খেয়ে সব উড়িয়ে দোবো, তারপর সোজা নরকে চলে যাবো ! আমি আর এখানে কাজই করবো না…'

জন ফালস্তাফের মতো দেখতে কে যেন বললো, 'শহরটা একদম বিচ্ছিরি।'

'কাজ ? কাজ করার জন্যে কেউ আবার জন্মায় নাকি ?'

'ঠিক বলেছো দোস্ত !'

সবাই একসঙ্গে হৈ চৈ করে কনভালভকে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে পান করার পূর্ণ অধিকার ওর আছে এবং যেহেতু তাদের সবার সঙ্গে ও পান করছে, পান করে ধন্য ওকে হতেই হবে।

'আরে, ম্যাক্সিম যে ! কি সৌভাগ্য আমার। বইয়ের পোকা ভণ্ডো কোথাকার—এসো এসো !' আমাকে দেখে ও যেন খুশিতে চলকে উঠলো। 'হোয়ে যাক এক হাত ! আমি তো চিরকালের জন্যে এই নরকে সোজা পালিয়ে এসেছি। চুলের গোড়া পর্যন্ত ভিজে না ওঠা অব্দি আমি আর ছাড়ছি না। সোজা এসে আমাদের পাশে বসে পড়ো।'

ও তখনও সম্পূর্ণ মাতাল হয়নি। উত্তেজনায় ওর নীল চোখদুটো চকচক করছে, রেশমের মতো মসৃণ দাড়িগুলো হাতের ছোঁয়ায় মৃদু মন্দ কাঁপছে। ওর কামিজের গলাবন্ধনীটা খোলা, শুভ্র কপালে টলটল করছে মুক্তোর মতো গুড়িগুড়ি ঘাম। প্রকম্পিত হাতে এক গেলাস বিয়ার ও এগিয়ে দিলো আমার দিকে।

আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। 'এসব থাক সাশা, চলো আমরা বাইরে যাই।'

'থাকবে ?' কনভালভ হো হো করে হেসে উঠলো। 'বছর দশেক আগে বললে না হয় একবার চেষ্টা করে দেখতুম কিন্তু আজ আর নয়। এ ছাড়া আর কি করার আছে বলো ? সবকিছু, এমন কি প্রতিটা তুচ্ছোত্তম ব্যাপারও আমার অজানা নয়, কেবল একটা জিনিসই যা জানি না—কি আমার করা উচিত। তাই পড়ে পড়ে মদ গিলছি, এ ছাড়া আমার আর কিচ্ছু করার নেই। নাও ধরো।'

তীব্র অসন্তোষ ভরা ছজোড়া চোখ আমার আগা-পাশতলা জরিপ করছিলো আর মনে মনে ভয় পাচ্ছিলো পাছে আমি কনভালভকে ওদের কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাই। সম্ভবত কিছু আঁচ করতে পেরে কনভালভ আমার পরিচয় করিয়ে দিলো, 'বন্ধুগণ, এই হচ্ছে আমার সেই শিক্ষিত বন্ধু, ম্যাক্সিম। আচ্ছা ম্যাক্সিম, তুমি এখানে স্তেনকা থেকে খানিকটা পড়ে শোনাতে পারো না ? উঃ, সে কি করুণ বই ভাই…রক্তো, ঘাম আর চোখের জল। পিলা হচ্ছি আমি নিজে, তাই কিনা বলো ম্যাক্সিম ?'

ওর সঙ্গীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার জন্যে খানিকটা জায়গা করে দিলো, আমি কনভালভের পাশে এসে বসলাম। ও নিজের জন্যে একটা গেলাসে অর্ধেক বিয়ার অর্ধেক ভজকায় ভরে নিলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর মতলব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে মাতাল করে তোলা।

'বুঝলে ভায়া, আমি হোচ্ছি একটা মৃত আত্মা। আমার মা কেন যে আমকে দুনিয়ায় এনেছিলো, কেউ জানে না। কেবল অন্ধকার আর ভিড় ! যদি আমার সঙ্গে পান কোরতে না চাও তো সোজা কেটে পড়ো দোস্ত, বিদায়। আমি আর রুটির কারখানায় ফিরে যাচ্ছি না। কত্তার কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে, পারো তো নিয়ে এসো। মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবো। না, ওটা বরঞ্চ তুমিই নিয়ে নিও…বই কিনো। আর যদি না কেনো তো তুমি একটা শুয়োর। সোজা কেটে পড়ো, ভাগো হিয়াসে ?'

মাতাল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর দুচোখে ফুটে উঠলো তীব্র বিদ্বেষ। ওর সঙ্গী-সাথীরা আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবার আগে আমি নিজেই উঠে পড়লাম।

'এসো দোস্ত, সমস্ত বিপদ-আপদের গলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দাও।' প্রচণ্ড জোরে কনভালভও টেবিলের ওপর থাপ্পড় মারলো ; গেলাস-বোতলগুলো ঝনঝন শব্দে লাফিয়ে উঠলো আর মাতাল সঙ্গীদের সমবেত উৎকট উল্লাসে চমকে উঠলো স্তব্ধ বাতাস।

তেলের কুপি জ্বলা নোংরা গুমোট সমাধিগর্ভে বিষণ্ণ ছায়া আর ঘামে ভরা জীবন্ত

মানুষের মুখগুলোকে পেছনে ফেলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রির নির্জনতা ভেঙে শোনা গেলো কনভালভের মাতলামি আর বিষাদঘন করুণ একটা গানের সুর।

দুদিন পরে কনভালভ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সামাজিক মিথ্যাচার, কুটিল দ্বন্দ্ব আর ভণ্ডামি, এক কথায় যাকিছু মানুষের মন আর মননকে বিষাক্ত কলুষিত করে,—সেই অহেতুক অহমিকার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো, কেননা আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়ে উঠেছিলাম সেই সভ্য সমাজের বাইরে। ফলে সভ্যতার অপার দাক্ষিণ্যকে যেমন গ্রহণ করতে পারিনি, তেমনি তার জটিল জঘন্য পারিপার্শ্বিকতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট না করেও কোনো উপায় ছিল না।

একঘেয়ে বিষন্ন পল্লীজীবনের চাইতে শহরের ঘিঞ্জি বরং অনেক ভালো। নোংরা সত্ত্বেও সেখানকার জীবনযাত্রা অনেক সহজ আর আন্তরিক। অবশ্য সবচেয়ে ভালো একজোড়া শক্ত পায়ে জন্মভূমির ক্ষেতখামার বিস্তীর্ণ প্রান্তর পেরিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়া।

বছর পাঁচেক আগে এমনই একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সারাটা রাশিয়া পরিভ্রমণ করতে করতে শেষ একদিন ফিত্তদোসিয়াতে এসে পড়লাম। সেখানে বিরাট একটা বাঁধ নির্মানের কাজ চলছে, ভাবলাম এখানে কয়েকদিন থেকে গেলে হয়তো দু চার পয়সা রোজগার করতে পারবো।

একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে দিগন্তলীন নীলিম সমুদ্র। উপল-সংকুল সমগ্র সৈকত জুড়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে, পাথরের পর পাথর সাজিয়ে গাঁথা হচ্ছে, ঠেলাগাড়িতে করে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি আর লোহার বিম বয়ে আনা হচ্ছে, যন্ত্রের সাহায্যে সিমেণ্ট আর পাথর কুঁচি মিশিয়ে জমানোর কাজ চলছে, বিরাট বিরাট সব শালের গুঁড়ি পোঁতা হচ্ছে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড়ের একটা দিক আগেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কুলি-কামিনরা এখন রেললাইন পাতার জন্যে সড়ক তৈরি করছে। জোয়ারের প্রচণ্ড তোড় আটকাবার জন্যে ছফুট চওড়া ঢালায়ের কাজ জোর কদমে চলেছে। সূর্যের জ্বলন্ত উত্তাপ, ঘাম আর পাথুরে ধুলোর মধ্যে সবাই অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে।

পাথরের গায়ে গাঁইতির আওয়াজ, ঠেলাগাড়ির ক্যাঁচাকাঁচ শব্দ, পাথরকুঁচি আর সিমেণ্ট মেশাবার যন্ত্রের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, কাঠ কাটার শব্দ আর মানুষের নানান কণ্ঠস্বরে ভরে উঠছে বিক্ষুব্ধ বাতাস। সব মিলিয়ে ব্যস্ত-শ্রমের সে এক মুখর প্রতিচ্ছবি।

এক জায়গায় মজুররা বিরাট একটা পাথরকে গড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে, আর সবাই মিলে একসঙ্গে উৎকট চিৎকার করে উঠছে: 'এক, দুই—হেঁইও।'

ওদের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে পুরুষের একটা চড়া কণ্ঠস্বর:

আউর ঠেলো—হেঁইও,
জোরসে ঠেলো—হেঁইও,
এক, দুই—হেঁইও!

প্রায় সারাটা পাহাড় আর সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই কাজ করছে। আর ওদের মধ্যে যারা উপদর্শক, সাদা কোট পরে কাজের খবরদারি করছে, রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে তাদের পেতলের বোতামগুলো।

দূরে দিগন্তলনী শান্ত সমুদ্র, তার স্বচ্ছ ঢেউগুলো ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়ির বুকে। সূর্যের আলোয় এমন তিরতির করে কাঁপছে যেন গালিভারের ঠোঁটের সেই স্মিত হাসি, যে ইচ্ছে করলে একটি আঘাতেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে লিলিপুটদের এই সমবেত প্রয়াস।

কিন্তু সমুদ্র এখন শান্ত, যেন নিঃস্ব রিক্ত ক্ষুধার্ত, রক্ত আর ঘাম-ঝরানো এইসব ক্রীতদাস যাদের নিজেদের অসৎ অভিপ্রায় বলতে কিছু নেই, তাদের দিকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। আর মৃদু ঢেউগুলো যখন পাথরের বাঁধের গায়ে আছড়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন গ্রাম ঘরবাড়ি ছেড়ে-আসা আধ-পেটা এইসব ক্রীতদাসদের কাছে তার অতীত শোকগাথা গেয়ে শোনাচ্ছে।

শ্রমিকদের মধ্যে নানা ধরনের লোক রয়েছে—মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা, নীল খাটো কুর্তা আর আটসাঁট পাজামা-পরা বাদামী রঙের শীর্ণ চেহারার আনাতোলিয়ার তুর্কী। ওদের উৎচকিত কণ্ঠস্বর, ভিয়াতকার মন্থর টানাটান উচ্চারণ, ভলগা অঞ্চলের লোকেদের দ্রুত কাটাকাটা কণ্ঠস্বর আর উইক্রেনিয়ানদের নরম অথচ স্পষ্ট কথাবার্তার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

রাশিয়ায় তখন দুর্ভিক্ষ চলছে, আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সমস্ত অঞ্চল থেকে মানুষ ভিড় করেছে এখানে। কিন্তু এদের মধ্যে থেকে বেশভূষা, কথাবার্তায়, ক্ষুধার্ত অথচ স্বাধীনসত্তা ভবঘুরেদের খুব সহজেই চিনে নেওয়া যায়। জন্মভূমি থেকে নাড়ির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেও দেশকে তখনও তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি। ভিয়াতকা থেকে আগত ভবঘুরেরা উইক্রেনিয়ানদের সঙ্গে সহজেই মিশে গিয়ে ছোট ছোট দলে এখানে নিজেদের আস্তানা গড়ে তুলেছে। আমি যখন ওদের কাছে গেলাম, কপিকলের ওপর থেকে ঝুলনো একটা মোটা কাছি ধরে ওরা টানছে, আর ওদের সর্দার যখন হুকুম দিচ্ছে কাছিটা ওরা আগলা করে ছেড়ে দিচ্ছে। এমনি ভাবে ঝুলন্ত একমণি হাতুড়ির ঘায়ে বিরাট বিরাট মোটা সব শালের গুঁড়ি পোতা হচ্ছে।

'টেনে তোলো।'

সবাই এক সঙ্গে কাছিতে টান দিচ্ছে—'হেঁইও।'

'এবার ছাড়ো!' দাড়ি না কামানো বসন্তের দাগে ভরা মুখে সর্দার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'এই কালা, শুনতে পাস না নাকি?'

একজন মজুর হাসতে হাসতে জবাব দিলো, 'অতো জোরে চেঁচিও না মিত্রিচ, গলার শিরা ফেটে যাবে।'

কণ্ঠস্বরটা ভীষণ চেনা লাগলো। চওড়া কাঁধ, গোল মুখ, নীলচে চোখ লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হলো। কনভালভ নয় তো! কিন্তু কনভালভ তো বাঁ কপালে এমন গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিলো না, তাছাড়া কনভানভের এমন কোঁকড়ানো চুলও ছিলো না, ছিলো সুন্দর ঘন দাঁড়ি। আর এর তো দেখছি পরিষ্কার কামানো চিবুক,

উইক্রেনিয়ানদের মতো দুপাশে দীর্ঘ পাকানো গোঁফ। তবু আসার সঙ্গে এর কোথায় যেন আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে। ভাবলাম একে জিগেস করবো চাকরির জন্যে কোথায় আবেদন করা যায়, কিন্তু একটা গুঁড়ি পোঁতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম।

'ব্যাস, থাক।' সর্দার চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাছি ছেড়ে দিলো। লোকগুলো মাটিতে বসে পড়ে ঘাম মুছতে লাগলো, গভীর শ্বাস নিয়ে পিঠগুলো টানটান করে মেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ পশুর মতো চাপা গর্জনে বাতাস ভরিয়ে তুললো।

আমি চওড়া কাঁধ লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালাম। 'দোস্ত।'

লোকটা চকিতে ঘুরে আড় চোখে আমার দিকে তাকালো।

'কনভালভ।'

'আরে ম্যাক্সিম, তুমি। তাহলে দোস্ত তুমিও এই ভবঘুরেদের দলে যোগ দিলে? বেশ বেশ! তা কখন এলে? কোত্থেকে আসছো। নাঃ, তোমাতে আমাতে দেখছি তামাম দুনিয়াটাই টহল দিয়ে ফিরবো। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর থেকেই আমি পথে পথে ঘুরছি। কতো যে দেশ দেখলুম। সত্যি বিশ্বাস করো ভাই, তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি...সৈনদের মতন পোশাক, ছাত্রদের মতন মুখ। তারপর এ জায়গাটা তোমার লাগছে কেমন? তোমাকে চিনতে পারিনি বলে ভেবো না যেন আমি স্তেনকা, তারাস কিংবা পিলাকে ভুলে গেছি...সব্বার কথা আমার মনে আছে।'

বিশাল থাবায় সাশা সমানে আমার কাঁধদুটো চেপে ছিলো, আর ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কেবল মুচকি মুচকি হাসছিলাম। ওকে দেখে নিঃসীম খুশিতে আমি তখন মনে মনে চলকে উঠছিলাম। মনে পড়ে গেলো ভবঘুরে জীবনে আমার সেই প্রথম দিনগুলোর কথা আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার মধ্যে সেই শুরুর দিনগুলোই ছিলো নিঃসন্দেহে ভালো।

'তা না হয় হলো' কিন্তু তোমার কপালে এই গভীর ক্ষতচিহ্নটা এলো কোত্থেকে?'

'এটা? সে ভারি মজার ব্যাপার। আমি আর দুবন্ধু রুমানিয়ার সীমান্ত পেরুবো বলে বিসারাবিয়ার কাস্তল থেকে যাত্রা শুরু করলুম। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপিচুপি চলেছি, হঠাৎ শুনলুম—'অ্যায়' কোউন হ্যায়!' শুল্ক প্রহরীর গলা শুনে পিলে আমাদের চমকে গেলো। দৌড়ে পালাবার সময় একজন প্রহরীর বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি খেয়ে কপালের এই হাল হলো, সীমান্ত পেরুবার অভিযোগে আমার জেল হয়ে গেলো। কিসিনেভ জেলে থাকার সময়েই আমার টাইফয়েড হোলো, এমন কাবু করে ফেললো যে ভেবেছিলুম এ যাত্তারায় বুঝি আর টিঁকবো না। কিন্তু বাঁচালো একজন নার্স, মারিয়া পেত্রোভনা। ছোটো শিশুর মতো আমাকে এমন আদর-যত্ন করতো যে নিজেরই লজ্জা করতো। সে কথা বললেও কেবল মুচকি মুচকি হাসতো, মাঝে মাঝে আমাকে বই পড়ে শোনাতো। একদিন ও আমাকে ইংরেজ নাবিকের সম্পর্কে একটা বই পড়ে শোনালো, জাহাজ ডুবে যাওয়ায় যে নিখোজ একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে, ঘর সংসার পেতেছে। সে কি জীবন। দ্বীপ সুমুদ্দুর আকাশ আর পাখির মতন এক্কেবারে মুক্তো স্বাধীন জীবন। নাবিকটার সঙ্গে অবশ্য একটা বুনো জংলী ছিলো। আমি হলে জংলীটাকে শেষ করে দিতুম। কি হবে ওকে নিয়ে? একা একা থাকতেই আমার বেশি ভালো লাগে। বইটা

তুমি পোড়েছো নাকি ?'

'তার আগে বলো জেলখানা থেকে তুমি বেরুলে কি করে ?'

ছেড়ে দিলো। বিচারে ওরা আমাকে দোষী সাব্যস্তো করতে পারেনি। খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু শোনো, আজ আমি আর কাজ কোরবো না। এমনিতেই হাতে ফোসকা পোড়েছে, তার ওপর সকাল পর্যন্ত আমার তিন রুবল চোল্লিশ কোপেক পাওনা হয়ে গ্যাছে। খুব একটা মন্দ রোজগার নয়, কি বলো ? তুমি নিশ্চই আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটাচ্ছো ? আমরা কিন্তু ছাউনিতে থাকি না, এখান থেকে খুব কাছেই পাহাড়ের গায়ে একটা গর্তে বাস করি। আমার সঙ্গে আর একজন থাকে। সে অসুস্থ, জ্বর হয়েছে। দাঁড়াও, সদ্দারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

দ্রুত পায়ে ও চলে গেলো। ধুলোর মেঘের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমি ব্যস্ত-মুখর শ্রমিকদের কাজ দেখছি আর মাঝে মাঝে স্তব্ধ নীল গাঢ় সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছি।

একটু পরেই ভিড়ের মধ্যে কনভালভের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাটা চোখে পড়লো। বড় বড় পা ফেলে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও জটিল কোনো প্রহেলিকার জবাব যেন পেয়ে গেছে।

* * *

ঘণ্টা দুয়েক পরে আমি আর কনভালভ, দুজনে পাশাপাশি 'গর্ত'-এর মধ্যে শুয়ে রয়েছি। বহুকাল আগে পাহাড়ের গা থেকে বিরাট একটা চাঙড় খসে যাওয়ায় চৌকো মতন এই গুহাটার সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে জনা চারেক বেশ স্বচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। কিন্তু গুহার ভেতরটা এত নিচু যে মনে হয় যেকোনো মুহূর্তে চাঙড় খসে জীবন্ত সমাধি ঘটে যেতে পারে, তাছাড়া গুহার মুখটা এমনই নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

অসুস্থ লোকটা পোলতাভা থেকে আগত একজন উইক্রেনিয়ান ভবঘুরে। সে আমাদের এত কাছে শুয়ে রয়েছে যে যখনই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে তার দাঁতের ঠকঠকানি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর তখনই সে জীর্ণ ধূসর কোটটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে শোবার চেষ্টা করছে।

গুহামুখে চড়া রোদ এসে পড়ায় কনভালভ আমার সামরিক কোটটা নিয়ে তাঁবুর মতো খাটিয়ে দিলো। সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসছে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি। ডান দিকের তীর ঘেঁষে পাহাড়ের গায়ে শহরের সাদা সাদা বাড়িগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে, বাঁদিকে সীমাহীন নীলিম সমুদ্র। নানা রঙের বিচিত্র খেলা চলেছে সুদূর দিগন্তে, যেন চোখের সামনে অপার সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠছে যত মায়ামরীচিকা।

অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্মিত হাসিতে ভরে উঠলো কনভালভের সারা মুখ। 'সূর্য্য ডুবে যাবার পর আমরা আগুন জ্বালাবো, চা বানাবো। আমাদের কিছু রুটি আর মাংসও আছে।' পা দিয়ে পাদিয়ে একটা তরমুজ গড়িয়ে এনে কনভালভ পকেট থেকে ছুরি বার করে কাটতে শুরু করলো! 'যখনই আমি সুমুদ্দুরের

ধারে এসে দাঁড়াই, অবাক হয়ে ভাবি এখানে এতো কম লোক বাস করে কেন। এমন সুন্দর আর নির্জন জায়গাটা, আপন মনে ঘুরলে কি যে ভাবা যায়। হ্যাঁ, তারপর বলো, এ কটা বছর কি করলে?'

আমি ওকে বলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সুদূর সমুদ্রের বুক থেকে সোনালী লাল গোলাপী আর বেগুনে রঙে মেশা মেঘগুলো ধীরে ধীরে সূর্যের দিকে ভেসে আসতে শুরু করেছে। যেন সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা তুষারমৌলি পাহাড়গুলো সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসছে।

'মরতে কেন যে শহরে বাস করতে যাও ম্যাক্সিম, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না!' আমার সবকিছু শোনার পর কনভালভ স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করলো। আলো নেই বাতাস নেই, বদ্ধ জীবন। মানুষ? সে তো সব জায়গাতেই আছে। আর বই? ঢের পড়েছো। তাতেও যদি মন না সরে, একটা কি দুটো বই ঝোলায় পুরে সোজা বেরিয়ে পড়ো। আমার সঙ্গে তাসখন্দে যেতে চাও? সামারকন্দে কিংবা অন্য কোথাও? সেখানে কিছুদিন থেকে আবার আমুরের দিকে বেরিয়ে পড়বো। আমি ঠিক করেছি সব জায়গায় যাবো, সব সময়েই নতুন কিছু দেখবো। মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই! যতো এগিয়ে যাবো, চোখেমুখে এসে লাগবে নতুন বাতাস, মনের ময়লা সব সাফ হয়ে যাবে: কেউ তোমার ওপর সদ্দারি করবে না। পঞ্চাশ কোপেকেরও কোনো কাজ যদি জোগাড় করতে না পারি তো ভিক্ষে করবো···অন্তত দুনিয়ার নতুন কিছু তো দেখতে পাবো। কি, যাবে আমার সঙ্গে?'

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়েছে, আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে সমুদ্র আর আকাশ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস বইছে। এখানে ওখানে দু একটা তারা ফুটেছে! থেমে গেছে মুখর কর্মস্রোত, কেবল মাঝে মাঝে কোমল দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনা যাচ্ছে কাটাকাটা কণ্ঠস্বর আর হাওয়ায় ভেসে আসছে জল-ঢেউয়ের একটানা অস্ফুট ধ্বনি।

দেখতে দেখতে দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে এলো।

'আগুনের কি হলো?' এতক্ষণ পর শোনা গেলো অসুস্থ লোকটার খুকখুকে কাশি আর তার প্রকম্পিত কণ্ঠস্বর।

'দাঁড়াও, জ্বালছি।'

কাঠকুটো কয়লা সাজিয়ে কনভালভ আগুন জ্বাললো। সমুদ্র থেকে আসা হিমেল নৈশ বাতাস ভরে উঠলো ধোঁয়ায়, দেখতে দেখতে লাফিয়ে উঠলো আগুনের লেলিহান শিখা। সমুদ্রের ধ্বনিমা যত শান্ত হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে জীবন যেন ততই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মেঘগুলো উধাও হয়ে গেছে, গাঢ়-নীল অন্ধকারে টলটল করছে উজ্জ্বল নক্ষত্র! অপার মসৃণ সমুদ্রের বুকে কাঁপছে জেলে নৌকার আলো। আমাদের সামনে ফুটে উঠছে গনগনে আগুনের হলদে লাল ফুলকি। চায়ের কেটলি চাপিয়ে হাঁটুদুটো দুহাতে জড়িয়ে কনভালভ সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। উইক্রেনিয়ান ভবঘুরে বিরাট একটা গিরগিটির মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে আগুনের আরও কাছে।

'লোকে শহর গড়ে, বাড়ি বানায়, এক সঙ্গে গাদাগাদি করে ভিড় বাড়ায়...নরক

আর কাকে বলে! এই একটাই মাত্র জীবন আমরা বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাই...'

'হুম!' অসুস্থ লোকটা চোখ মিটমিট করে কনভালভের দিকে তাকালো। 'কিন্তু ধরো শীতকালে একটা ভেড়ার চামড়া আর গরম বাড়ি পাও, তখন মনে করবে তুমি প্রভুর মতো বাস কোরছো।'

'হ্যাঁ, শীতকালটাই বড়ো গোলমেলে। স্বীকার করতেই হবে ওই সময়ে শহরের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তার জন্যে এতো গাদাগাদি করার কি দরকার? সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়—শহর বা স্তেপা, কোনো জায়গাই মানুষ বাসের উপযুক্ত নয়। তবে এসব ব্যাপারে কিছু না ভাবাই ভালো, করা তো যাবে না কিছুই, মিছিমিছি মনটাই খারাপ হয়ে যাবে!'

আমার ধারণা গত কয়েক বছরের বাধা-বন্ধনহীন ভবঘুরে জীবন যেমন কনভালভের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, ভুলিয়ে দিয়েছে ওর হৃদয়ের গভীর বেদনা, তেমনি আবার কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে তুলেছে তীব্রভাবে। ওর শক্ত সামর্থ দেহ, আশ্চর্য সংবেদনশীল একটা মন চিন্তার বিষে, জীবনের প্রকৃত মর্মোদ্ধারে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কেননা মনের অজ্ঞতার জন্যে চিন্তার বোঝা যখন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, এ পৃথিবীতে তাদের চেয়ে অসুখী আর কেউ নেই! তাই আমি সমবেদনার চোখে ওর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম।

'হ্যাঁ, ম্যাক্সিম,' কনভালভ যেন আমার মনোভাবটা বুঝতে পারলো। 'আজ পর্যন্ত এতো ঘুরলুম অথচ এ দুনিয়ায় এমন একটা জায়গাও চোখে পড়লো না যেখানে আমি নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি।'

নিরাসক্ত গলায় অসুস্থ লোকটা জবাব দিলো 'যেখানেই যাও না কেন বাপু, ঘানি তোমাকে টানতেই হবে।'

'আমি স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারি না কেন, বলতে পারো?' কতো লোকেই তো স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছে, কাজকম্মো করছে, বউ ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করছে, পরস্পরের জন্যে-ভাবনা চিন্তা করছে। কিন্তু আমি পারছি না কেন?'

'জানি না', জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে উইক্রেনিয়ান আরও কুঁকড়ে গেলো। 'তবে সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করলেই সর্বকিছু জলের মতন সহজ হয়ে যায় না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

উদাস চোখে কনভালভ আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে রইলো! চারদিক অন্ধকারের ঘন আবরণে ঢেকে গেছে। আকাশে তখনও চাঁদ ওঠেনি। সর্বকিছু এমন গাঢ় আঁধারে মোড়া যে আমরা সমুদ্রকে দেখতে পাচ্চি না, কেবল সত্তায় অনুভব করতে পারছি তার উপস্থিতি। দেখতে দেখতে আগুন নিভে গেলো। কেবল রয়ে গেলো তার আরক্ত গাঢ় একটা দীপ্তি। প্রথম প্রথম যে কয়লাগুলো উজ্জল হয়ে জ্বলছিলো, তাও এক সময়ে ক্রমশ ছোট হতে হতে নিভে ছাই হয়ে গেলো। উষ্ণ উত্তাপ ছাড়া তার আর কোনো চিহ্নই রইলো না।

অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম—আমরা সবাই এ রকম, কেবল

মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠা !

উইক্রেনিয়ান বললো, ‘চলো, আমরা গুহার আরও ভেতরে যাই।

এর তিনদিন পরে আমি কনভালভের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। চললাম কুবানের দিকে, ও আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি। আবার দেখা হবে এই আশ্বাসে আমরা পরস্পরের কাজ থেকে বিদায় নিলাম।

এর পর ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি।

১৮৯৬

অকাল-বসন্ত

বিসর্পিল যে পথটা শহরের দিকে চলে গেছে, তার দুপাশে রয়েছে সারিসারি জীর্ণ কুটির, জানলাগুলো বাঁকা-চোরা, দেওয়ালগুলো থেবড়ে চেপে বসেছে পরস্পরের গায়ে। ফুটো ছাদগুলোর এখানে-ওখানে কাঠের পাতলা বাতা দিয়ে তাপ্পি গোঁজা, তার গায়ে শেওলা জমেছে। মাঝে মাঝে উইলো আর ঝাঁকড়া এল্ডার গাছের ছায়ায় বাঁশের লম্বা খুঁটির গায়ে পায়রার-খোপ বাঁধা। রাস্তার দুধারে ধুলোয়-ঢাকা ম্লান জানলার সার্সিগুলো যেন পরস্পরের দিকে ভীরু প্রবঞ্চকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বরাবর নেমে এসেছে কয়েকটা গভীর গিরিখাত। বর্ষায় পাহাড়ের গা-বেয়ে যখন ঢল নামে, বৃষ্টির জলে রাস্তাগুলো তখন থৈ থৈ করে। মাঝে মাঝে অবশ্য পাথর আর যত রাজ্যের জঞ্জাল ফেলে জলধারা আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বৃথাই সে প্রয়াস। তাতে বরং বর্ষায় পথটা আরও বেশি কাদায় প্যাচ প্যাচ করে। আর গ্রীষ্মকালে পথটা ভরে ওঠে এক হাঁটু ধুলোয়। দুপাশের জীর্ণ কুটিরগুলো তখন ধুলোয় এমনভাবে ঢেকে থাকে, মনে হয় পাহাড়ের মাথা থেকে বলিষ্ঠ হাতে কে যেন ওগুলোকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে জড়ো করেছে এক জায়গায়। আর রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে ওগুলো ঠিক তেমনিভাবে পাহাড়ের এক পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে চিরটা কাল।

অথচ পাহাড়ের মাথায় সবুজ গাছগাছালির ফাঁকে চোখে পড়ে বাগান-ঘেরা সুন্দর সুন্দর কয়েকটা পাথরের বাড়ি। গির্জার ঘণ্টাঘরগুলো সদর্পে মাথা তুলে রয়েছে নীলিম আকাশের গায়ে, সোনালী ক্রুশগুলো রোদে ঝিকমিক করছে।

রাস্তার সবচেয়ে শেষের দোতলা বাড়িটা বণিক পেতুনিকভের। বাড়িটা পাহাড়ের ঠিক নিচে, যেন ওটাকে শহর থেকে ঠেলে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে। তার ঠিক পেছনেই ফাঁকা মাঠ, মাইল আধেক ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়ে মিশেছে নদীর পারে। রাস্তার আশে পাশে জীর্ণ বাড়িগুলোর তুলনায় সাবেকি-আমলের এই প্রকাণ্ড পুরনো বাড়িটাকে কেমন যেন বিষণ্ণ আর নিঝুম মনে হয়। বাড়িটা একপাশে হেলে পড়েছে, দু-সারি জানলার একটাও সমান্তরাল রেখায় নেই। অধিকাংশ সার্সিই ভেঙে গেছে, যাও বা দু একটা অবশিষ্ট আছে বৃষ্টি-বাদলায় তাতে সবুজ রঙের ছোপ পড়েছে। চুণ-বালি-খসা, ফাটলওয়ালা, কালো কালো দাগেভরা দেওয়ালগুলো দেখলে মনে হয় সাঙ্কেতিক ভাষায় মহাকাল যেন তার গায়ে বাড়িটার ইতিহাস লিখে রেখেছে। টলমলে ছাদটার অবস্থাই সবচেয়ে করুণ। যেন নির্মম নিয়তির শেষ আঘাতটা কবে নেমে আসবে, তারই প্রতীক্ষায় মাটির দিকে মাথা নুইয়ে অপেক্ষা করছে।

চাওড়া ফটকটা হাট-হাট করে খোলা। তার একটা পাল্লা কব্জা থেকে খুলে মাটিতে পড়ে রয়েছে, ঘাস জন্মেছে গরাদের ফাঁকে ফাঁকে। প্রকাণ্ড নির্জন উঠোনটাও আগাছায় ভরে

গেছে। এই উঠোনেরই নিচে মাটির তলায় রয়েছে নিচু ছাদওয়ালা ধোঁয়ায়-জীর্ণ বিরাট একটা ঘর। আগে এটা ছিলো বণিক পেতুনিকভের কামারশালা, এখন অবসর-প্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ আরিসতিদ ফোমিচ কুভালদার ভাড়াটে-শোবার ঘর।

ঘরটা আটাশ ফুট চওড়া, বিয়াল্লিশ ফুট লম্বা। একদিকের দেওয়ালে ছোট ছোট চৌকো চারটে জানলা আর বড় একটা দরজা দিয়ে যক্ষপুরীর এই বিরাট গহ্বরের মধ্যে যা সামান্য একটু আলো আসে। ইঁট-বার-করা দেওয়ালগুলো আর নিচু ছাদটা ধোঁয়ার কালিঝুলিতে ভরা। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রাকাণ্ড একটা কামারের চুল্লি আর চারদিকের দেওয়ালে তেলচিটে-পড়া বালিশ-কম্বল বিছোনো চওড়া চওড়া কয়েকটা তাক। এখন এগুলো ভাড়াটে বাসিন্দাদের বিছনার কাজ করে। মেঝেটা স্যাঁতসেঁতে, সারা ঘরে ধোঁয়া আর নোংরা বিছনায় বিশ্রী দুর্গন্ধ। কর্তার শোবার জায়গা চুল্লির ওপরে, আর চুল্লির চারপাশের চওড়া তক্তাগুলোয় শোয় কর্তার যারা পেয়ারের লোক তারা।

সেনাধ্যক্ষের দিনের বেশিভাগ সময় কাটে ভাড়াটে-শোবার-ঘরের দরজার সামনের একটা ইঁটের বেঞ্চিতে বসে, নয়তো রাস্তার ওপারে ইগর ভাভিলভের সরাইখানায়। ওখানে উনি দুবেলার পান-আহার সারেন।

পেতুনিকভের ঘরটা ভাড়া নেবার আগে আরিসতিদ কুভালদা শহরে ঠিকেদারীর কাজ করতেন, সারা অফিস তখন গমগম করতো, তারও আগে ছিলো ছাপাখানা। ওঁর নিজের ভাষায়, 'হ্যাঁ, আগে আমি সিংহের মতো দাপটে বাস করতাম।'

লম্বা, চওড়া-কাঁধ, বছর পঞ্চাশ বয়েস, নোংরা ধূসর দাড়িতে-ঘেরা বসন্তের-দাগে-ভরা একটা মুখ, উচ্ছল আয়ত দুটো চোখ। মোটা গলায় গমগমে স্বরে কথা বলেন, আর প্রায় সব সময়েই দাঁতে চেপে রাখেন জার্মান চীনামাটির একটা বাঁকানো পাইপ। যখন রেগে যান বড় লালচে নাকটা ফুলে ওঠে, ঠোঁটদুটো কাঁপে আর তার ফাঁকে দেখা যায় নেকড়ের মতো দুসারি বড় বড় হলদে দাঁত। আজানু লম্বিত দুটো বাহু, পা দুখানা একটু বাঁকা। পরনে সৈনিকের ঢিলে কুর্তা, মাথায় লালফিতেওয়ালা কিমারহীন ময়লা টুপি, পায়ে জমানো-পশমের সছিদ্র বুট। বুট-জোড়াটা তাঁর প্রায় হাটুর কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়ার ফলে সকালের দিকে মাথাটা ভার হয়ে থাকে, আর সন্ধ্যের ঝোঁকে তা হয়ে ওঠে কেমন যেন নেশার মতো। কিন্তু উনি যত মদই টানুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে কখনও মাতাল হন না বা মনের ফূর্তি হারান না।

সন্ধ্যের দিকে ইঁটের বেঞ্চিটার ওপরে বসে বাঁকানো পাইপটা দাঁতে চেপে ভাড়াটেদের অভ্যর্থনা জানাতেন। 'তারপর, কি করা হয় শুনি?' মাতলামি বা বৈধ কোনো কারণে শহর থেকে বহিষ্কৃত ছোঁড়া পোশাক-পরা বিষন্ন বস্তুটিকে গুটিগুটি পায়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে উনি প্রশ্ন করতেন। এবং লোকটা যথারীতি জবাব দেবার পর উনি বলতেন, 'দেখি, তোমার কাগজ-পত্রে এই ধরনের মিথ্যেগুলোর কোনো সমর্থন আছে কিনা?' যদি সে-রকম কোনো কাগজ-পত্র থাকতো, বার করে ওঁর হাতে দেওয়া হতো। সেনাধ্যক্ষ খুব সতর্ক ভঙ্গিতে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরতেন, কিন্তু তাতে কি লেখা আছে কোনোদিনই মন দিয়ে পড়তেন না। 'ঠিক আছে, এক রাত্তিরের জন্যে দু কোপেক। সপ্তায় দশ কোপেক, এক মাসের জন্যে ত্রিশ কোপেক। যাও, ভেতরে গিয়ে

একটা জায়গা খুঁজে নাও। দেখো, জায়গাটা যেন আবার অন্য কারুর না হয়, তাহলে কিন্তু মার খাবে। আমার এখানে যারা থাকে তা া খুব হুঁসিয়ার।'

'আপনার এখানে চা, রুটি বা অন্য খাবার কিছু পাওয়া যায় না?'

'না, আমার এই গর্তে শুধু শোবার জায়গা পাওয়া যায়, যার জন্যে আমাকে ওই জোচ্চোর মালিক পেতুনিকভকে ফি মাসে পাঁচ রুবল করে ভাড়া দিতে হয়।' পাকা ব্যাবসাদারের মতো কুভালদা তখন সমস্ত ব্যাপারটা বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। 'আসলে আমার এখানে যারা বাস করে তারা সবাই গরীব, তোমার মতো গাণ্ডেপিণ্ডে গেলার স্বভাব কারুর নেই। তবু তোমার যদি প্রয়োজন থাকে, সামনেই সরাইখানা আছে. স্বচ্ছন্দে সেখানে চলে যেতে পারো।'

কৃত্রিম কঠোরতার সঙ্গে কথাগুলো বলা হলেও, আগন্তুককে তা কিন্তু কখনই হতোদ্যম করে তুলতো না। বরং ওঁর হাসি-হাসি চোখের চাউনি, ওঁর সরল মুখের ভঙ্গি শহরের ঢের ঢের পাজী-বদমাসগুলোর তুলনায় অনেক বেশি আন্তরিকই মনে হতো। কখনও কখনও হয়তো ওঁর আগের ভাড়াটেদের কেউ এসে বলতো, 'শুভদিন, কর্তা। কেমন আছেন?'

'এই বেঁচে-বর্তে আছি। তারপর?'

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'তোমাকে? কই. না তো।'

'মনে পড়ছে না? গত শীতে প্রায় মাসখানেক আমি এখানে বাস করেছিলুম. যখন পুলিস এসে তিনজন লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো।'

'আরে পুলিস তো আমার এই অতিথিশালায় হামেশাই হানা দেয়।'

'কিন্তু যেবার আপনি দারোগাসাহেবকে লেজেহাল করে ছাড়লেন…'

'তোমার আসল মতলবটা কি, এবার তাই বলো তো শুনি?'

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, কর্তা? কিন্তু সেবার…'

'আরে, না না…কৃতজ্ঞতাকে স্বীকার সব সময়েই করতে হবে, কেননা পৃথিবীতে ওই একটিই মাত্র জিনিস যা দুর্লভ। যদিও তোমাকে আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি না, তবে তুমি যে লোক ভালো. সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চলো হে, তোমার জীবনে সাফল্যের জন্যে এক সাথে পান করা যাক।'

'নাঃ, আপনি ঠিক একই রকম রয়ে গ্যাছেন দেখছি!'

'তোমাদের মতো গেঁয়ো ভূতগুলোকে নিয়ে এর চেয়ে আর ভালো থাকবো কি করে বলো?'

তারপর দুজনে হাসতে হাসতে গিয়ে ঢুকতো পানশালায়। পরের দিন ওরা আবার যেতো। এইভাবে কয়েকদিন চলার পর একদিন দেখা যেতো সেনাধ্যক্ষের সঙ্গীর পকেটে যেকটা টাকা ছিলো সব মদের পেছনেই খরচা হয়ে গেছে।

'সত্যি কর্তা, পকেটে আর একটাও পয়সা নেই। এখন কি হবে?'

'যদিও ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক নয়, তবু এই রকম কোনো পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে কারুর অসন্তুষ্ট হওয়াও উচিত নয়।' সঙ্গীর বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে কুভালদা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন। 'আসল কথাটা কি জানো, ভাবালুতায় নিজের

জীবনকে নষ্ট না করে, এইসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। আর মদের নেশায় ভাবালুতা হচ্ছে সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতা। মদের নেশায় মাথা ধরলে চাই আরও ভদকা। তখন রাগে বা দুঃখে দাঁত কিড় কিড় করলে, দাঁতগুলোরই ভেঙে যাবার সম্ভবনা থাকে সবচেয়ে বেশি···তখন প্রয়োজন হলে পরে আর কাউকে কামড়াতে পারবে না। এই নাও কুড়ি কোপেক। যাও, এক বোতল ভদকা, পাঁচ কোপেক মাংসের গরম ছাঁট, এক পাউণ্ড রুটি আর দুটো শশা কিনে নিয়ে এসো। নেশার ঝোঁকটা কেটে গেলে পরে আলোচনা করা যাবে আমাদের কি করা উচিত।'

স্বভাবতই এই আলোচনা চলতো দুতিন দিন ধরে এবং শেষ হতো যখন সেনাধ্যক্ষের পকেটে আর একটিও পয়সা অবশিষ্ট থাকতো না। তখন উনি সরাসরিই তাঁর সঙ্গীকে উপদেশ দিতেন, 'শোন বাপু, শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত তোমার সঙ্গে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছি, এবার আমাদের পুণ্য ও সংযমের পথে ফিরে যেতে হবে। একথাটা তো সত্যি—তুমি যদি পাপ না করো, তাহলে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে না। কিন্তু এ কথাটাও তো মিথ্যে নয় যে তুমি যদি অনুতাপ না করো, তাহলে তোমার মুক্তি নেই। আমরা প্রথমটা করেছি, অনুতাপ করাটাও এখন অর্থহীন। সুতরাং মুক্তির সহজ উপায় হচ্ছে—যাও, সোজা গিয়ে নদীতে দাঁড় টানো। যদি মনে করো নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে পারছো না, ঠিকেদারকে বোলো তোমার টাকাগুলো রেখে দিতে, আর তা না হলে আমাকেও দিতে পারো। যখন যথেষ্ট মূলধন জমবে, তা দিয়ে তোমাকে একজোড়া পা-জামা আর অন্যান্য জিনিসপত্তর কিনে দেবো, যাতে তোমাকে ভাগ্য-বিড়ম্বিত অথচ সভ্যভব্য একজন কঠোর পরিশ্রমী মানুষের মতো দেখায়। সেই পা-জামা পরে তোমাকে বেশ ভালোই দেখাবে, আর তা পরে তুমি অনেক দূরও যেতে পারবে। নাও, এখন সোজা এখান থেকে কেটে পড়ো তো!'

সেনাধ্যক্ষের কথায় সঙ্গীটি তখন খোশ-মেজাজে নৌকায় দাঁড়ির কাজ করতে চলে যেতো। সেনাধ্যক্ষের কথাগুলো যে ও সম্পূর্ণ বুঝতে পারতো তা নয়, কিন্তু স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারতো হাস্যোচ্ছল দুটো চোখ, আর উৎসাহ-সঞ্চারিত একটা প্রভাব। ও জানতো অভাবের সময় হাত পাতলে সেনাধ্যক্ষ কখনই তাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটতোও। তাই মাসখানেক কি মাস দুয়েক এইভাবে কঠিণ পরিশ্রম করার পর, সেনাধ্যক্ষের কঠোর তত্ত্বাবধানে ও নিজেকে একটু উন্নত করতে পারতো। আর কুভালদা তখন ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলতেন, 'তাহলে বন্ধু, এখন তোমার একটা কোট আর একটা কুর্তা হয়েছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমার ভালো পা-জামা ছিলো, শহরে সবাই আমাকে ভদ্রলোকের মতো সম্মান করতো। কিন্তু পা-জামাটা যেই ছিঁড়ে গেলো, অমনি আমিও এই শহরতলিতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আসলে লোকে বাইরেটাকে দেখে বিচার করে, কেননা ওরা আজন্ম নির্বোধ। এই কথাকটা মনে রেখো, আর আমার ঋণের অর্ধেকটা অন্তত ফিরোত দিও। তারপর শান্তিতে চলে যেও, গিয়ে খোঁজ, দেখবে ঠিক পাবে।'

'আপনি যেন আমার কাছে কত পেতেন, আরিস্তিদ ফোমিচ?'

'এক রুবল, সত্তর কোপেক। তুমি বরং আমাকে এক রুবলই দিও, ইচ্ছে করলে

সত্তর কোপেকও দিতে পারো। বাকিটা নাহয় পরে এর চেয়ে ভালো রোজগার করলে আমাকে দিয়ে দিও।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, আরিসতিদ ফোমিচ।' সেনাধ্যক্ষের কথাগুলো স্পষ্টতই সঙ্গীর মনকে আলোড়িত করে তুললো। 'আপনার মনটা সত্যিই বড় উদার! ভাগ্য অন্যায়ভাবে আপানার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে…নইলে ঠিক জায়গায় থাকলে এতদিনে আপনি দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারতেন।'

'ঠিক জায়গা বলতে?' বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলে কুভালদা কখনও ছাড়াতেন না। 'জীবনে ঠিক জাগাটি যে কি আজ পর্যন্ত কেউ তা সত্যি করে বলতে পারে না। ফলে আমরা প্রত্যেকেই অন্যের খপ্পরে পড়ি। বণিক পেতুনিকভের আসল জায়গা হওয়া উচিত ছিলো কয়েদখানায়, কিন্তু এখনও সে প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়…এমন কি একটা কারখানা খোলার মতলবেও আছে। আমাদের শিক্ষকটির জায়গা হওয়া উচিত ছিলো একজন সুগৃহিনী আর গোটা-ছয়েক ছেলেমেয়ের পাশে, কিন্তু আজ তাকে মুখ রগড়াতে হচ্ছে ভাভিলভের সরাইখানায়। তারপর এই তোমার কথাই ধরো না কেন। তুমি জুতো পরিষ্কার করা কিংবা সরাইখানায় পরিচারকের কাজ খুঁজছো, কিন্তু আমি জানি আসলে তোমার হওয়া উচিত ছিলো সৈনিক। কেননা তুমি নির্বোধ নও, আর নিয়ম-শৃংখলার ব্যাপারটা বেশ ভালোই বোঝো। তাহলে বুঝতেই পারছো অদৃষ্টের পরিহাস কাকে বলে? জীবন চিরদিনই মন্দ-ভাগ্য তাসের মতো আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করে, আর দৈবাৎ আমরা যদি কখনও আমাদের ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে পড়ি, তাহলে জানতে হবে সেটা নিতান্তই আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।'

বিদায়কালীন এই সব কথোকথন প্রায়ই শুরু হতো ওদের বন্ধুত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার সূত্রপাত হিসেবে, মদ্যপানের মাধ্যমে আর শেষ হতো এমন একটা পর্যায়ে, যখন সঙ্গীটি অবাক বিস্ময়ে দেখতো তার পকেটে আর একটিও কপর্দক নেই। তখন সেনাধ্যক্ষ তাকে আবার সেই এক রুবল বা সত্তর কোপেক ধার দিতেন, এবং সেটাকেও যথারীতি মদ খেয়ে উড়িয়ে দেওয়া হতো।

তা বলে এসব ব্যাপারে দু পক্ষের সদ্ভাব কোনোদিনই ক্ষুণ্ণ হতো না।

কুভালদার ভাড়াটে-শোবার-ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষকটিও সেই ধরনের মানুষ, যিনি আত্মসুদ্ধি করতেন কেবল আবার পাপ করার জন্যে। ফলে শিক্ষাগত রুচির দিক থেকে সেনাধ্যক্ষের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বেশি ভাব। আর সম্ভবত সেই কারণেই তিনি জীবনে কোনোদিন উন্নতি করতে পারেননি। আবার আরিসতিদ কুভালদাও তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলোকে এঁর কাছে যেভাবে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলতে পারতেন, তেমনটি আর কারুর কাছে পারতেন না। কেননা এই একটি মাত্র মানুষ যিনি তার তথ্যগুলোকে অনুধাবণ করতে পারতেন। তাই কিছু অর্থ সঞ্চয় করার পরে, ভাড়াটে-শোবার-ঘর ছেড়ে শহরে কোথাও আশ্রয় নেবার প্রস্তাব জানালে আরিসতিদ কুভলদা এমন বিমর্ষ আর বিচলিত হয়ে পড়তেন যে বন্ধুত্বের দাবীকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তিনি শিক্ষককে মদের আসরে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং যথারীতি শেষ কপর্দটি পর্যন্ত নিঃশেষ করে চূড়ান্ত এক মাতলামির মধ্যে ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটতো। ফলে শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকটির পক্ষে আর

কোনোদিন ভাড়াটে-শোয়ার-ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতো না।

প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন ভলগার তীরে শিক্ষকদের একটি শিক্ষণশিবির বিদ্যালয়ে, কিন্তু কয়েক বছর পর সেখান থেকে তিনি কর্মচ্যুত হন। তারপর কিছুদিনের জন্যে একটা চামড়ার কারখানায় কেরানির কাজ করেন। সেখান থেকে ছাঁটাই হবার পর, গ্রন্থাগারিকের কাজ নেন। এছাড়া আরও নানা ধরনের টুকিটাকি কাজও করেন। শেষে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ওকালতি শুরু করেন এবং মদ খাওয়া ধরেন। এবং এই মদই শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেনাধ্যক্ষের ভাড়াটে-শোবার-ঘরে টেনে নিয়ে আসে।

কুভালদার মতো উনিও লম্বা, ঢালু কাঁধ, চোখা নাক, টাক মাথা। শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোটরাগত জ্বলজ্বলে অস্থির একজোড়া চোখ, ঠোঁটের কোণে জড়ানো একটুকরো হাসি বিষণ্ণ। উনি অন্নের সংস্থান করেন, বরং বলা ভালো, মদের সংস্থান করেন স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ সরবরাহ করে। কখনও কখনও সপ্তাহে পনেরো রুবল পর্যন্তও উপার্জন করতেন। তখন সেনাধ্যক্ষের হাতে কয়েকটা রুবল গুঁজে দিয়ে বলতেন 'ঢের হয়েছে। এবার আমি সংস্কৃতির কোলে ফিরে যাচ্ছি।'

'বাঃ, সত্যিই খুব খুশি হলাম!' সতর্ক ভঙ্গিতে সেনাধ্যক্ষ বলতেন। 'তোমার এই সংকল্পে আন্তরিক সহানুভূতি না জানিয়ে পারছি না, ফিলিপ। আর তার জন্যে তোমাকে এক গেলাসও ভদকা পান করতে বলবো না।'

'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কুভালদা...'

ফিলিপের কণ্ঠস্বরে যত বেশি অনুনয় প্রকাশ পেতো, সেনাধ্যক্ষ তত বেশি কঠোর হবার ভান করতেন। 'অহেতুক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো অর্থই হয় না।'

'সে তুমি যা-ই বলো কুভালদা, আমি কিন্তু সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।' বিষণ্ণভাবে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিক্ষকমশাই তাঁর সংবাদিকতার কাজে চলে যেতেন। কিন্তু দু একদিন পরেই উনি আবার তৃষিত ম্লান মুখে ফিরে আসতেন। সেনাধ্যক্ষ তখন অমিত উৎসাহে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বিভিন্ন চরিত্রের নানান লজ্জাকর দুর্বলতা, মাতলামির পাশবিক আনন্দ এবং অন্যান্য উপযুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। স্বভাবতই ঠিক এমন কোনো মুহূর্তে ওঁকে একাধারে উপদেষ্টা এবং বিচারকের ভূমিকা নিতে হতো। কিন্তু ভাড়াটে-শোবার-ঘরের সন্দিগ্ধ বাসিন্দারা আড়াল থেকে ওঁকে উপহাস করতো এবং শিক্ষকটিকে সৎপথে নিয়ে যাবার প্রয়াস দেখে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতো, 'মানুষ তো নয়, ব্যাটা যেন খেঁকশিয়াল!'

'আরে, কি বলছে তাই শোনো না। বলছে, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, তখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করোনি। এখন তার জন্যে বরং নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ দাও!'

'উনি কিন্তু সত্যিই একজন পাকা সৈনিক, সব সময়েই থাকে প্রথম সারিতে, অথচ লক্ষ্য রাখেন পেছন পথে।'

ম্লান মুখে শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটোকে বারবার চাটতে দেখে সেনাধ্যক্ষ হয়তো গম্ভীর হয়ে থমথমে গলায় জিগেস করতেন, 'কি ব্যাপার, তোমার অবস্থা তো কাহিল বলে মনে হচ্ছে?'

করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিক্ষকটি অস্ফুট স্বরে বলতেন, 'হ্যাঁ, ভাই।'

বিষের তৃষ্ণায় বন্ধুর শীর্ণ-দেহটাকে কাঁপতে দেখে কুভালদা পকেট থেকে কয়েকটা মুদ্রা বার করে ওঁর হাতে দিতেন। আসল কথাটা কি জানো, ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না, অসম্ভব!'

ফিলিপ কিন্তু সেই মুহূর্তে সবকটা টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতেন না, প্রায় অর্ধেকটা খরচ করতে হতো রাস্তায় উলঙ্গ নোংরা ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েগুলোর পেছনে। দিন-রাতই ওরা সরবে রাস্তায় কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এরাই হচ্ছে এ পৃথিবীর জীবন্ত কুসুম। ফিলিপ প্রায়ই আকালে বিশুষ্ক এই কুসুমগুলোকে তার চারপাশে জড়ো করতেন, ওদের রুটি ডিম আপেল আর বাদাম কিনে দিতেন। কখনও মাঠ পেরিয়ে ওদের নিয়ে যেতেন সেই নদীর ধারে। প্রথমে ওরা রাক্ষসের মতো গোগ্রাসে গিলতো, তারপর সারা মাঠ জুড়ে উতল কলরবে খেলা করতো। তখন তাঁর লম্বা শীর্ণ মাতাল মূর্তিটা ক্রমশ ছোট হতে হতে যেন ওদেরই একজন হয়ে যেতো, আর ওরাও তখন শেষের 'কাকু' শব্দটা যোগ করার বাড়তি কষ্টটুকু স্বীকার না করে কেবল 'ফিলিপ' বলেই ডাকতো। চারধারে ভূতের মতো খেলতে খেলতে বিচ্চুগুলো কখনও ওঁকে ঠেলে দিতো, কখনও লাফিয়ে পিঠে চড়ে বসতো, কখনও টাকে চাঁটি মারতো, কখনও বা নাকটা চেপে ধরতো। এগুলো নিঃসন্দেহে ওকে খুশিই করতো, কেননা এমন বাড়াবাড়িতেও উনি কখনও আপত্তি জানাতেন না। এমনি ভাবে ফুটন্ত কাঁচ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দিনের অনেকখানি সময় ওঁর অতিবাহিত হয়ে যেতো। তারপর একসময়ে ভারাক্রান্ত মনে ভাভিলফের সরাই-খানায় ফিরে আসতেন এবং নিজেকে অবচেতন করে না ফেলা পর্যন্ত নিঃশব্দে পান করে যেতেন।

প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ-সরবাহের কাজ থেকে ফিরে আসার সময় উনি একখানা করে দৈনিক পত্র সঙ্গে নিয়ে আসতেন, আর ওঁর চারপাশে জড়ো করতেন একদিন যারা মানুষ ছিলো সেইসব পশুদের। ওরা আসতো মাতাল হয়ে, যত রকম বিশৃঙ্খলা নিয়ে। কিন্তু সকলেই সমানভাবে নোংরা আর দয়ার যোগ্য। ওদের মধ্যে আসতো আলোকসি ম্যাক্সিমভিচ সিমৎসভ। পিপের মতো গোলগাল চেহারা, আগে ছিলো বন-রক্ষক, এখন দেশলাইবাকস আর জুতোর কালির ব্যবসা করে। বছর ষাট বয়েস, গায়ে ক্যাম্বিস কাপড়ের লম্বা কোট, মাথায় চওড়া-কানাওয়ালা টুপি। সাদা ঘন দাড়িভরা ভরি লাল মুখ, ছোট্ট একটু উঁচানো নাক, স্বচ্ছ চোখদুটো অবজ্ঞায় জ্বলজ্বল করতো। সবাই ওকে ডাকতো ঘুরন্ত লাটিম বলে। ওর গোলগাল দেহ আর কথা বলার সময় ফোঁস ফোঁস শব্দের জন্যে নামটা ওকে বেশ ভালোই মানাতো।

আসতো 'মন্দ উপসংহার'—লুক আন্তর্নাভিচ মার্তিয়ানভ। আগে ছিলো কারা-রক্ষক, এখন পুলিসের চোখ এড়িয়ে নানা রকমের জুয়া খেলে। মাতাল, কালো, ভয়ঙ্কর নীরব মূর্তিটাকে শিক্ষকের পাশে ঘাসের ওপর আছড়ে ফেলে কুতকুতে চোখে বোতলটার দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় জিগেস করতো, 'ওটা থেকে খানিকটা পেতে পারি?'

আসতো যন্ত্রকুশলী পাভেল স্লনৎসেভ। বছর ত্রিশ বয়েস, ক্ষয় রোগে ভুগছে। কোনো

এক মারামারিতে তার বাঁ দিকের পাঁজরাগুলো গুঁড়িয়ে যায়। শেয়ালের মতো তীক্ষ্ণ হলদেটে মুখে লেগে থাকতো ধূর্ত একটা হাসি। সবাই ওকে ডাকে 'হাড়ের থলে' বলে। আপাতত নিজের তৈরি ফুলঝাড়ু ফেরি করে বেড়ায়।

তারপর আসতো দীর্ঘকায়, হাড় জিরজিরে চেহারা, ভীরু, মুখচোরা গোছের একজন লোক। চুরি করার অভিযোগে তিনবার জেল খেটেছে। ওর পারিবারিক নাম কিসেল-নিকভ। কিন্তু সবাই ডাকতো 'তারাসের দ্বিগুণ' বলে। কেননা ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু ডিকন তারাস ছিলো লম্বায় ঠিক ওর অর্ধেক। মাতলামি আর দুর্নীতির জন্যে ডিকনকে নিম্নপদে অবনমিত করা হয়। বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুল। নাচতে আর অশ্লীল খিস্তি দিতে ও ছিলো সবচেয়ে ওস্তাদ।

ও আর তারাসের দ্বিগুন নদীর ধারে কাঠ-চেরাই করতো, আর যখনই শুনতে চাইতো, ডিকন তাকে নিজের রচিত গল্প শোনাতো। আর সেই গল্প শুনে ভাড়াটে শোবার ঘরের বাসিন্দারা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ওর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতো। ডিকন অর্ধনির্মীলিত চোখে যৌন আবেদনমূলক নির্লজ্জ রোমাঞ্চকর গল্পগুলো অনর্গল বলে যেতো। অফুরন্ত ওর উদ্ভট কল্পনাশক্তি। সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি সমানে গল্প রচনা করে বলে গেলেও কোথাও কোনো পুনরাবৃত্তি করতো না। ওর মধ্যে নিহিত ছিলো বিরাট এক প্রতিভা, নিঃসন্দেহে ও বিশিষ্ট একজন গাল্পিক, চেষ্টা করলে উজ্জ্বল জীবন্ত ভাষার সাহায্যে হয়তো পাষাণের প্রাণও সঞ্চারিত করতে পারতো।

এছাড়া আসতো আর একজন বিকৃত মস্তিষ্কের যুবক। কুভালদা ওকে ডাকতেন 'উল্কা' বলে! একদিন রাত্রে ভাড়াটে-শোবার ঘরে সেই যে শুতে এলো, তারপর থেকে আর কোথাও নড়েনি। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ও এখানে রয়ে গেলো। প্রথম প্রথম ওর দিকে বিশেষ কেউ নজর দেয়নি। দিনের বেলায় আর সবার মতো ও-ও বেরুতো জীবিকার সন্ধানে, কিন্তু রাত্রিবেলায় ফিরে এসে বন্ধুদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করতো। শেষ পর্যন্ত সেনাধ্যক্ষের একদিন নজর পড়লো ওর ওপর।

'এই ছোঁড়া। তুই এখানে কি করিস রে?'

ছেলেটা নির্ভীকভাবে জবাব দিলো, 'আমি নগ্নপদ একজন ভবঘুরে!'

কুভলদা তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকালেন। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, চোয়ালের হাড়-বারকরা নিতান্তই সরল একটা মুখ, নাকটা একটু চাপা। গায়ে নীল কামিজ, মাথায় খড়ের টুপি, খালি পা।

'নাঃ, তুই একটা গাধা!' ওর সর্বাঙ্গ ভালো করে জারিপ করে নিয়ে কুভলদা মন্তব্য করলেন। এখানে কেন ঘুরঘুর করিস? ভদকা খাস? খাস না। তাহলে চুরি করতে পারিস? তাও পারিস না। তাহলে সোজা ভাগ এখান থেকে। যখন মানুষ হতে শিখবি, তখন এখানে আসবি।

ছোকরা হাসলো। 'না, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকবো।'

'কেন?'

'এমনি।'

'নাঃ, তুই একটা ধুমকেতু। ব্যাটা উল্পকার বাচ্ছা!'

আরও কয়েকজন ভাড়াটের সঙ্গে কারা-রক্ষক মার্তিয়ানভও দাঁড়িয়ে ছিলো ওদের পাশে! সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো 'দেবো নাকি ওর দাঁতকটা ফেলে?'

ছেলেটা অবাক হয়ে গেলো। 'কেন?'

'এমনি।'

ছেলেটা শান্ত স্বরে জবাব দিলো। 'তাহলে আমিও পাথর দিয়ে তোমায় মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো।'

কুভালদা বাধা না দিলে কারা-রক্ষক হয়তো সত্যিই ওর হাড়-পাজরা গুঁড়িয়ে দিতো।

'থাক, ছেড়ে দাও মার্তিয়ানভ! আমরা সবাই এক পালকেরই পাখি। ওর যেমন আমাদের সঙ্গে বাস করার উপযুক্ত কোনো কারণ নেই, তেমনি ওর দাঁতগুলো ফেলে দেবারও তোমার যথেষ্ট কোনো কারণ নেই! চুলোয় যাগগে···আমরা শালা এ পৃথিবীতে কোনো কারণ ছাড়াই বেঁচে থাকবো।'

ছেলেটার বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে শিক্ষকমশাই পরামর্শ দিলেন, 'তুমি এখান থেকে চলে গেলেই ভালো করতে।' ছেলেটা কোন জবাব দিলো না, সেই থেকেই সে এখানে রয়ে গেলো। কেউ তার দিকে তেমন করে নজর না দিলেও, সে কিন্তু সব কিছুর ওপর কড়া নজর রাখতো।

'একদিন যারা মানুষ ছিলো' সংস্থার এরাই হচ্ছে সেনাধ্যক্ষের মূল সদস্য। এছাড়া ভাড়াটে-শোবার-ঘরে আরও পাঁচ-ছজন সাধারণ ভবঘুরে আছে, যারা একদা তথাকথিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ হিসেবে ওদের মতো নিজেদের অতীতে নিয়ে বড়াই করতে পারতো না। কেননা এদের প্রায় সকলেই ছিলো নিতান্ত সাধারণ ঘরের চাষী।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি, বৃদ্ধ চাষী, ত্যাপা। অসম্ভব লম্বা আর মাথাটা এমন ভাবে ঝুঁকে থাকে যে থুতনিটা এসে ঠেকে বুকের কাছে। মুখখানাকে কেবল চেনা যায় পাশ থেকে। বাঁকানো নাক, ঝুলে পড়া ঠোঁট, ঝাঁকড়া সাদা ভ্রূ। ও-ই সেনাধ্যক্ষের প্রথম বাসিন্দা। গুজব শোনা যায় গোপন কোনো জায়গায় ওর নাকি অনেক টাকা লুকনো ছিলো। বছর দুই আগে ওই টাকার লোভে কে যেন ওর গলা কাটবার চেষ্টা করেছিলো। টাকার কথা ও অবশ্য অস্বীকার করতো, বলতো হিংসের জন্যেই নাকি লোকটা তার গলা কাটার চেষ্টা করেছিলো। এখন, রাস্তায় রাস্তায় ও ছেঁড়া নোংরা কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় আর মাথাটা ঝুঁকে থাকার ফলে সে কাজটা ওর পক্ষে খুব সহজ হয়। হাতে লাঠি, পিঠে বিরাট থলে নিয়ে টলতে টলতে ও যখন ফিরে আসে, ওকে দেখে মনে হয় যেন কোনো গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঠিক তেমনি কোনো মুহূর্তে কুভালদা ওর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলতেন, 'ওই যে, পেতৃনিকভের পলাতক বিবেক চলেছে! ব্যাটা যেমন নোংরা তেমনি নীচ!'

ত্যাপার কণ্ঠস্বর ছিলো কর্কশ আর বিশ্রী খ্যানখ্যানে, তাই ও কথা বলতো খুব কম। ঘরের কোণে একা থাকতেই বেশি ভালোবাসতো। কাগজ কুড়িয়ে ফিরে আসার পর সারাক্ষণ হয় ছেঁড়া জামাকাপড় রিপু করতো, নয়তো পুরনো ছেঁড়া ধুরধুড়ে বাইবেলখানা খুলে পড়তো। কেবল শিক্ষকটি যখন খবরের কাগজ পড়তো, ও শুধু তখন ঘরের কোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতো। কোনো কথা না বলে নীরবে শুনতো, আর মাঝে মাঝে গভীর

দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। কিন্তু কাগজখানা পড়া হয়ে গেলেই কঙ্কালসার হাতটা বাড়িয়ে বলতো, 'ওটা আমাকে দিয়ে দাও।'

'কেন, এটাকে নিয়ে তুমি কি করবে ?'

'পড়বো। হয়তো আমাদের কথাও এতে কিছু থাকতে পারে।'

'কাদের কথা ?'

'আমাদের···মানে গ্রামের কথা।'

সবাই হাসি হাসি করতো। কিন্তু কাগজখানা ছুঁড়ে দিলেই ও নিঃশব্দে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো—কেমন করে শিলাবৃষ্টিতে একটা গ্রামে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কি করে একটা গ্রামের ত্রিশখানা ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তৃতীয় গ্রামে কে একজন বউ তার স্বামীকে বিষ খাইয়েছে···প্রকৃত পক্ষে গ্রামের অজ্ঞ হীন নোংরা চিত্রগুলোই ওকে সবচেয়ে বেশি করে নাড়া দিতো।

রোববার ও ঘর থেকে কোথাও নড়তো না, সারাদিন বাইবেলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতো। তখন কেউ বাধা দিলে বা বিরক্ত করলে ও রেগে উঠতো।

মাঝে মাঝে কুভালদা বলতো, 'এই নরকের পোকা, তুমি বাইবেলের কি বোঝো হে ?'

'তুমি কি বোঝো ?'

'আমি কিছুই বুঝি না, আর সেই জন্যে আমি বই পড়ি না।'

'আমি পড়ি।'

'সেই জন্যেই তো তুমি একটা আস্তো নির্বোধ। মাথায় পোকা ঢোকা খুবই খারাপ. তার ওপর যদি চিন্তা ঢোকে, তখন তুমি কি করবে শুনি, বুড়ো ব্যাঙ ?'

'কি আর করবো ? খুব শিগগিরই মরে যাবো !'

একবার শিক্ষকটি তাকে জিগেস করেছিলো,' কেমন করে তুমি পড়তে শিখলে ?'

ত্যাপা সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলো, 'জেলে।'

'কেন, তুমি সেখানে ছিলে নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'আমার একটা ছোট্ট ভুলের জন্যে···কিন্তু বাইবেলটা আমি সেখানেই পাই। একজন মহিলা এটা আমাকে দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে জেলে থাকাটাই ভালো ছিলো।'

'সেকি ! কেন ?'

'বিনিমাগনায় সেখানে অনেক কিছু শেখা যায়···'

অনেক দিন আগে, শিক্ষকটি যখন প্রথম ভাড়াটে-শোবার-ঘরে এসেছিলেন, ত্যাপা মনোযোগ দিয়ে ওঁকে লক্ষ্য করতো, ওঁর কথাগুলো আগ্রহ ভরে শুনতো। একদিন বুড়ো ওঁকে জিগেস করেছিলো. 'আপনি তো দেখছি খুবই শিক্ষিত, বাইবেল পড়েছেন ?'

হাসতে হাসতে ফিলিপ ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলেন, 'পড়েছি।'

'মনে আছে ?'

'হুঁ, কিছু কিছু আছে বইকি।'

সন্দেহের চোরা চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ত্যাপা জিগেস করেছিলো, 'অ্যামালে-

হাইটদের কথা আপনার মনে পড়ে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওরা এখন কোথায় ?'

'উধাও হয়ে গ্যাছে।'

'আর ফিলিস্তাইনরা ?'

'ওরাও।'

'সবাই মরে-হেজে গ্যাছে ?'

'হ্যাঁ, সবাই।'

'তাহলে···তাহলে তো আমরাও সবাই একদিন মরে যাবো ?'

'হ্যাঁ, এমন একদিন আসবে যখন আমরাও মরে অতীত হয়ে যাবো।'

'আচ্ছা, আমরা ইস্রায়েলদের কোনো শাখা ?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে শিক্ষক কি যেন ভাবেন, তারপর ওকে সিদিয়ান, স্লাভ আর সিমেরিয়াদের কথা বোঝাতে শুরু করেন। আর বুড়ো ত্যাপা নিষ্পলক চোখে ওঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সবকিছু মন দিয়ে শোনে।

একসময়ে শিক্ষকটি থামলে ও অবজ্ঞার সুরে বলে ওঠে, 'সব মিথ্যে কথা !'

'তার মানে ?'

'বাইবেলে এসব জাতির কথা কোথাও লেখা নেই।'

শিক্ষক হেসে ওঠেন। 'নাঃ, তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গ্যাছে।'

'না, আমার মাথা খারাপ হয়নি, আপনিই বরং ঠিক বলছেন না।' নোংরা বাঁকানো আঙুল নেড়ে ত্যাপা বলে। 'আদমের উৎপত্তি ঈশ্বর থেকে, আর আদমের বংশধর হচ্ছে ইহুদিরা। তার মানে সমস্ত মানুষ হচ্ছে ইহুদিদের বংশধর··· এমন কি আমরাও।'

'বেশ তো !'

'তাতারদের উৎপত্তি ইসমায়েল থেকে, কিন্তু সেও ইহুদিদের বংশধর।'

'তুমি এসব কথা আমাকে বলছো কেন ?'

'এমনি। আপনি মিছে কথা বললেন, তাই।'

রাগে গজ গজ করতে করতে ও সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তার দুদিন পরেই আবার শিক্ষককে পাকড়াও করলো। 'আপনি তো অনেক লেখাপড়া জানেন, আমরা কে বলুন তো ?'

'আমরা শ্লোভ, ত্যাপা।'

'বাইবেল থেকে নজির দ্যাখান। তাতে এই রকম কোনো নামের উল্লেখ নেই। আমরা কি তাহলে ব্যাবিলোনিয় ?'

'না।'

'তার মানে ভগবান যেসব লোকদের জানেন রুশরা তাদের মধ্যে নেই ? বাইবেলে যাদের কথা আছে, ভগবান তাদের কথা ভাবেন, তাদের রক্ষা করেন, ধ্বংস করেন, এমন কি তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে মহাপুরুষও পাঠান। কিন্তু আমাদের কি হবে ?'

ফিলিপ ওর কথাগুলো আপ্রাণ বোঝবার চেষ্টা করলেন। তবু ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে বললেন, 'আমি ঠিক জানি না।'

'তাই বলুন যে আপনি জানেন না। অথচ সব সময় এমনভাবে কথা বলেন, যেন আপনি সব জানেন। আপনি মিছে-কথা বলেছেন—সমস্ত জাতি কখনও মরে যেতে পারে না, বুশরা কখনও মরতে পারে না। মিথ্যে কথা। বাইবেলে নিশ্চয়ই আমাদের কথাও লেখা আছে, শুধু কি নামে আছে জানা যায় না। না হলে দেখছেন না—আমরা কি বিরাট একটা জাত, কত গ্রাম কত নগর কত লোক বাস করে···আর আপনি বলছেন কিনা তারা একদিন মরে যাবে। এক-আধজন লোক মরতে পারে, কিন্তু একটা জাত কখনও মরতে পারে না। আমাদেরকেও ভগবানের প্রয়োজন আছে, না হলে কারা পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে? আর অ্যামালেকাইটরাও এখনও ধ্বংস হয়নি···হয়তো ওদের এখন জার্মান কিংবা ফরাসী বলে ডাকা হয়, এই মাত্র তফাত! আচ্ছা, বলুন তো কেন ভগবান আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, কেন আমাদের কোনো মহাপুরুষ নেই? কে আমাদের শিক্ষা দেবে?'

মৃদু ভর্ৎসনা আর গভীর প্রত্যয় মেশা ত্যাপার কর্কশ কণ্ঠস্বর কেমন যেন জোরালো শোনালো। ফিলিপের সঙ্গে ও অনেকক্ষণ ধরে কথা বললো, আর শিক্ষকটিও অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও ছিলেন মাতাল, বিষণ্ণতায় সারা মন ওঁর আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো, উনি ত্যাপার কথাগুলো ঠিক যেন সহ্য করতে পারলেন না। ওঁর মনে হলো এক একটা শব্দ যেন করাতের দাঁতের মতো ওঁর হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। বৃদ্ধ ত্যাপার বিকৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে, তার কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎই শব্দগুলোর মর্মস্পর্শী বিচিত্র এক শক্তির অনুভবে নিজেরই প্রতি অনুকম্পায় ওঁর মন ভরে গেলো। উনি ভাবলেন প্রত্যুত্তরে এমন বলিষ্ঠভাবে কিছু বলা উচিত যাতে ত্যাপারের মনে প্রচ্ছন্ন একটা প্রভাব পরতে পারে, অর্থাৎ মৃদুও নয় আবার কঠিন ভর্ৎসনার সুরেও নয়, যেন অনেকটা স্নেহশীল পিতার কণ্ঠস্বরেব মতো হয়। কিন্তু ভেতর থেকে ঠেলে-ওঠা অশ্রুভারে ওঁর কণ্ঠস্বর এমন রুদ্ধ হয়ে এলো যে উনি তেমন কিছু বলতেই পারলেন না।

'হ্যাঁ ত্যাপা, তুমি যা বলছো ঠিক। অসংখ্য, অগনন মানুষ···কিন্তু আমি তাদের চিনি না, তারাও আমাকে চেনে না, সবচেয়ে দুঃখ তো ওইখানেই!' অদ্র করুণ একটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো ফিলিপের কণ্ঠস্বর।' 'কিন্তু তাতেই বা কি এসে যাবে! দুঃখ আমাকে ভোগ করতেই হবে···আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না···'

ওঁর সজল দু চোখে চোখ রেখে ত্যাপা বললো, 'আপনার গ্রামে চলে যাওয়া উচিত। সাংবাদিকতার চেয়ে সেখানে গিয়ে বরং যাজক বা শিক্ষক হবার চেষ্টা করুন, তাতে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবেন···আর কিছু না হোক অন্তত মানুষ চিনতে পারবেন।'

এবার শিক্ষকের দুচোখ বেয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো এবং তাতে তিনি আনন্দই পেলেন। নিজেকে ওঁর কেমন যেন ঝরঝরে আর হালকা মনে হলো।

সেইদিন থেকে দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। একদিন যারা মানুষ ছিলো সেইসব পশুগুলো ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই বলতো, 'কাগজ-কুড়নোওয়ালার সঙ্গে শিক্ষকটার বনেছে ভালো। নিশ্চয়ই কুভালদা ওঁকে লাগিয়েছে বুড়োর টাকাগুলো কোথায় আছে জেনে খুঁজে বার করার জন্যে!'

সম্ভবত তারা বিশ্বাস করতো না বলেই একথা বলতো। এইসব লোকগুলোর মধ্যে

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—তারা যতটা খারাপ, অন্যের চোখের সামনে তার চাইতেই বেশি খারাপ হিসেবে নিজেদের চিত্রিত করতে দারুণ ভালোবাসতো। আর যে সব মানুষদের মধ্যে ভালো কিছু নেই, তারা নিজেদের খারাপটা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নয়।

এইসব মানুষগুলো চারপাশে জড়ো হলে শিক্ষক কাগজ পড়া শুরু করতেন।

'দাঁড়ান, তার আগে আলচ্য বিষয় কি কি আছে তাই বলুন? কোনো গল্প আছে?'

'না।' মুখ না তুলেই শিক্ষক ছোট্ট করে জবাব দিতেন।

'আপনার প্রকাশক দেখছি বড্ড কৃপণ। কোনো সম্পাদকীয় নিবন্ধ আছে?'

'হ্যাঁ, আজ একটা আছে···লিখেছেন গুলেভ।'

এবার নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়ে শিক্ষকটি শুরু করতেন, 'স্থাবর সম্পত্তির উপর কর-ধার্যের প্রচলন হইয়াছিলো পনেরো বৎসর পূর্বে এবং বর্তমানে তাহা শহরে রাজস্বের সাহায্যার্থে সকল কর-আদায়ের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে···'

'ব্যাপারটা যেমন সরল তেমনি হাস্যকর,' কুভালদা মন্তব্য করতেন। 'তার মানে এক কথায়, শহরে বণিকদেরই পোয়াবারো।'

'নিশ্চয়ই! ঠিক সেই জন্যেই এই নিবন্ধটা লেখা।' ফিলিপ শান্ত স্বরে জবাব দিতেন।

'তাই কি! আমার তো মনে হয় এতে গল্পেরই মালমসলা রয়েছে বেশি!'

তারপর শুরু হতো সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতো। তখনও পর্যন্ত এক বোতলের বেশি ভদকা খরচ হয়নি। সম্পাদকীয় নিবন্ধের পর পড়া হতো স্থানীয় সংবাদ, তারপর আইন-আদালত—আর সেটা যদি পুলিস-আদালতের খবর হতো এবং ফরিয়াদী কিংবা আসামী হতো কোনো বণিক, কুভালদা তাহলে সত্যিই খুশি হয়ে উঠতেন। কেউ যদি কোনো বণিকের টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিতো, উনি মন্তব্য করতেন, 'বাঃ, বেশ। তবে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা খুব কমই নিয়েছে!' কারুর ঘোড়া পালালে বলতেন, 'দুঃখের বিষয় যে এখনও সে বেঁচে আছে!' কোনো বণিক মামলায় হারলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, বলতেন, 'ইশ্, ব্যাটার আরও দ্বিগুণ খরচ হলে ভালো হতো!'

'কিন্তু, সেটা হতো বে-আইনী।'

'আরে রাখো তোমার বে-আইনী! বণিকটা কি নিজে আইনী? সব ব্যাটা বণিকই ছিলো প্রথমে চাষী, গ্রামে এসে হয়েছে বণিক। বণিক হতে গেলে টাকা চাই, অত টাকা চাষীরা কোত্থেকে পাবে শুনি? খুব সহজ পন্থা হচ্ছে অসৎ উপায়ে রোজগার করা। তার মানে প্রত্যেক বণিকই হচ্ছে এক একটা হাড়-বজ্জাত চাষী।'

ত্যাপা প্রতিবাদ করার আগেই শ্রোতারা চেঁচিয়ে উঠতো, 'চমৎকার! চমৎকার।'

তারপর পড়া হতো চিঠিপত্র। সেনাধ্যক্ষের মতে এগুলো হলো মুক্তধারা। উনি দেখতে পেতেন সব জায়গাতেই বণিকরা এক ঘৃণ্য জীবন গড়ে তুলছে আর আগেকার গড়া সবকিছুকে ধূলিসাৎ করে ফেলছে। তাই মাঝে মাঝে উনি চিৎকার করে বলতেন, 'আমি

যদি কাগজখানা লিখতাম, ওদের মুখোশগুলো খুলে দিয়ে আসল রূপটা প্রকাশ করে দিতাম···দেখিয়ে দিতাম সাময়িক ভাবে মানুষের ধর্ম পালন করলেও ওরা পশু, প্রকৃত জীবনের স্বাদ কোনোদিন পায়নি, দেশকে ভালোবাসার কি অর্থ তাই-ই জানে না, পাঁচটা ফুটো পয়সার দিকেই ওদের নজর বেশি।'

হাড়ের থলে সেনাধ্যক্ষের চরিত্রের দুর্বল জায়গাটা জানতো আর মানুষকে চটাতেও ভালোবাসতো। তাই ঈর্ষাভরে বলতো, 'হ্যাঁ, যেদিন থেকে সম্ভ্রান্তরা না খেতে পেয়ে মরতে শুরু করছে সেদিন থেকে মানুষও উধাও হতে শুরু করছে···'

'ঠিক, ঠিক বলেছো মাকড়শা আর ব্যাঙের বাচ্চা। যেদিন থেকে সম্ভ্রান্তরা মরতে শুরু করছে, সেদিন থেকে মানুষেরও অধঃপতন ঘটেছে। এখন রয়েছে কেবল বণিকশ্রেণী, আর আমি তাদের ঘেন্না করি।'

'এটা বোঝা খুবই সহজ, কেননা আপনারও পতন ঘটেছে ওদের দ্বারা।'

'আমার? গর্দভ আর কাকে বলে। জীবনের প্রতি ভালোবাসার জন্যই আমার এই সর্বনাশ। জীবনকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু বণিকরা তা নিঃশেষ করে লুঠে নিয়েছে, সেই জন্যেই আমি ওদের সহ্য করতে পারি না। তার মানে এই নয় যে আমি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বলে তাদের ঘেন্না করি। তাছাড়া কোনো কিছুর প্রতিই এখন আমার আর আগ্রহ নেই···যে জীবন আমাকে ছেড়ে চলে গ্যাছে, আজ সে আমার কাছে একটা রক্ষিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

হাড়ের থলে বলে, 'মিথ্যে কথা।'

'কি বল্লে!' রাগে লাল হয়ে কুভালদা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। 'মিথ্যে কথা?'

'আঃ, চুপ করো না!' মৃদু ধমকের সুরে কারা-রক্ষক বলে, 'কি দরকার পরের সমালোচনা করে? ধনী বণিক বা সম্ভ্রান্ত ওদের সঙ্গেই বা আমাদের সম্পর্ক কি?'

তারাস ঠাট্টা করে, 'দেখতেই তো পাচ্ছো, আমরা মাছ নই মাংসও নই···'

ফিলিপ সাধারণত এই ধরনের হৈ-হট্টগোল পছন্দ করতেন না, সারাক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বেদনাহত মুখে চুপচাপ শুনে যেতেন। কখনও পরস্পরের মধ্যে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করার জন্যে বলতেন, 'কি দরকার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে।' তাতে ব্যর্থ হলে উনি সোজা আসর ছেড়ে উঠে যেতেন। আর কুভালদাও সেটা ভালো করে জানতেন কখন উনি উঠে যাবেন। তাই নিতান্ত মাতাল অবস্থায় না থাকলে উনি সবচেয়ে ভালো শ্রোতাটিকে হারাতে কিছুতেই রাজি হতেন না। ফিলিপের হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলতেন, 'আমি চোখের সামনে দেখেছি শত্রুর হাতে জীবনকে বিপর্যস্ত হতে। শুধু সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীরই শত্রু নয়, জীবনে যাকিছু সুন্দর তারই শত্রু। শত্রুরা কখনও পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে না।'

ফিলিপ অনুত্তেজিত গলায় বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'কিন্তু বণিকরাই গড়ে তুলেছে জেনোয়া, ভেনিস, হল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের বণিকরাই জয় করেছিলো ভারতবর্ষ···'

'ওদের কথা কে ভাবে? আমি ভাবছি 'জুডাস পেতুনিকভ এণ্ড কোং'র কথা।'

'ওর কথাই বা তোমাকে কে ভাবতে বলেছে?' শিক্ষক শান্ত স্বরে বিদ্রূপ করেন।

'কিন্তু আমি তো এখনও বেঁচে আছি, নাকি নেই? তাই যে বর্বরগুলো জীবনকে দখল

করে রেখেছে, তাকে কলুষিত করছে, তাদের দেখে আমি ক্রুদ্ধ না হয়ে পারি না।'

যন্ত্রকুশলী পাভেল খোঁচা মেরে বলে, 'পদচ্যুত সেনাধ্যক্ষকে আপনি বিদ্রূপ করতে সাহস করেন ? সাংবাদিক হলে কি হবে, আপনি তো মশাই কম সাংঘাতিক লোক নন।'

'তুমি চুপ করো তো, হাড়ের থলে!' কুভালদা এক ধমক দেন। 'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি এটা আমার বোকামী হয়েছে। আমার উচিত ছিলো একদিন যে মানুষ ছিলাম সেইসব ভাবনা আর অনুভূতিগুলোকে বুকের মধ্যে কুলুপ-এঁটে রেখে দেওয়া। কিন্তু কি করবো বলো, তা যখন বুকের মধ্যে থেকে আপনিই ঠেলে বেরিয়ে আসে, কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে না।'

ফিলিপ উৎসাহিত হয়ে বলেন, হ্যাঁ, 'এইবার তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছো।'

'আসলে জীবনের প্রতি চাই আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন কিছু···'

'নিশ্চয়ই, আমরা সবাই তা চাই।'

'কেন ?' ভয়ঙ্কর মূর্তিতে জুলজুল চোখে তাকিয়ে মন্দ উপসংহার প্রশ্ন করে। 'আমরা যা বলি বা ভাবি তা কি এক জিনিস নয় ? তাছাড়া আমরা আর কদিনই বা বাঁচবো··· আমি চল্লিশ, আপনার বয়েস পঞ্চাশ, আমাদের মধ্যে ত্রিশের নিচে কেউ নেই। এমন কি যার বয়েস কুড়ি, সেও বেশিদিন বাঁচতে চায় না।'

হাড়ের থলে পাভেল এবার নড়েচড়ে বসে।' 'তাছাড়া আমাদের মধ্যে নতুনত্বই বা কি আছে ? ভিখিরি সব কালেই সমান।'

'হ্যাঁ, কিন্তু একদিন ওরাই রোমকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো।' ফিলিপ মন্তব্য করেন।

'ঠিক ঠিক!' কুভালদা হো হো করে হেসে ওঠেন। রোমুলাস আর রেমাস, কি বলো ? ঠিক হ্যাঁয়, হ্যাম লোক ভি ওইস্যা কুছ্ এক রোজ করেগা···'

'শান্তি-শৃঙ্খলা শালা সেদিন ট্যাঙ্কে তুলে দেবো।' পাভেলের উদ্ধত ধূর্ত হাসিতে জড়িয়ে থাকে অশুভ ধ্বংসের প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত। তার সে হাসির প্রতিধ্বনি শোনা যায় বন-রক্ষক, তারাসের দ্বিগুণ আর ডিকনের কণ্ঠে। উল্কার চোখদুটোও জ্বলে ওঠে।

মন্দ উপসংহার বাধা দিয়ে বলে, 'এগুলো কিন্তু বাজে ধারণা।'

জীবন থেকে বিচ্যুত, নিঃস্ব রিক্ত, ভদকা, বিদ্রূপ আর গ্লানিমায় অভিষিক্ত মানুষগুলোর যুক্তি-তর্ক শুনতে সত্যিই অদ্ভুত লাগে। সেনাধ্যক্ষের কাছে এইসব আলোচনা ছিলো জ্ঞানগর্ভ। কেননা ওরা সবচেয়ে বেশি ওঁকেই কথা বলার সুযোগ দিতো, আর সেই জন্যে উনি নিজেকে ভাবতেন সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। মানুষ যত নিচেই নামুক না কেন, অন্যের চেয়ে সে চালাক, শক্তিমান এবং ভালো খাওয়া-দাওয়া করে, এই অনুভূতি-বোধ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। এবং সুযোগ পেলে আরিসতিদ কুভালদাও এই আনন্দঅনুভূতির স্বদব্যবহার করতে কোথাও কুণ্ঠিত হতেন না। ফলে হাড়ের থলে কুবার ত্যাপা এবং আরও কয়েকজন, একদিন যারা মানুষ ছিলো, এ ব্যাপারে যাদের উৎসাহ কম, তারা স্পষ্টতই বিরক্ত হতো।

রাজনীতি ওদের সবার কাছে মুখরোচক বিষয় হলেও, মেয়েদের সম্পর্কে কথা উঠলে ওদের মুখের আর আগল থাকতো না। একমাত্র ফিলিপই মেয়েদের পক্ষ অবলম্বন করে,

এই বিতর্কে বিরোধিতা করতেন এবং শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করলে উনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তখন সবাই শিক্ষকের মতামত স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিতো, কেননা প্রথমত পাণ্ডিত্যের জন্যে সবাই ওঁকে বিশেষ চোখে দেখতো, দ্বিতীয়ত প্রতি শনিবার শনিবার সাংবাদিকতার জন্যে উনি যে টাকা রোজগার করতেন, তার থেকে সবাই ধার নিতো। এইসব সুযোগ-সুবিধে থাকায় মারামারির সময় ওঁকে বাদ দেওয়া হতো, কেননা সাধারণত যে কোনো তর্কা-তর্কিরই মিমাংসা হতো হাতাহাতির মাধ্যমে। এবং ভাড়াটে শোবার ঘরে একমাত্র ওঁরই মেয়েমানুষ আনার অধিকার ছিলো, এই সুযোগ-সুবিধে আর কাউকে দেওয়া হতো না। নতুন কেউ এলেই সেনাধ্যক্ষ আগে-ভাগে এ-ব্যাপারে তাকে সর্তক করে দিতেন, 'দেখ বাপু, আমার এখানে মেয়েমানুষ আনা চলবে না। আমার এখানে মেয়েমানুষ, বণিক আর ভাবুকের কোনো স্থান নেই। যে এখানে মেয়েমানুষ আনবে আমি দুজনকেই চাবকে তাড়াবো, আর কাউকে যদি ভাবুকতা করতে দেখি তো আমি তার মাথা গুঁড়িয়ে দেবো।'

হ্যাঁ, যথেষ্ট বয়েস হওয়া সত্ত্বেও ওঁর গায়ে এমন শক্তি ছিলো যে উনি যে কোনো লোকের মাথা গুড়িয়ে দিতে পারতেন। তাছাড়া যেকোনো ঝগড়া বা মারামারির সময় কারা-রক্ষক মার্তিয়ানভ কবর-স্তম্ভের মতো ভয়ঙ্কর অনড় মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতো সেনাধ্যক্ষের পেছনে। তখন এইদুটি জুটিতে মিলে যেকোনো যুদ্ধে হয়ে উঠতো এক দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। একবার বন-রক্ষক সিমৎসভ মাতাল হয়ে বিনা কারণে ফিলিপের একমুঠো চুল ছিঁড়ে নিয়েছিলো, তখন কুভালদা এক ঘুঁষিতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে দিয়েছিলেন। ঘণ্টা আধেক পরে যখন তার জ্ঞান ফিরে এসেছিলো, কুভালদা শিক্ষকের সেই চুল ওপড়ানো তাকে খাইয়ে ছেড়ে ছিলেন। তখন মার খাবার ভয়ে ঘুরন্ত লাটিম আর রা কাড়তে সাহস পায়নি।

খবরের কাগজ পড়া, মারামারি আর গল্পগুজবের মাধ্যমে নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করা ছাড়াও ওরা তাস খেলতো। তাস খেলার সময় ওরা মার্তিয়ানভকে নিতো না, কেননা ও সৎভাবে খেলতে পারতো না। কয়েকবার ধরা পড়ার পরে ও খোলাখুলিই স্বীকার করেছিলো, 'চুরি না করে আমি খেলতে পারি না, এটা আমার অভ্যেস।'

'হ্যাঁ, কোনো অভ্যেস একবার রপ্ত হয়ে গেলে তা থেকে ছাড়ান পাওয়া খুবই মুস্কিল।' ডিকন সায় দিতো। 'ফি রোববার প্রার্থনার পরে আমি আমার বউকে ধরে মারতাম, আর সে মরে যাবার পর আমি তোমাদের বোঝাতে পারবো না যে রোববারগুলো কি নিঃসঙ্গ আর খারাপ লাগতো। একটা রোববার কোনো রকমে কাটিয়ে ছিলাম, দ্বিতীয় রোববারটাও তাই ...কিন্তু তৃতীয় রোববারে আর পারলাম না, আমি আমার রাধুনিটাকে ধরে পেটালাম। ও প্রতিবাদ করে আমাকে পুলিসে নালিশ করার ভয় দেখালো। সত্যিই ও যদি তা করতো, কি অবস্থাটা দাঁড়াতো একবার ভেবে দ্যাখো। চতুর্থ রোববারে আমি আবার ওকে এমনভাবে পেটালাম যেন ও আমার নিজের বউ। দশ রুবল দিয়ে ওকে কোনো রকমে শান্ত করি। তারপর থেকে দ্বিতীয়বার বিয়ে না করা পর্যন্ত ফি রোববারে আমি ওকে সমানে পেটাতাম।'

হাড়ের থলে অবাক হয়ে জিগেস করতো, 'তুমি আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে কবে?'

'তুমি জানো না তাই, যে আমার ঘর-সংসার দেখতো ওটাই আমার দ্বিতীয় পক্ষের বউ।'

শিক্ষক জিগ্যেস করলেন, 'তোমাদের কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি?'

'হ্যাঁ, পাঁচটা। বড় ছেলেটা মরলো জলে ডুবে, ওইটেই ছিলো সবচেয়ে হাসি-

খুশি। দুটো মরলো ডিপথিরিয়ায়…বড় মেয়েটা একজন ছাত্রকে বিয়ে করে চলে গেলো সাইবেরিয়ায়। ছোটটা লেখাপড়া করবে বলে কোথায় যেন চলে গেলো, পরে শুনেছিলুম সেন্ট পিটারসবার্গে সে, সেটা ক্ষয়রোগে মরে গ্যাছে।' হাসতে হাসতে ডিকন তারাস সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিতো। 'আসলে কি জানো, ধার্মিক পুরুষদের প্রজনন ক্ষমতা একটু বেশিই হয় …' তারপর কেন হয় সেই ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তো। হাসি থামার পর বনরক্ষক সিমৎসভের মনে পড়ে যেতো ওরও একটা মেয়ে ছিলো। ওর নাম ছিলো লিদকা, মোটাসোটা আর চমৎকার দেখতে। এর বেশি ও আর কিছুতেই মনে করতে পারতো না।

ভাড়াটে শোবার ঘরের বাসিন্দা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের অতীত নিয়ে আলোচনা করতো খুবই কম, আর করলেও এমন বিষণ্ণ স্বরে বলতো, প্রকাশ পেতো কেবল তাদের ওপরের কাঠামোটা। আসলে বর্তমানের উৎসাহ আর ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবার আশঙ্কায় অতীতকে স্মরণ করতে ওরা ভয় পেতো।

দারুণ শীত আর বৃষ্টি-বাদলার দিনে 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' তারা জমায়েত হতো ভাভিলভের সরাইখানায়। এখানে ওরা সবাই সুপরিচিত, চোর-বদমায়েস বলে লোকে ওদের একটু ভয় করতো, পাঁড় মাতাল বলে ঘৃণা করতো, আর চালাক-চতুর বলে ওদের পরামর্শ নিতো, সম্মান দেখাতো।

ইগর ভাভিলভের সরাইখানাটা ছিলো জনসাধারণের আড্ডাখানা আর 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' তারা এর শিক্ষিত-সম্প্রদায়। শনিবার সন্ধ্যেবেলা আর রোববার সকালবেলায় সরাইখানাটা যখন খদ্দেরের ভিড়ে গিজগিজ করতো, তখন 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' তারা হতো এখানকার সম্মানীয় অতিথি। শহর থেকে বিতাড়িত, দুঃখ-দারিদ্রক্লিষ্ট রাস্তার ভবঘুরেদের তুলনায় তখন তাদেরকে দেখাতো অনেক বেশি উচ্ছল, এবং প্রকাশ পেতো নিজস্ব একটা ভাবধারা, যা জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত, নিঃস্ব রিক্ত, ভবঘুরে মাতাল মনগুলোকে করে তুলতো উল্লসিত। সব ব্যাপারে তাদের কথা বলার এবং ব্যঙ্গ করার নিপুণ দক্ষতা, ভীত সন্ত্রস্ত জনতার সামনে স্পষ্ট মতামত প্রকাশের নির্ভীকতা, তাদের বেপরোয়া আচরণ সঙ্গীদের মুগ্ধ না করে পারতো না। তাছাড়া আবার তাদের আইনের মাথা ছিলো পাকা, আর্জি লিখতে বা ধরা না পড়ে কি করে প্রতারণা করতে হয় সে ব্যাপারে তারা সর্বোতো-ভাবে সাহায্য করতো, পরামর্শ দিতো। আর এইসব প্রতিভার মূল্য পরিশোধ করা হতো ভদকা ও প্রচুর প্রশংসার বিনিময়ে।

আনুগত্য অনুসারে রাস্তার বাসিন্দারা বিভক্ত ছিলো দুটি দলে। একদল পছন্দ করতো কুভালদাকে, তারা ভাবতো উনি সত্যিকারের একজন যোদ্ধা এবং শিক্ষকটির চাইতে অনেক বেশি সাহসী। অন্যদলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো ফিলিপ অসম সাহসী তো বটেই, উনি কুভালদার চাইতে সব ব্যাপারেই উচুস্তরের। কুভালদাকে যারা পছন্দ করতো তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো চোর-বদমাইস গুণ্ডা মাতাল, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করার জন্যে যারা বহুবার জেল খেটেছে। আর শিক্ষককে যারা সম্মান করতো তারা কিছুটা দৃঢ়-চরিত্রের,

তারা তখনও প্রতীক্ষা করতো, মনে মনে উন্নতির আশা পোষণ করতো আর নানা ধরনের ফন্দী আঁটতো। তারা প্রায় অধিকাংশ সময়েই থাকতো ক্ষুধার্ত।

রাস্তার বাসিন্দাদের এই দুটি দলের চরিত্রকে কিছুটা বোঝা যাবে নিচের ঘটনা থেকে। পথ-সংস্কার সম্পর্কে পৌর-কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে একদিন সবাই ভাভিলভের সরাইখানায় আলোচনা করছিলো। রাস্তার খানা-খন্দগুলো পথবাসীদেরই ইঁট আর পাথরের টুকরো দিয়ে ভর্তি করতে হবে, কোনো রকম নোংরা বা আবর্জনা ব্যবহার করা চলবে না।

'আমি বলে শালার ছোট্ট একটা পাখির বাসা বাঁধতে গিয়েও পারলুম না, আর এখন এত ইঁট আর পাথরের টুকরো কোত্থেকে জোগাড় করি ?' মনমরা হয়ে রুটিওয়ালা মোকি আনিসিমভ অভিযোগ করলো।

সেনাধ্যক্ষের ইচ্ছে হলো এ-ব্যাপারে তিনি কিছু বলবেন, তাই টেবিল চাপড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'তুমি বলছো ইঁট-পাথরের টুকরো কোত্থেকে পাবে ? যাও, সোজা গিয়ে গণ-ভবনটা ভেঙে ফ্যালো। প্রথমত ওটা এমনিতেই এত পুরণো হয়ে গ্যাছে যে আর কাজে লাগবে না, দ্বিতীয়ত নতুন করে গড়ার সময়েও তোমাদের দু চারটে ভালো কাজ জুটবে। যদি ঘোড়ার প্রয়োজন হয় নগরপালের ঘোড়াটা কেড়ে নাও, সেইসঙ্গে ওঁর তিনটে মেয়েকেও, অবশ্য ওরা যদি গাড়িতে জোতার উপযোগী হয়। আর তা না হলে জুডাস পেতুনিকভের বাড়িটা গুড়িয়ে ফ্যালো, দেখবে রাস্তা বাঁধানোর কাজ খুব ভালোই এগুচ্ছে। ওহো, ভালো কথা, বুঝলে মোকি, তোমার বউ আজ রুটি সেঁকবার কাঠ কোত্থেকে পেয়েছে আমি জানি। পেতুনিকভের বাড়ির তৃতীয় জানলার দুটো খড়খড়িকে ও আজ ভেঙে নিয়ে এসেছে।'

উপস্থিত সবাই এক চোট প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে নিলো। কেবল কবরখানার মালী পভিলুজিন ভয়ে ভয়ে জিগেস করলো : 'আমাদেরও কি তাই করা উচিত বলে আপনার মনে হয় ?'

'তাহলে হাত-পা নেড়ো না, রাস্তাটা ওইভাবে পড়ে থাক…'

'কিন্তু কয়েকটা বাড়ি এরই মধ্যে অনেকটা করে বসে গ্যাছে…'

'বসুক গে, বাধা দিও না। যখন একদম পড়ে যাবে, শহর থেকে সাহায্য চাইবে, না পেলে আদালতে মামলা করবে। এখানকার জল আসে কোথা থেকে ? শহর থেকে। সুতরাং বাড়িগুলো ধ্বংসের জন্যে শহরই দায়ী।'

'ওরা বলবে জলটা আসে বৃষ্টি থেকে…'

'কই, বৃষ্টি তো শহরের কোনো বাড়িকে ধ্বংস করছে না ? করছে শুধু এই শহরতলির বাড়িগুলোকে। আসলে ওরা তোমাদের ঘাড় ভেঙে কর আদায় করছে, তোমাদের জীবন ও সম্পত্তিকে নষ্ট করছে, উলটে আবার তোমাদেরই রাস্তা সংস্কার করতে বাধ্য করাচ্ছে। যত্ত সব অপদার্থ !'

রাস্তার বাসিন্দাদের অর্ধেক লোক কুভালদার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে যতক্ষণ না বৃষ্টির জল বাড়িগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করার সংকল্প করলো। বাকি অর্ধেক লোক পৌর-কর্তৃপক্ষের কাছে একখানা দরখাস্ত লেখার জন্যে শিক্ষকের কাছে আর্জি পেশ করলো। সেই দরখাস্তে প্রস্তাবের প্রত্যাখানের যুক্তিগুলোকে এমন ন্যায়সংগত-

ভাবে দেখানো হলো যে কর্তৃপক্ষ রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠলেন। তখন তাদের ছাউনি ভাঙার পর যেসব রাবিশ পড়ে থাকে, সেগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলো এবং এইসব নিয়ে যাবার জন্যে দমকল-বাহিনীর পাঁচটা ঘোড়াও দেওয়া হলো। এই সুযোগে রাস্তার বাসিন্দারা নর্দমার একটা নলও বসিয়ে নিলো। এতে ফিলিপের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেলো।

একবার এদের হয়ে উনি খবরের কাগজে কি যেন লিখলেন। তার দুদিন পরেই দেখা গেলো ভাভিলভ মদ-বিক্রির জায়গাটার সামনে দাঁড়িয়ে একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে উপস্থিত প্রতিটি খদ্দেরের কাছে ক্ষমা চাইছে। 'হ্যাঁ, আমি নিজে মুখে আপনাদের সামনে স্বীকার করছি, সেদিন যে হেরিংমাছ কিনেছিলাম তা তেমন টাটকা ছিলো না, আর বাঁধাকপি···হ্যাঁ, সেগুলোও ছিলো একটু পোকায় কাটা। আর পাঁচজনের মতো আমিও লোভে পড়ে পাঁচটা পয়সা বাঁচাতে চেয়েছিলুম, নিজেকে ভেবেছিলুম খুব চালাক। কিন্তু না, আমার চেয়েও যিনি চালাক লোক, তিনিই সব এই কাগজে ফাঁস করে দিয়েছেন। ফলে আশা করি আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো অভিযোগ নেই···'

এই স্বীকারোক্তির পরে লোকের মনে ভাভিলভের সম্পর্কে যেমন ভালো ধারণা জন্মালো, তেমনি শিক্ষকের জনপ্রিয়তাও অত্যন্ত বেড়ে গেলো, আর রাস্তার বাসিন্দারাও লক্ষ্য করলো সংবাদপত্রের অভিমত কি ভাবে তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ওদের জীবনে এই ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমন বহুবার ঘটেছে, বাড়ি-রঙকরা মিস্ত্রি ইয়াশকা তুরিনকে উনি হয়তো বললেন, 'ইয়াকভ, কালও আমি তোমায় স্ত্রীকে ধরে মারতে দেখেছি।'

সরাইখানার সবাই এই বুঝি একটা হাতাহাতি লেগে যাবে এমনি একটা আশঙ্কায় চুপচাপ বসেছিলো, কেননা দুগোলাস ভদকা টানার পরেও বেপরোয়া ইয়াকভের মেজাজ ছিলো সপ্তমে চড়ে। তবু সে শান্ত গলায় জিগেস করলো, 'আপনি আমাকে দেখেছিলেন বুঝি? তখন আপনার কেমন লাগছিলো?'

এতে চারদিকে চাপা হাসির রোল পড়ে গেলো।

'না, আমি ওটা ঠিক পছন্দ করি না।' শিক্ষকের উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠস্বরে সবাই থমকে গেলো। অন্যমনস্ক ভাবে আঙুল দিয়ে টেবিলে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে উনি বললেন, 'আর কেন পছন্দ করি না, সেটাও খুব স্পষ্ট। একবার ভালো করে ভেবে দ্যাখো ইয়াকভ, এতে তোমারই কত ক্ষতি হতে পারে। তোমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। কাল রাতে তুমি তাকে মেরেছিলে বুকে আর পাঁজরায়। তার মানে তুমি কেবল তাকেই মারোনি, মেরেছো তার পেটের সন্তানটাকেও। এতে হয়তো বাচ্ছাটা মরে যেতে পারে, তোমার স্ত্রীও মারা যেতে পারতো কিংবা সাংঘাতিক রকমের অসুস্থ হয়ে পড়তো। তখন অসুস্থ একজন মহিলাকে দেখা-শোনা করা শুধু অসুবিধে বা বিরক্তিকরই নয়, ব্যয়সাধ্যও বটে। কারণ অসুখ হলেই ওষুধের দরকার, আর ওষুধ মানেই টাকার শ্রাদ্ধ। আর পেটের বাচ্ছাটা যদি নিতান্ত নাও মরে গিয়ে থাকে, পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাতে পারে। তখন সে বড় হয়ে ভারি কাজ করতে পারবে না বা ভালো শ্রমিক হতে পারবে না, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না। আর সে যদি চিররুগ্ন হয়ে জন্মায়, তাতেও তোমার ক্ষতি। পদে পদে

মায়ের কাজে সে তখন বাঁধা দেবে, সুস্থ রাখার জন্যে সারা জীবন তোমাকে ওষুধ কিনতে হবে। তাহলে বুঝতেই পারছো, নিজের পায়ে তুমি কিভাবে কুড়ুল মারছো। কঠিন পরিশ্রম করে যাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তাদের বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যবান হওয়া দরকার এবং তাদের সন্তানদেরও সুস্থ আর সবল হওয়া প্রয়োজন। কি, কথাটা ঠিক কি না ?'

'ঠিক !' সমবেত সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো।

'কিন্তু ওর এসব কিছু হতে পারে না,' চোখের সামনে ভয়ঙ্কর-সুন্দর যে ছবিটা শিক্ষক তুলে ধরেছিলেন, তাতে ভীত হয়ে ইয়াশকা বললো। 'ওর যেমন লম্বা-চওড়া শরীর, তেমনি জাঁদরেল স্বাস্থ্য। তাছাড়া আমার ধারনা বাচ্চাটার গায়ে আমি হাত দিইনি।' হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে ও চাপা গর্জন করে উঠলো 'আপনি জানে না, মগীটা যেমন হতকুচ্ছিত, তেমনি শয়তান···দিনরাত আমার হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে।'

'আমি বুঝি ইয়াকভ, তুমি তোমার স্ত্রীকে না মেরে থাকতে পারো না।' আবার শোনা গেলো শিক্ষকের সেই উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠস্বর।' 'আর তা করার হয়তো তোমার যথেষ্ট কারণও আছে। হয়তো তোমার স্ত্রীর স্বভাবের জন্যেই শুধু তাকে ওই রকম নির্মমভাবে মারো না, মারো তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখময় জীবনের জন্যে···'

'আপনি ঠিক বলেছেন।' ইয়াশকা চেঁচিয়ে উঠলো। 'চিমনি-মোছা ছেঁড়া কানির মতোই আমরা অন্ধকারে বাস করি।'

'জীবনের ওপর তিতি বিরক্ত হয়েই তুমি রাগ প্রকাশ করো তোমার স্ত্রীর, তোমার নিকটতম আত্মীয়ের ওপর। আর তুমি তাকে কষ্ট দাও শুধুমাত্র এই কারণে, যেহেতু তুমি তার চেয়ে শক্তিমান, যেহেতু সে তোমার মুঠোর মধ্যে থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। তাহলে বুঝতেই পারছো তুমি কি অবিবেচক ?'

তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করবো·· আমি তো মানুষ··'

'নিশ্চয়ই তুমি মানুষ···আর সেই জন্যেই তো বলছি, যদি তোমার স্ত্রীকে না মেরে উপায় না থাকে, তাহলে তাকে সাবধানে মেরো। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর বুকে, পেটে বা পাঁজরায় না মেরে এমন কোনো নরম জায়গায় মেরো যাতে তার সন্তানের কোনো ক্ষতি না হয়।

কথাটা শেষ করে বিষণ্ণ চোখে উনি এমনভাবে শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকালেন যেন অজানা কোনো অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছেন। আর শ্রোতাদের মনে তা রীতিমতো প্রভাব বিস্তার করলেও, ওদের কোনো বুঝতে অসুবিধে হলো না যে একদিন যিনি মানুষ ছিলেন, তাঁর নৈতিকতা তাদের নৈতিকতার চেয়ে কোনো অংশে কম বিবাদগ্রস্ত নয়।

'তাহলে, বুঝলে তো ভাই ইয়াকভ, স্ত্রীকে মারা কত অন্যায় ?'

ইয়াশকা বুঝতে পেরেছিল নিজের স্ত্রীকে মারার ব্যাপারে সতর্ক না থাকলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি। তাই সে চুপ করে রইলো। এবার রুটিওয়ালা মোকি, শিক্ষকেরই ভাবনাটাকে আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে উৎসাহিত হয়ে বললো, 'তারপর আরও দ্যাখো স্ত্রী কি ? না, স্ত্রী তোমার বন্ধু...অবশ্য ব্যাপারটাকে যদি আমরা সেই চোখে দেখি। আগেকার দিনের মতো তুমি আর তোমার স্ত্রী দুজনেই নৌকার শেকলে বাঁধা দুটি ক্রীতদাস। এক সঙ্গে না চললেই শেকলে টান পড়বে···'

'তুমি চুপ করো,' ইয়াশকা রেগে উঠলো। 'তুমিও তোমার বউকে ধরে মারো।'

'আমি কি বলেছি তাকে মারি না? তাকে মারি, যেহেতু সেটাই সবচেয়ে সুবিধে। তুমি কি মনে করো জীবন যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন আমি দেওয়ালে ঘুঁষি মারবো?'

'আমারও ঠিক ওই রকম মনে হয়।'

'উঃ, আমরা কি সংকীর্ণ আর জঘন্য জীবন যাপন করি। এর থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই।'

কে যেন রসিকতা করে বললো: 'ভাইসব, এবার থেকে বউকে ধরে যখন মারবে খুব সাবধান হয়ে মারবে, দেখো তার যেন কোথায় কোন ব্যাথা না লাগে।'

এমনিভাবে ভদকা খেয়ে ঝগড়া না বাধা পর্যন্ত ওরা অনেক রাত অব্দি আলাপ-আলোচনা করলো।

জানলায় বৃষ্টি আঘাত হানছে, বাইরে এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে। সরাইখানার ভেতরটা তামাকের গন্ধে ভরা, গরম। আর বাইরের পথটা নির্জন, হিমেল অন্ধকারে মোড়া। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আছড়ে পড়ছে জানলার গায়ে, যেন পথভ্রষ্ট কেউ ভেতরে আসার জন্যে পাগলের মতো দরজা ধাক্কাচ্ছে। কখনও হতাশায় গুমরে ওঠা হাহাকার নির্মম অট্টহাস্যের মতো মনে হচ্ছে, আর সূর্যহীন ছোট দিন, আসন্ন শীতের পদসঞ্চার এই ক্রুদ্ধ সংগীতে মানুষের মনগুলোকে ভরিয়ে তুলছে করুণ বিষণ্ণতায়। হ্যাঁ, শীত আসছে। খালি পেটে, জীর্ণ ছেঁড়া পোশাক পরে শীতের এই সুদীর্ঘ রাত ঘুমিয়ে ওঠা খুবই কঠিন।

অশুভ এইসব বিষণ্ণ ভাবনা পথের বাসিন্দাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতো এক প্রবল বিতৃষ্ণা আর 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' দীর্ঘশ্বাসে তাদের কপালে পড়তো গভীর বলিরেখা, যাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতো কর্কশ, পরস্পরের প্রতি আচরণ হয়ে উঠতো রুক্ষ। দুর্ভাগ্যের হাতে মার-খাওয়া এইসব মানুষগুলো ক্রোধে হয়ে উঠতো হিংস্র। আর শঠ প্রবঞ্চক ভাভিলভের কাছে তাদের জিনিসপত্র বাঁধা রাখতে রাখতে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিঃশেষ হয়ে যেতো, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মদ খেয়ে মাতলামি করতো, আর এই ঘৃণ্য জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে নির্মম শীতের আশঙ্কায় নিরুদ্ধ ক্রোধে হতাশায় বেদনা ক্লিষ্ট মনে শরতের দিনগুলো কোনো রকমে যাপন করে যেতো।

ঠিক এমন কোনো মুহূর্তে কুভালদা তাঁর দার্শনিকতায় দুটি বাহু প্রসারিত করে দিতেন ওদের দিকে। 'হতাশ হয়ো না, ভাইসব। সব জিনিসেরই শেষ আছে, আর এটাই হচ্ছে জীবনের প্রধান রীতি। শীত কেটে যাবে, গ্রীষ্ম আসবে. চমৎকার ঝরঝরে দিন! ওই যে কথায় বলে না, তখন চড়ুইয়েরাও পেট ভরে মদ খেতে পাবে।' কিন্তু শুধু কথায় কোনো কাজ হয় না, সবচেয়ে নির্মল জলও বুভুক্ষু মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না।

ডিকন তারাস বরং বন্ধুদের তার স্বরচিত গান ও গল্প শুনিয়ে কুভালদার চেয়ে অনেক বেশি সফল হতো এবং অধিকাংশ সময়েই তা শেষ হতো উন্মত্ত বেপরোয়া পানোৎসবের মাধ্যমে। ওরা তখন হাসতো, গান গাইতো, নাচতো, কয়েক ঘণ্টার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে যেতো। কিন্তু তার পরেই জীবন আবার ভরে উঠতো বিষণ্ণ হতাশায়। সরাইখানায় টেবিলের ধারে, তামাকের ধোঁয়া আর ম্লান আলোয় অলস রুক্ষ মূর্তিতে বসে ওরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করতো, কান পেতে শুনতো বাতাসের দুরন্ত গর্জন আর মনে মনে ভাবতো

প্রচুর মদে যদি তার চেতনাগুলোকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া যেতো।

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের মন তখন ভরে উঠতো ক্রুদ্ধ হতাশায় আর সবাই তখন তামাম এ দুনিয়ার বিরুদ্ধে পোষণ করতো এক অসীম ঘৃণা।

এ পৃথিবীতে সবই আপেক্ষিক এবং একটা মানুষ এমন কোনো খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারে না, যার থেকে আরও খারাপ হওয়া সম্ভব।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিনে আরিসতিদ কুভালদা ভাড়াটে শোবার ঘরের সামনের বেঞ্চিতে বসে ভাভিলভের সরাইখানা গায়ে বণিক পেতুনিকভের যে পাথরের ইমারতখানা তৈরী হচ্ছে, গভীর চিন্তাচ্ছন্ন মনে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইমারতটা তখনও শেষ হয়নি, সাবানের কারখানার জন্যে সেটা তৈরি হচ্ছে। বাড়িটার সারা গায়ে বাঁধা হিজিবিজি বাঁশের ভারা আর দরজা-জানলার জন্যে শূন্য গহ্বরগুলো যেন সেনাধ্যক্ষের চক্ষুশূল।

রক্তের মতো লাল সদ্য রঙ-করা বাড়িটাকে হঠাৎ দেখলে মনে হতো বিরাট একটা যন্ত্র-দানব যেন তার বুভুক্ষু চোয়ালদুটোকে উন্মুক্ত করে রেখেছে। ভাভিলভের শেওলা-ধরে কাঠের ছাদখানা একপাশে হেলে পড়েছে পাকা দেওয়ালের গায়ে, যেন ওটা একটা পর-গাছা। কুভালদা ভাবছিলেন পেতুনিকভ নিশ্চয়ই পুরনো বাড়িগুলো ভেঙে আবার নতুন ইমারত তুলবে আর তখন ওরা নিশ্চয়ই ভাড়াটে-শোবার ঘরটাকে বাদ দেবে না। আর একটার খোঁজ করতে হবে। কিন্তু এত সস্তায় আর এ রকম সুবিধের ঘর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কোনো ব্যবসায়ীর মাথায় বাতি আর সাবান তৈরির মতলব ঢুকেছে বলে যে-লোকটা দীর্ঘদিন কোথায় অভ্যস্ত হয়ে ছিলো, তাকে হঠাৎ সে-জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে, এটা খুবই দুঃখজনক। সেনাধ্যক্ষের মনে হলো ক্ষণিকের জন্যেও শত্রুর জীবনকে যদি কোনো রকমে বিষময় করে তুলতে পারতেন, ইস্, তাহলে কি আনন্দটাই না হতো!

গতকাল পেতুনিকভের ছেলে, ইভান আন্দ্রেভিচ আর একজন স্থপতি এসে ভাড়াটে-শোবার ঘরের উঠোনটা মাপজোপ করে এখানে ওখানে কয়েকটা কাঠের গোঁজ পুতে রেখে গেছে। ওরা চলে যাবার পরেই কুভালদার আদেশে উল্কা সেগুলোকে তুলে ফেলে দিয়েছিলো।

আচ্ছন্ন ভাবনায় কুভালদা যেন তখনও তাঁর চোখের সামনে বণিকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—আলখাল্লার মতো লম্বা কোট-পরা ছোটখাটো শুকনো একটা চেহারা, মাথায় মখমলের টুপি, পায়ে ঝকঝকে মোম-পালিশ করা বুট। চোয়ালের হাড় বার-করা শীর্ণ মুখ, কাঠের গোঁজের ছুঁচলো পাকা দাড়ি, বলিরেখা-আকীর্ণ চওড়া কপালের নিচে অর্ধনিমীলিত উজ্জ্বল সর্তক একজোড়া চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা দুটো ঠোঁট…সব মিলিয়ে ওঁকে দেখতে ধূর্ত, লোভী আর একজন ভদ্র-বদমাইসের মতো।

'চুলোয় যাক ব্যাটা শিয়াল আর শুয়োরের সঙ্কর!' পেতুনিকভের সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাতের ঘটনাটা মনে পড়তেই কুভালদার চোয়ালদুটো আপনা থেকেই শক্ত হয়ে উঠে-ছিলো। সেদিন একজন নগর-উপদেষ্টার সঙ্গে বাড়িটা কিনতে এসে সেনাধ্যক্ষকে দেখে

ওঁর সঙ্গীকে জিগেস করেছিলেন, 'এই আবর্জনাটা কি তোমার ভাড়াটে ?'

সেইদিন থেকে, প্রায় দেড় বছর আগে, দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি কে কাকে সব চেয়ে বেশি অপমান করতে পারে। গতকালও গরম গরম কথায় ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে। স্থপতিকে ছেড়ে পেতুনিকভ এসেছিলেন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে অভিবাদনের ছলে, অর্থাৎ অভিবাদন নাও হতে পারে, এমনি ভঙ্গিতে জিগেস করলেন, 'কি ব্যাপার, এখনও ওত পেতে বসে আছেন ?'

'আপনিও তো চরে বেড়াচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে ?' মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে কুভালদাও একই ভঙ্গিতে জিগেস করলেন।

সেনাধ্যক্ষের দিকে ধূর্ত চোখে তাকিয়ে পেতুনিকভ জবাব দিলেন, 'চরা তো দূরে কথা, টাকায় পৃথিবী পর্যন্ত চষে ফেলে যায়। আসলে টাকা চায় ছুটতে, তাই আমিও তার লাগামটা দিয়েছি আলগা করে।'

'অর্থাৎ টাকাই আপনাকে নাকে-দড়ি দিয়ে ছোটায়, আপনি টাকাকে ছোটান না।' কুভালদার অদম্য ইচ্ছে হলো দিই ব্যাটার পেটে আচ্ছাসে এক ঘা কষিয়ে।

'ব্যাপারটার কি একই দাঁড়ালো না ? টাকায় সব হয়, কিন্তু কারুর তা না থাকলে…'

'বিবেক-বুদ্ধি থাকলে লোকে টাকা ছাড়াও বাঁচতে পারে। অবশ্য বিবেক-বুদ্ধি যখন শুকিয়ে যায়, সাধারণত টাকা আসে তখনই। আর যার যত বিবেক কম হবে তার টাকাও হবে তত বেশি।'

'ঠিক তাই। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যাদের টাকাও নেই, বিবেকেও নেই।'

'যৌবনে কি আপনিও ঠিক এমনটা ছিলেন না ?' কুভালদা ভালো মানুষের মতো জিগেস করলো।

'আমি ? হ্যাঁ।' অর্ধনিমীলিত চোখে পেতুনিকভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'উঃ, যখন যুবক ছিলাম তখন আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'আর পরিশ্রম করতাম কি রকম…'

'এবং অন্যদেরও নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতেন ?'

'অনেক ভালো-ঘরের ছেলেরাও আমার কাছে খাটতো, দয়া ভিক্ষে করতো।'

'তার মানে সরাসরি খুন না করে একটু একটু করে রক্ত শুষে নিতেন।'

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পেতুনিকভ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে নিলেন। 'আপনার কিন্তু সৌজন্য বোধের বড্ড অভাব। আপনি নিজে বসে রয়েছেন, অথচ আপনার অতিথি…'

'আপনাকে বসতে কেউ বাধা দেয়নি।'

'কিন্তু বসিটা কোথায় ?'

'মাটিতে। জঞ্জাল বইবার ক্ষমতা ওর অপরিসীম।'

'আপনি যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সেটা তো নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছি।' বাঁকা চোখে তাকিয়ে পেতুনিকভ টুপিটা মাথায় চড়িয়ে নিলেন। 'নাঃ, এরপর আর এখানে দাঁড়ানোর কোনো মানেই হয় না।'

বণিকটা যে তাঁকে ভয় করে এমনি একটা সুখকর ভাবনার মধ্যে কুভলদাকে রেখে

দিয়ে উনি চলে গেলেন। আর উনি যদি সত্যিই তাঁকে ভয় না করতেন তাহলে অনেক দিন আগেই এই ভাড়াটে শোবার ঘর থেকে তাঁকে উঠিয়ে ছাড়তেন। মাসে মাসে পাঁচ রুবল ভাড়াটা কোনো কারণই নয়। কুভালদা পাইপটা দাঁতে চেপে রেখে চোখ ঘোঁচ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন বণিকটা কারখানার চারধারে ঘুরছেন, কখনও মাকড়শার মতো ভারা বেয়ে তরতর করে উঠছেন, নামছেন। ইস, ব্যাটা রক্ত চোষাটা যদি একবার নিচে পড়তো ! কুভালদা বসে বসে নানা রকম ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ছবি কল্পনা করতে লাগলেন। গতকাল উনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন পেতুনিকভের পায়ের নিচের একটা তক্তা আলগা হয়ে গেছে, আর উনি উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়েও উঠেছিলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কিছুই ঘটলো না।

অন্যান্য দিনের মতো আজও দৈত্যের মতো বিশাল লাল বাড়িটা কুভালদার চোখের সামনে এমন দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন তার বুকের সমস্ত রক্ত শুষে নিচ্ছে, আর দেওয়ালের গায়ে শূন্য গহ্বরগুলো তাকে বিদ্রূপ করছে। সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে সারা বাড়িটা। মনে মনে বাড়ির দেওয়ালগুলোকে পরিমাপ করতে করতে কুভালদা প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফেটে পড়লো। 'চুলোয় যাগ্‌গে ! যদি শুধু...'

কথাটা মনে হতেই চকিতে উনি বিদ্যুত-বেগে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ছুটলেন ভাভিলভের সরাইখানায়। ভাভিলভ বন্ধুর মতো তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। 'হুজুরের সু-স্বাস্থ্য কামনা করি।'

মাঝামাঝি গড়ন বিরল পাকা চুলের মাঝখানে চকচকে খানিকটা টাক, দাঁত-মাজা ব্রুশের মতো খোঁচা খোঁচা গোঁফ। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন. পরনের চামড়ার জ্যাকেট, আর তার প্রতিটা চলা-ফেরায় দেখাতো সে যেন একজন বৃদ্ধ সার্জেণ্ট।

কুভালদা অস্থির হয়ে জিগেস করলো, 'ইগরকা, তোমার কাছে এই সম্পত্তিটার একটা নকশা আছে না ?'

'আছে।' ছোট ছোট সন্দিগ্ধ চোখে ভাভিলভ কুভালদার মুখের দিকে তাকালো।

'ওটা একবার দেখি।' টেবিলের ওপর ঘুঁষি মেরে উনি সামনের টুলটা টেনে নিয়ে বসলেন।

'কিন্তু, কেন বলুন তো ?' কুভালদার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভাভিলভ মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলো।

'আরে দ্যাখওই না গাধা কোথাকার।'

ভ্রূ কুঁচকে ছাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ভাভিলভ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতে ভাবতে বললো, 'তাই তো, আমার কাগজগুলো যেন কোথায় রেখেছি !'

'ন্যাকামি করো না।' কুভালদা চিৎকার করে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন বুড়ো সৈনিকের মতো দেখালে কি হবে, ব্যাটা একটা পাকা শয়তান।

'হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, আরিসতি ফোমিচ। যখন এই সম্পত্তিটা দখল নিই, তখন থেকেই সেগুলো জেলা আদালতে রয়ে গ্যাছে।'

'বাজে বোকো না, ইগরকা ! তোমার লাভের জন্যেই নকশাটা দেখতে চেয়েছিলাম। চাই কি এর জন্যে তুমি কয়েকশো রুবল হাতিয়েও নিতে পারতে বুঝলে ?'

ভাভিলভ ব্যাপারটা কিছুই বুঝলো না কিন্তু সেনাধ্যক্ষ এমন গম্ভীর আর প্রত্যয়ের স্বরে কথাগুলো বলে গেলেন যে সরাইওয়ালার চোখদুটো কৌতূহলে চকচক করে উঠলো এবং কাগজগুলো দেরাজে আছে কিনা খুঁজে দেখার জন্যে ভাঁটিখানার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। মিনিট দুয়েক পরে কাগজগুলো নিয়ে আবার ফিরে এলো, মুখে বিমূঢ় বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। 'নাঃ, এগুলো বাড়িতেই ছিলো দেখছি।'

'ভাঁড় আর কাকে বলে!' কুভালদা ভর্ৎসনা না করে পারলেন না। নীল রঙের ফাইলটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভালো করে উলটে পালটে দেখলেন, তারপর সরাইওয়ালাকে অসীম কৌতূহলের মধ্যে রেখে, 'দাঁড়াও আসছি,' বলে ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ভাভিলভ ফাইলটা টাকাপয়সা রাখার বাক্সের মধ্যে রেখে চাবি দিয়ে তালাটা ঠিকমতো আটকেছে কিনা টেনে টেনে পরীক্ষা করে দেখলো। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে মাথার টাক চুলকতে চুলকতে কি যেন ভাবলো, তারপর বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখলো কুভালদা বাড়ির সামনেটা মাপছেন, পরপর দুবার মাপলেন। প্রথমে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হলেও, এখন যেন ফলাফল সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলেন। ভাভিলভের মুখখানাও বিস্ময়ে কুঁচকে গিয়াছিলো, এবার তা উজ্জ্বল হাসিতে ঝলমল করে উঠলো।

কুভলদাকে ফিরে আসতে দেখে ও জিগেস করলো, 'আপনি যা বললেন তা কি সম্ভব?'

'অবশ্যই সম্ভব। প্রায় আড়াই ফুটের মতো জায়গা ও তোমার সামনে থেকে মেরে দিয়েছে। তাও তো ভেতরটা এখনও মেপে দেখিনি।

'ভেতরটা আশি ফুট আছে।'

'তুমি তাহলে ধরতে পেরেছো?'

'নিশ্চয়, আরিস্তিদ ফোমিচ! কিন্তু আপনার চোখ কি, আমি শুধু তাই ভাবছি!'

এর কয়েক মিনিট পরেই দুজনকে মুখোমুখি বসে বেশ বড় একটা বিয়ারের বোতলের সদ্ব্যবহার করতে করতে সেনাধ্যক্ষকে বলতে শোনা গেলো, হ্যাঁ, 'কারখানার এদিকের দেওয়ালটা উঠেছে সম্পূর্ণ তোমার জায়গার ওপর দিয়ে। দেখো, আবার দাক্ষিণ্য দেখিয়ে বোসো না যেন। এক্ষুনি ফিলিপ এসে পড়বে, ওকে দিয়ে আদালতে একটা আর্জি লেখাবো। খেসারতের পরিমান খুব অল্প উল্লেখ করবো যাতে আমাদের স্ট্যাম্পের টাকা বেশি না লাগে, কিন্তু আমরা কারখানাটা ভেঙে ফেলার জন্যে প্রার্থনা জানাবো। গাধাটা দেখুক, পরের সম্পত্তির ওপর চড়াও হলে তার পরিনাম কি হয়। সত্যিই, তোমার বরাত বটে! ভেঙে আর আবার নতুন করে গড়তে ওর কাছে এক কানাকড়িও নয়, কিন্তু ও তা চাইবে না। ও চাইবে আপোষে একটা মিটমাট করে ফেলতে। তখন তুমি ওর ওপর চাপ দিতে পারবে। পরে অবশ্য আমাদের একটা হিসেব করে দেখতে হবে কারখানাটা ভাঙতে ওর কত খরচ পড়বে। বলা যায় না, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তো হাজার দুয়েক রুবলও পেয়ে যেতে পারো!'

'ও আদৌ দেবে বলে আমার মনে হয় না!' মুখে উদ্বিগ্নতার ভান করলেও লোভে ভাভিলভের কুতকুতে চোখদুটো তখন চকচক করছিলো।

'বাজে বোকো না ! ওর ঘাড় দেবে। একটু বুদ্ধি খাটাও ইগরকা, তাইলেই বুঝতে পারবে। সামান্য কটা টাকার জন্যে কারখানাটা ভেঙে ফেলার চাইতে ও বরং আমাকে হাত করার চেষ্টা করবে। তখন যেন আবার সস্তায় নিজেকে বিকিয়ে দিও না। আর যদি ভয় দেখায় তখন তো আমরা রয়েছি…'

উত্তেজনায়, অনাবিল এক আনন্দে সেনাধ্যক্ষের মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠলো, ভাভিলভের লোভকে উস্কে দিয়ে এবং অবিলম্বে কাজ শুরু করার উপদেশ দিয়ে উনি বিজয়গর্বে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যেবেলায় সবাইকে সেনাধ্যক্ষের আবিষ্কারের কথা জানানো হলো এবং যেদিন আদালতের পেয়াদা এসে পেতুনিকভের হাতে শমন ধরাবে, সেদিন বিস্ময়ে ক্রোধে ওঁর মুখের চেহারাখানা কি রকম দাঁড়াবে, ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল রঙিন ছবিটা নিয়ে সবাই আলোচনা করতে লাগলো। সেনাধ্যক্ষ নিজেকে ভাবতে লাগলেন একজন নায়ক। এজন্যে উনি খুশি, খুশি তাঁর বন্ধুরাও। ছেঁড়া পোশাক-পরা কালো কালো মূর্তিগুলো উঠোনে উল্লাসে হৈ-হল্লা করছে। বণিক পেতুনিকভকে ওরা সবাই চিনতো, প্রতিদিনই উনি তুচ্ছ অবজ্ঞায় অর্ধনিমীলিত চোখে ওদের সামনে দিয়ে চলে যেতেন, একবার ফিরেও তাকাতেন না। এমন কি ওর ঝকঝকে পালিস-করা বুট থেকেও যেন আভিজাত্য ঠিকরে পড়তো। এসব রীতিমতো ওদের উত্যক্ত করে তুলতো। ফলে আজ ওদের উল্লসিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বইকি ! এইসব মানুষগুলোর কাছে অন্ধ বিদ্বেষই একমাত্র আকর্ষণ, যাকে ওরা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে পারতো।

প্রায় দু সপ্তা ধরে নতুন কিছু ঘটার আশায় ভাড়াটে শোবার ঘরের বাসিন্দারা আকুল হয়ে অপেক্ষা করলো, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পেতুনিকভ কারখানা-বাড়িটার ধারে কাছেও ঘেঁষলেন না। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেলো উনি এখন শহরে নেই এবং আদালতের শমন তখনও ওঁর হাতে পৌঁছোয়নি। দেওয়ানি আদালতের এই ধরনের গড়িমসিতে কুভালদা রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং এই নগ্নপদ-বাহিনী বণিকটার জন্যে যেভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, তেমনটি আর কখনও কাউকে দেখা যায়নি।

'স্বপ্নেও সে কখনও আসার কথা ভাবে না, প্রিয়তম, স্বপ্নেও সে আমাকে ভালোবাসে না আর !' পাহাড়ের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে হাতের ওপর চিবুক রেখে ডিকন তারাস গান ধরেছে।

শেষে একদিন বিকেলের দিকে এলেন পেতুনিকভ। এলেন ভারি চমৎকার একখানা গাড়ি চড়ে। তাঁর ছেলে বসে রয়েছে কোচোয়ানের আসনে। তরুণ, সুন্দর স্বাস্থ্য, গালদুখানা লাল, গায়ে ডোরাকাটা লম্বা কোট, চোখে রঙিন চশমা। ভারার একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে তরুণ পকেট থেকে জমি-মাপার ফিতেটা বার করে বাবার হাতে দিলো, তারপর দু জনে নিঃশব্দে কারখানা-বাড়ির জমিটা মাপামাপি শুরু করে দিলো।

সেনাধ্যক্ষ অধীর আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে, এই তো দেখছি কাজ শুরু হয়ে গ্যাছে !'

ভাড়াটে-শোবার-ঘরে তখন যারা উপস্থিত ছিলো সবাই প্রবেশ পথের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে লাগলো।

সেনাধ্যক্ষ সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'তাহলে বুঝতেই পারছো চুরি করাটা কি বিশ্রী একটা বদ অভ্যেস। আর তার ফলে সে যতটা পায়, তার বেশি তাকে ছেড়ে দিতে হয়।' তাঁর এই কথায় সঙ্গীদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেলো।

তাদের গুঞ্জরিত হাসি-বিদ্রুপে উত্ত্যক্ত হয়ে পেতুনিকভ চিৎকার করে উঠলেন, 'এই ভেড়াগুলো, দাঁত বার করে এ রকম চেঁচাচ্ছো কেন ? সাবধান কিন্তু বলে দিচ্ছি, না হলে আমি তোমাদের পুলিসে দেবো।'

'সাক্ষী পেলে তবে তো···আপনার ছেলের সাক্ষী কোনো কাজেই লাগবে না।'

'তবু সাবধান বলে দিচ্ছি!' স্পষ্টই বোঝা গেলো পেতুনিকভ রেগে গেছেন। তাঁর ছেলে কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচল, নোংরা লোকগুলো যে পিতার পরাজয়কে আরও ঘোরালো করে তুলছে, সেদিকে তার নজরই নেই। এমন কি ওদের দিকে সে একবার ফিরেও তাকালো না।

তাই প্রতিটা কাজ, চলাফেরা লক্ষ্য করে হাড়ের থলে মন্তব্য করলো: 'নাঃ, ছোট মাকড়শাটার নিজেকে সংযত করার ক্ষমতা আছে।'

প্রয়োজনমতো মাপজোখের কাজ শেষ করে পেতুনিকভ নীরব ভ্রূকুটিতে তাঁর ছেলেকে কি যেন বললেন, তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। আর তাঁর ছেলে ইভান আন্দ্রেভিচ মন্থর পায়ে ভাভিলভের সরাইখানার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং দরজার কপাটদুটো পেছন থেকে বন্ধ করে দিলো।

'ওটাও একটা পাকা শয়তান। এর পরে কি ঘটবে আমি শুধু তাই ভাবছি।'

কুভালদার এই স্বগত সংলাপে হাড়ের থলে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললো, 'এর পরের ঘটনা খুবই সহজ, ও ব্যাটা ইগর ভাভিলভকে হাত করার চেষ্টা করবে।'

'আর তাতে তুমি খুশি হবে, তাই তো ?' কুভালদা থমথমে গলায় জিগেস করলেন।

চোখ বন্ধ করে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে পাভেল সানন্দে বললো, 'কেউ কোথাও ভুল করলে আমি সবসময়েই খুশি'।

সেনাধ্যক্ষ ক্রোধে মাটিতে থুতু ফেললেন। সবাই নীরবে সরাইখানার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো, আর তরুণ যেমন মন্থর পায়ে ভেতরে প্রবেশ করে ছিলো ঠিক তেমনি শান্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এলো। ওদের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে সে থমকে দাঁড়ালো, কোটের কলারটা ওপর দিকে তুলে দিলো, তারপর রাস্তায় নেমে শহরের দিকে এগিয়ে চললো।

কুভালদা খানিকক্ষণ তার গমন পথের দিকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাড়ের থলের দিকে ফিরে চাপাস্বরে বললো, 'বোধহয় তোমার কথাটাই ঠিক! আসলে তুমি হলে একটা কেন্নোর বাচ্চা, গন্ধ শুঁকেই বিপদের গন্ধটা ঠিক আঁচ করতে পেরেছো। ব্যাটা প্রবঞ্চকটার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, ও যা চেয়েছিলো তা পেয়ে গেছে... ইগরকা-ঘুঘুটা ওর কাছ থেকে কতটা বাগাতে পেরেছে কে জানে! নিশ্চয়ই কিছু বাগিয়েছে, ও-ও তো স্যায়না কিছু কম নয়! অথচ আমি যদি তোড়জোড় না করতাম··· না,

আজকে দিনে কাউকে বুঝতে পারাটা সত্যিই খুব কঠিন! হ্যাঁ, বন্ধু, কি করবো বলো, ভাগ্য আমাদের সবার বিপক্ষে।'

নিজের মনেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে সেনাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গীদের মুখের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন! ওরা সবাই যে রীতিমত হতাশ হয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেলো। কেননা এদের কাছে ভালো কাজে বিফল হওয়ার চাইতে কারুর কোনো ক্ষতি করতে পারলাম না, একথা জানার মতো দুঃখজনক আর কি হতে পারে।

'এখানে আমরা আর মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করছি কেন? এখানে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই…' সরাইখানার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে সেনাধ্যক্ষ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সুতরাং পেত্রুনিকভেন আস্তাকুঁড়ে এবার আমাদের শান্তিময় জীবনেরও অবসান ঘটবে বলে মনে হচ্ছে, এবং আমি আগেভাগেই তা আমার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করে রাখছি।'

মন্দ উপসংহার ম্লান ঠোঁটে হাসলো।

কুভালদা জিগেস করলেন, 'কি ব্যাপার, হাসছো যে বড়?'

'তাহলে আমি কোথায় যাবো?'

'ভাগ্য যেখানে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। এর জন্যে মিছিমিছি চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।' কথাটা বলতে বলতেই সেনাধ্যক্ষ ভাড়াটে শোবার-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন আর 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' মন্থরপায়ে তারা তাঁকে অনুসরণ করলো। 'সেই সঙ্কট-মুহূর্তটা না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে, তারপর যখন গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে, তখন অন্য কোনো আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ও কথা ভেবে মিছিমিছি মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। সংকটের মুহূর্তেই মানুষ হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। জীবনটা যদি একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু না হতো, যদি আমরা জীবনের জন্যে সারাক্ষণ এভাবে ভয়ে কেঁপে উঠতে বাধ্য না হতাম, তাহলে অবস্থাটা হতো আরও সুন্দর, উত্তেজনাময়, আর মানুষকেও তখন মনে হতো আগের চাইতে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক।'

হাড়ের থলে হাসতে হাসতে বললো, 'অর্থাৎ লোকে তখন পরস্পরের গলায় ছুরি বসাতে পারতো আরও সহজভাবে।'

'তার মানে! কি বলতে চাইছো তুমি?' ওর কথাটা সেনাধ্যক্ষের ঠিক পছন্দ হলো না।

'নাঃ, কিছু নয়। আপনি ঠিকই বলেছেন, কারুর যখন কোথাও তাড়াতাড়ি যাওয়ায় দরকার, তখন তার উচিত ঘোড়াটাকেই সবার আগে চাবকানো।'

'চুলোয় যাগ্‌গে তোমার তত্ত্ব-কথা। আমি শুধু চোখের সামনে পৃথিবীটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বা বিস্ফোরণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে, এইটুকু দেখতে পারলেই সবচেয়ে খুশি।'

'আপনি তো ভীষণ লোক মশাই!' হাড়ের থলে মুচকি মুচকি হাসলো।

'তাতে কি? একদিন আমি মানুষ ছিলাম; আজ আমি পরিত্যক্ত…তার মানে আজ আমার কোনো বন্ধন, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার মানে আমি যা খুশি তাই করতে পারি। বর্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিকতাই আমার অতীতকে ভুলতে বাধ্য করিয়েছে। যারা

ভালো খায় পরে তারা আমাকে অবজ্ঞার চোখে দ্যাখে, কেননা খাওয়া-পরার ব্যাপারে আমি তাদের চেয়ে অনেক নিচুস্তরের। তাই আমার মধ্যে নতুন কিছু জাগিয়ে তুলতে হবে, বুঝলে ? এমন একটা কিছু যা পেতুনিকভ বা তার সমশ্রেণীর লোকেরা, যারা জীবনের ওপর সর্দারী করে, তারা আমার জমকালো চেহারা দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপবে।'

'নাঃ, আপনার মুরোদ আছে দেখছি !' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো পাভেলের কণ্ঠস্বর।

'জীবনের তুমি কি বোঝো হে ছোকরা ? তার মর্ম কি জানো ?' কুভালদা অবজ্ঞাভরে চোখ পাকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন।' 'জীবনে কোন দিন চিন্তা করতে শিখেছো ? আমি শিখেছি, আমি জানি···আমি এমন সব বই পড়েছি যার একটা বর্ণও তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

'নিশ্চয়ই, কিছু কিছু জানি বইকি ! যেমন ধরুন জুতোর সাহায্যে কি করে ঝোল খেতে হয়···তবে, হ্যাঁ, আপনার মতো আমি পড়াশোনা করতে বা চিন্তা করতে শিখিনি, তবু আমার মনে হচ্ছে দুজনে এক সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই পাঁকের মধ্যে পড়েছি, পড়িনি কি ?'

'তুমি জাহান্নামে যাও !' কুভালদা চিৎকার করে উঠলেন। শিক্ষকটি উপস্থিত না থাকায় উনি নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। তবু কথাটা না বলে চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাই আলেক্সি ম্যাক্সিমভিচকে জিগেস করলেন, 'কি হে ঘুরন্ত লাটিম, তুমি কোথায় মাথা গুঁজবে কিছু ঠিক করেছো ?'

বুড়ো বনরক্ষক ভালো মানুষের মতো হাসলো। 'এখনও পর্যন্ত জানি না·· দেখি। আসলে আমি মাঝে মধ্যে একটু আধটু মদ পেলেই খুশি, তার বেশি আর কিছু চাই না।'

'বাঃ, একেই বলে সম্মানজনক দুর্ভাগ্য !' সেনাধ্যক্ষ তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করলেন।

একটুখানি চুপ করে থাবার পর বনরক্ষক মুখ খুললো, ওদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে আগে যেকোনো একটা জীবিকা খুঁজে নিতে পারবে, কেননা মেয়েরা তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। কথাটা মিথ্যে নয়, দুতিনটি বারাঙ্গনার যৎসামান্য উপার্জনই আজ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। তার বদলে ওরা তাকে মারতো, আর সে সেটা নির্লিপ্তের মতো সহ্য করতো। কেননা ওরা তাকে বেশি মারতো না, সম্ভবত অনুকম্পা দেখাতো। সে নিজে মুখেই স্বীকার করতো—নারীর প্রতি তার অত্যন্ত অনুরাগ এবং ওরা তার এই দুর্দশার একমাত্র কারণ। ওদের সঙ্গে যে তার মেলা মেশা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, সেটা প্রকাশ পেতো তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-আশাক আর ঘন ঘন অসুস্থতায়। একবার রাদিসৎ নামে একটা মেয়ে, লম্বা, রীতিমতো স্বাস্থ্যল চেহারা, সুন্দর দুটো চোখ, সব সময় মদে চুল চুল করতো, কোথায় যেন ধাত্রীর কাজ করে, কয়েকবার চুরির দায়ে সম্প্রতি মাস খানেক জেলও খেটেছে, পাহাড়তলির নিচে বনরক্ষককে ও তার কাছে থাকতেও বলেছিলো, কিন্তু বারঙ্গনোদের ছেড়ে আসার ভয়ে বুড়ো রাজি হয়নি।

লোলুপ চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাড়ের থলে বললো, 'দ্যাখো বুড়ো শয়তানটা কেমন মুচকি মুচকি হাসছে দ্যাখো।'

সত্যিই, আত্ম-তৃপ্তিতে বনরক্ষককের চোখের পাতাদুটো তখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। 'কেন হাসবো না বলো, মেয়েরা আমায় ভালোবাসে। আর আমি জানি কিভাবে তাদের মনে ফূর্তি জাগিয়ে তুলতে হয়।'

'তুমি জানো নাকি ?' কুভালদা অবাক হয়ে জিগেস করলেন।

'নিশ্চয়ই ! আর কোন মেয়ে যখন দয়া দেখাতে আরম্ভ করে, তখন দয়া পরবশ হয়ে সে তোমাকে মেরেও ফেলতে পারে। যাও, তার কাছে গিয়ে কেঁদে বলো তোমাকে খুন করতে···দেখতে, সে তোমাকে দয়া দেখাবে আবার মেরেও ফেলবে।'

কারা-রক্ষক মার্তিয়ানভ ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'আমারই তো খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

হাড়ের থলে ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসলো। 'কাকে ?'

'পেতুনিকভ, ইগরকা, কিংবা তোমাকে···ব্যাপরটা আমার কাছে একই !'

'কেন ?' কুভালদা জিগেস করলেন।

'এই ঘৃণ্য জীবন আমার আর ভালো লাগে না। সাইবেরিয়ায় পাঠালে অন্তত ওরা যেভাবে বলবে সেইভাবে বাঁচতে পারবো।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' মুখে বললেও কুভালদা মনে মনে কেমন যেন দমে গেলেন।

ওরা সবাই জানতো যে খুব শিগগিরই ওদের এই ভাড়াটে-শোবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এ নিয়ে ওরা আর মাথা ঘামালো না। বেলা শেষের আলোয় ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসে নানান বিষয়ে আলোচনা করলো এবং আলোচনা চালিয়ে যাবার মতো যেটুকু মনোযোগের প্রয়োজন কেবল সেইটুকুই মনোযোগ দিলো। কেননা চুপচাপ বসে শুনে যাওয়াটা যেমন দুর্বিসহ, তেমনি অমিত উদ্যমে আলোচনা করার মতো এত উৎসাহই বা ওদের কোথায় ? 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' তার দলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট—ওরা যেমন একে অন্যের চেয়ে ভালো কিনা সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো না, তেমনি অন্যের উৎসাহে কখনও বাঁধা দিতো না।

আগস্টের পড়ন্ত রোদ ওদের ছেঁড়া জামা-কাপড় আর উঠোনের আগাছার ওপর ঢেলে চলেছে নির্মম জ্বলন্ত উত্তাপ।

এদিকে ভাভিলভের সরাইখানায় যে দৃশ্যটির অবতারণা হয়েছিলো তা এই রকম।

তরুণ পেতুনিকভ ধীর মন্থর পায়ে ভেতরে প্রবেশ করে পেছন থেকে দরজার কপাটদুটো বন্ধ করে দিলো, মাথা থেকে টুপিটা খুলে অবজ্ঞা ভরে চারদিকে তাকালো, তারপর সরাই-ওয়ালাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে দেখে জিগেস করলো, 'আপনিই কি ইগর তেরেন-তিয়েভিচ ভাভিলভ ?'

'হ্যাঁ।' চকিতে এমনভাবে ও লাফিয়ে উঠলো যে আর একটু হলেই পড়ে যেতো।

'আপনার সঙ্গে দু একটা কথা আছে।'

'আসুন, আসুন ! দীনের ঘরের ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক। কি যে খুশি হলাম···'

দুজনে ভেতরের ঘরে গিয়ে বসলো। অতিথি বসলো গোল টেবিলের সামনের একটা সোফায় আর ভাভিলভ বসলো তার উলটো দিকের চেয়ারটায়। ঘরের এক কোণে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো ঝকঝকে বিরাট একটা প্রতিমূর্তির সামনে বাতি জ্বলছে। ঘরের চারদিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পেতুনিকভ ভাভিলভের বিনীত মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো, চোরের মতো ওর শঙ্কাতুর চোখের দৃষ্টিটা তার ভালোই লাগলো। মনে মনে

নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে আন্দ্রিচ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো, 'আমার মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাই ?'

ভাভিলভ সসম্ভ্রমে জবাব দিলো, 'মামলা সম্পর্কে তো ?'

'ঠিক তাই ! এবং শুনে সুখী হলাম যে অবান্তর আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আপনি সরাসরি কাজের কথায় এসেছেন।'

'আমি একজন সৈনিক।' ভাভিলভ যেন বিনয়ে গলে গেলো।

'সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। এখন আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বিনা ঝামেলাতেই মিটে যাবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'বাঃ ! একটা কথা আমি আপনাকে গোড়াতেই বলে রাখি—আইন আপনার পক্ষে এবং এ মামলাতে আপনি অবশ্যই জিতবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ !' হাসি গোপন করার জন্যে ভাভিলভ কুতকুতে চোখে তাকালো।

'কিন্তু একটা কথা বলুন তো, আপনার ভাবী প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে কেন আপনি আদালতের মাধ্যমে গেলেন ?'

ভাভিলভ কোনো জবাব দিলো না, কেবল কাঁধদুটো মৃদু ঝাঁকিয়ে তুললো।

'আপনি সোজা আমাদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলতে পারতেন…'

'নিশ্চয়ই, পারলে সেটা খুবই ভালো হতো · কিন্তু অন্যের পরামর্শ, বিশ্বাস করুন…'

'তার মানে কোনো আইনজ্ঞের পরামর্শেই আপনি এটা করতে বাধ্য হয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, অনেকটা সেই ধরনের।'

'ও ! তার মানে ব্যাপারটা আপনি শান্তিপূর্ণ উপায়েই মিটিয়ে ফেলতে চান ?'

'নিশ্চয়ই, সর্বান্তঃকরণে !'

তরুণ মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর হঠাৎ সরাইওয়ালার মুখের দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকালো। 'আচ্ছা, আপনি কেন তা চান ?'

ঠিক এমন কোনো প্রশ্ন ভাভিলভ আশা করেনি, তাই সেই মুহূর্তে জবাব দেবার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না। তাছাড়া তার মনে হলো প্রশ্নটা নিতান্ত অবান্তর। তবু নিজেকে একটু গুরুত্ব দিয়ে সে হাসার চেষ্টা করলো। 'দেখুন, ব্যাপারটা খুবই সহজ। প্রত্যেকেরই উচিত পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বাস করা।'

'কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় আপনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান, যেহেতু আমরা হবো আপনার উপকারী প্রতিবেশী। কেননা আমাদের কারখানায় কাজ করবে প্রায় দেড়শো শ্রমিক, পরে আরও বাড়বে। হপ্তায় মাইনে পেয়ে যদি একশো শ্রমিকও আপনার এখানে এক গেলাস করে মদ খেতে আসে, তার মানে আপনি এখন যা বেচেন ফি মাসে তার চাইতে আরও চারশো গেলাস করে বেশি বেচতে পারবেন। এটা আমি সবচেয়ে কম করেই ধরলাম। তার ওপর অন্যান্য খাবার তো আছেই। আপনি যখন আনাড়ি বা নির্বোধ নন, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা আপনার কি ধরনের উপকারী প্রতিবেশী হতে পারি।'

'তা সত্যি,' ভাভিলভ কোনো রকমে মাথা নাড়লো · 'আমি আগেই ভেবেছি।'

'বেশ, তাহলে ?'

'কিছু নয়···আসুন, বন্ধুত্ব করি।'

'বাঃ, আপনার এই দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্যে প্রশংসা না করে পারছি না! দেখুন, আদালত থেকে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেবার জন্যে আমি ইতিমধ্যেই এই খসড়াটা প্রস্তুত করেছি। এই দেখুন, পড়ে এটা সই করে দিন।'

যেন অপ্রীতিকর একটা কিছুর আভাস পাচ্ছে এমনিভাবে চোখ বড় বড় করে সরাই-ওয়ালা আন্দ্রিচের মুখের দিকে তাকালো। 'সই করবো ? মানে...'

'খুব সহজ', ফুটকি ফুটকি দেওয়া সই করার নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল দিয়ে আন্দ্রিচ বললো, এখানে শুধু আপনার নাম আর পদবীটা লিখে দিন। ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না।'

'না, সে কথা নয়.. জমিটার জন্যে আমি ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ করেছিলাম।'

'কিন্তু জমিটা আপনার কোনো কাজেই লাগছে না।'

'তবু ওটা আমার।'

'অবশ্যই আপনার এবং ওটার জন্যে আপনি কত চান ?'

তোষামদের সুরে আমতা আমতা করে ভাভিলভ বললো, 'ধরুন, দরখাস্তে যে টাকাটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে...'

'ছশো রুবল !' আন্দ্রিচ মিষ্টি করে হাসলো। 'নাঃ. আপনি ভারি মজার মানুষ।'

'কিন্তু আইন আমার পক্ষে, আমি দু হাজার রুবলও দাবি করতে পারি। বাড়িটা ভেঙে ফেলার জন্যেও জেদ ধরতে পারি ..আসলে আমি তাইই চেয়েছিলাম। সেই জন্যে এত কথা টাকার কথা উল্লেখ করেছি।'

'বেশ, থামলেন কেন, বলে যান। সম্ভবত আমরা তাইই করবো, ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করবো। তারপর এক সময়ে আমরা নিজেরা আপনার চাইতেও ভালো একটা হোটেল খুলবো, তখন আপনার দশা হবে পোলতাভায় সুইডেনের সেই লোকটার মতো। আর আপনার সর্বনাশটা যাতে ভালোভাবে হয়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমরা তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

দাঁতে দাঁত চেপে ইগর তেরেনতিয়েভিচ অতিথির দিকে তাকালো, তার মনে হলো আমার ভাগ্য এখন ওর হাতের মুঠোয়। এবং ডোরা কাটা লম্বা কোটপরা শান্ত সৌম মূর্তিটার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হচ্ছে ভেবে তার মন আত্ম-অনুকম্পায় ভরে উঠলো।

'এত কাছের প্রতিবেশী হয়ে আপনারই বরং লাভ হতো সবচেয়ে বেশি, আর আমরাও আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারতাম। যেমন ধরুন, আপনি এখনও তামাক রুটি দেশলাইয়ের একটা ছোট দোকান খুলতে পারেন···এগুলোর নিশ্চয়ই যথেষ্ট চাহিদা আছে।'

ভাভিলভ নীরবে শুনে যেতে লাগলো। চতুর বলে সে খুব সহজেই বুঝতে পারলো শত্রুর বদান্যতায় নিজেকে ছেড়ে দেওয়াটাই সবচেয়ে চমৎকার উপায়, এবং এটা তার গোড়া থেকেই করা উচিত ছিলো। এখন মনের সেই ইচ্ছাকে অন্যকোনো ভাবে প্রকাশ করতে না পেরে সে চাপা স্বরে কুলভদাকে ভর্ৎসনা করলো, 'তোমার মাথায় বাজ পড়ুক, তুমি জাহান্নমে যাও, ব্যাটা ধেড়ে মাতাল কোথাকার !'

'যে আপনার আবেদনপত্রটা লিখে দিয়েছিলো, আপনি কি সেই আইনজ্ঞের কথা বলছেন ?' শান্ত স্বরে আন্দ্রিচ জিগেস করলো। 'তাহলে বুঝতেই পারছেন, সে আপনাকে কি রকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।' ভাভিলভ হাতের তালু দিয়ে কপাল মুছলো। 'ওদের মধ্যে দুজন আছে। একজন যে এটা আবিষ্কার করেছে, আর একজন যে দরখাস্তটা লিখে দিয়েছে, ব্যাটা হতচ্ছাড়া সেই সাংবাদিকটা।'

'কোনো সাংবাদিক ?'

'যে খবরের কাগজে লেখে, আপনাদের বাড়ির একজন ভাড়াটে। ঈশ্বরের দোহাই, ডাকাতগুলোকে আপনি শিগগিরই বিদেয় করুন! ওগুলো যেমন বদমাইস, তেমনি শয়তান। রাস্তার সবাইকে ওরা উত্তেজিত করে তোলে, খোঁপিয়ে বেড়ায়, ওদের জ্বালায় শান্তিতে কেউ বাস করতে পারে না ··ওগুলো ··ওগুলো ভীষণ বেপরোয়া!'

'কিন্তু সাংবাদিকটি কে, আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না ?'

'ও একজন শিক্ষক ছিলো। পাঁড় মাতাল, মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছে···এখন কাগজে লেখে, লোকের আর্জি তৈরি করে দেয়। ব্যাটা একটা পাকা জোচ্চোর।'

'হুঁ! তাহলে উনিই আপনার আর্জি লিখে দিয়েছে ?'

'শুধু লিখে দেওয়া নয়, সবার সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়েছিলো আর বড়াই করে বলেছিলো—পেতুনিকভটাকে এবার কেমন ফ্যাসাদে ফেলেছি।'

'আ-চ্ছা! তাহলে ব্যাপারটা এখন আপনি মিটমাট করে নিতে চান ?'

'মিটমাট ? হ্যাঁ, তা চাই বইকি।' মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাভিলভ কি যেন ভাবলো। 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, জীবন কি রকম অন্ধকারময়!'

সিগারেট ধরিয়ে আন্দ্রিচ ছোট্ট করে জবাব দিলো, 'তাকে আলোকিত করুন।'

'আলোকিত! কিন্তু আপনি কি ভাবেন ব্যাপারটা এতই সহজ ? আপনি কি নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, আমি কি ভাবে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাই ? স্বাধীনভাবে চলাফেরা থেকে আমি বঞ্চিত। কিন্তু কেন জানেন ? ওই হতভাগা শিক্ষকটা আমার বিরুদ্ধে কাগজে লেখে···জরিমানা দিতে হয়। তার ওপর আপনার ভাড়াটেরা যেকোনো মুহূর্তে এসে আমার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, আমার সবকিছু লুটপাট করে খুন পর্যন্তও করতে পারে। ওরা পুলিসের ভয় করে না, বরং বিনা পয়সায় খেতে পাবে বলে জেলেই যেতে চায়।'

'ঠিক আছে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—যদি আপনার সঙ্গে একটা মিটমাট করতে পারি আমরা নিশ্চয়ই ওদের তাড়িয়ে দেবো।'

ভাভিলভ হঠাৎ জিগেস করলো, 'বেশ, আপনি কত দিতে চান ?'

'আপনিই বলুন।'

'যেটার উল্লেখ আছে, ওই ছশো রুবলই দিন।'

'একশো হলে হবে না ?' সোজাসুজি সরাইওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে পেতুনিকভ মুচকি মুচকি হাসলো। 'আমি কিন্তু তার একটা পয়সাও বেশি দেবো না।'

কথা বলে আন্দ্রিচ তার রঙিন চশমাটা খুলে ধীরে ধীরে মুছতে শুরু করলো। ভাভিলভ হতাশায় আর সম্ভ্রমে তার দিকে তাকালো। তরুণের শান্ত মুখের প্রতিটি রেখায় স্থির

আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় আভাস। কোনো চাল না দেখিয়ে বন্ধুর মতো ওর এই সরল সম্ভাষণ ভাভিলভের ভালো লাগলো, যদিও সে ভালো করেই জানে তরুণ হলেও পেতুনিকভ তার চেয়ে অনেক উঁচুস্তরের। তাই তার দিকে প্রসংসার চোখে তাকিয়ে মনে মনে সে কৌতূহল অনুভব করলো, এবং ক্ষণিকের জন্যে আলচ্য বিষয়টা ভুলে গিয়ে সে সসম্ভ্রমে জিগেস করলো, 'কোথায় আপনি লেখাপড়া শিখেছেন ?'

আন্দ্রিচ হেসে ফেললো, 'প্রাযুক্তিক শিক্ষায়তনে। কেন বলুন তো ?'

'না, এমনিই জিগেস করলাম।' একটু চুপ করে থাকার পর ম্লান স্বরে সে বললো, 'ভাবছি শিক্ষা কি আশ্চর্য জিনিস। আর বিজ্ঞান হচ্ছে আলো…এই আমাদের দিকেই চেয়ে দেখুন না কেন, দিনের বেলায় কেমন পেঁচার মতো বাস করি…যাগ্‌গে, ব্যাপারটা তাহলে দয়া করে মিটিয়ে ফেলুন।' যেন একটা স্থির সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে হঠাৎ হাতটা মেলে দিয়ে ও বললো, 'ঠিক আছে, আপনি বরং পাঁচশোই দিন।'

'একশোর এক পয়সাও বেশি আমি দেবো না, ইগর তেরেনতিয়েভিচ।'

যেন বেশি না দিতে পারার জন্যে দুঃখিত হয়ে আন্দ্রিচ কাঁধ ঝাঁকালো এবং সরাই-ওয়ালার লোমশ হাতখানা তার শুভ্র হাতে চেপে ধরলো। ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে গেলো, কারণ তরুণ পেতুনিকভের অটল ইচ্ছার কাছে ভাভিলভ বশ্যতা স্বীকার করলো। একশো রুবল নিয়ে ও কাগজটায় সই করে দিলো, তারপর কলমটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তিক্ত স্বরে বললো, 'এখন ওই গাঁটকাটাগুলোর সঙ্গে আসার সময়টা কাটবে বেশ ভালো ! ওরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।'

'আপনি বলবেন দাবী অনুযায়ী সব টাকা পেয়ে গেছেন।' পরপর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে আন্দ্রিচ সে-দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'কিন্তু আপনি কি মনে করেন ওরা বিশ্বাস করবে ? আপনি জানেন না, ওগুলো হাড়বজ্জাত, এমন কি তার চাইতেও খারাপ…'

মনের ভাবনাকে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করার আগেই ভাভিলভ দেখলো তরুণ উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ভবঘুরেদের বাসাটা ভেঙে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দারুণ অপমানকর একটা কিছু বলবে বলবে করেও বলতে না পেরে ভাভিলভ নিঃশব্দে দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিলো। আর তরুণ ধীর মন্থর পায়ে বারান্দায় সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে গেলো।

সন্ধ্যের দিকে সেনাধ্যক্ষ সরাইখানায় এলেন। থমথমে গম্ভীর মুখ, ভ্রূদুটো গভীর ভাবে কোঁচকানো। ভাভিলভ ওর দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো মৃদু হাসলো।

'এই যে, জুড়া আর কেনের উপযুক্ত বংশধর, এবার বলো তো দেখি…'

'সব মিটমাট হয়ে গ্যাছে।' চোখের পাতা নামিয়ে নিয়ে ভাভিলভ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না, কিন্তু কত দিয়েছে শুধু তাই বলো ?'

'চারশো রুবল।'

'যদিও মিথ্যে বলছো, তবু একদিক থেকে ভালোই। এখন কোনো কথা না বলে আমার আবিষ্কারের জন্যে শতকরা দশ ভাগ আর শিক্ষকের আর্জি লেখার জন্যে পঁচিশ রুবল ছাড়ো তো দেখি। আর আমাদের সবার জন্যে ভালো খাবার এবং এক জালা ভদকা

রাত্তির আটটার সময় পেলেই চলবে।

বিস্ফারিত চোখে কুভালদার দিকে তা[illegible]য়ে ভাভিলভ ভয়ে নীল হয়ে গেলো। 'এটা রীতিমতো ডাকাতি। এটা…এটা রাহাজানি! আমি কিছুতেই তা হতে দেবো না, আরিসতিদ কুভালদা। আপনি বরং খিদেটা পরবর্তী কোনো উৎসবের জন্যে তুলে রাখুন। আমি তাই চাই। তাছাড়া আমি…আমি এখন আর আপনাকে ভয় করি না…'

কুভালদা ঘড়ি দেখলেন। 'তোমার নির্বোধ কথাগুলো শেষ করার জন্যে আর দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে আমি যা চেয়েছি তা না পেলে তোমায় শেষ করে ফেলবো! মন্দ উপসংহার তোমার কাছে কিছু বিক্রি করেছে? বাসভে তুমি চুরির কথা কিছু পড়েছো? সুতরাং বুঝতেই পারছো, লুকোবার সময় তুমি পাবে না। আজ রাত্তিরেই আমরা…

ভাভিলভ ভয়ে ফঁকিয়ে উঠলো, 'আরিসতিদ ফোমিচ. দয়া করে…'

'চুপ, আর একটাও কথা নয়।'

চাপা স্বরে কথাগুলো বলা হলেও, শূন্য ঘরে গমগম করে উঠলো ভয়ঙ্কর সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। ভাভিলভ বরাবরই ওঁকে ভয় করতো, শুধু প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নয়, নতুন করে ওর হারাবার কিছু ছিলো না বলেও। অন্যান্য দিনের মতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ নয়, আজ উনি অবতীর্ণ হয়েছেন এক নতুন ভূমিকায়, যেন প্রকৃতই কোনো সেনাধ্যক্ষ, অপরের অপরাধ সম্বন্ধে যিনি দুর্মন. অনমনীয়। ভাভিলভ স্পষ্টই বুঝতে পারলো ওঁর এই ভয় দেখানোটা নিতান্ত ভাঁওতা নয়, উনি এই মুহূর্তে সানন্দে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। তবু ক্রোধে মরিয়া হয়ে ভাভিলভ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার সংকল্প নিলো। তাই গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃত্রিম বিনয়ের ভান করে বললো, 'লোকে ঠিকই বলে আরিসতিদ কুভালদা, মানুষ তার পাপ চেপে রাখতে পারে না। আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। যতটা চালাক আমি তার চাইতে বেশি চালাক হবার চেষ্টা করে-ছিলাম…বিশ্বাস করুন. মাত্র একশো রুবল পেয়েছি।'

'বলে যাও।'

'চারশো রুবলের কথাটা ঠিক নয়।'

'আমি জানি না কোনটে ঠিক কোনটে ঠিক, নয়। আমি তোমার কাছে পঁয়ষট্টি রুবল পাই, সেইটেই বড় কথা। এবং টাকাটা নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়, তুমি কি বলো?'

'আরিসতিদ ফোমিচ, আমি বরাবরই আপনার ইচ্ছে মতো কাজ করেছি, আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি। আর সেই আপনিই কিনা আজ…'

'ওসব বাজে কথা ছাড়ো, শয়তানের ডিম!'

'বেশ, ঠিক আছে! আমি আপনাকে তাই-ই দেবো। এর জন্যে ভগবান আপনাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন।'

'চুপ, ব্যাটা জুডার বাচ্চা!' সেনাধ্যক্ষের ভয়ঙ্কর চোখদুটো জ্বলে উঠলো।' 'তোর সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করে ভগবান ইতিমধ্যেই আমাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন…তোকে… তোকে আজ মাছির মতো মেরে ফেলবো।'

ঘুষি পাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ফিরে যাবার পর ভাভিলভ কুতকুতে চোখে সভয়ে ওঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। চিবুক বেয়ে ঝরে পড়লো দু ফোঁটা

অশ্রু, আর দু ফোঁটা হারিয়ে গেলো তার গোঁফের আড়ালে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাভিলভ দৌড়ে তার ঘরে বিশাল প্রতিমূর্তিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনও তার শীর্ণ বাদামী চিবুক চেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা।

বন-বাদাড় মাঠ-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো যার প্রিয়, সেই ডিকন তারাস 'একদিন যারা মানুষ ছিলো' তাদের কাছে প্রস্তাব করলো—গিরিখাদের মধ্যে প্রকৃতির কোলে বসে ভাভিলভের দেওয়া ভদকা পান করা যাক। কিন্তু সেনাধক্ষ্য আর অনেকের ইচ্ছানুসারে উঠোনেই পনোৎসবের আসর বসানো হলো।

'এক দুই তিন', কুভালদা গুনে দেখলেন। শিক্ষককে বাদ দিয়ে আমরা তেরোজন··· ধরে নিচ্ছি পরে আরও কয়েকজন বাড়তে পারে। কুড়িই ধরো। তাহলে মাথা-পিছু দাঁড়াচ্ছে আড়াইটে করে শসা, আধ সের রুটি, আধ সের মাংস আর এক বোতল করে ভদকা। তাছাড়া রয়েছে বাঁধাকপির টক, আপেল আর তিনটে তরমুজ। ব্যাপারটা মন্দ নয়, কি বলো ? তাহলে হে আমার বদমাইস বন্ধুগণ, এসো ভাভিলভের দেওয়া খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করি, কেননা এগুলো হচ্ছে ওর রক্ত-মাংস।'

মাটির ওপর জীর্ণ একটা কাপড় বিছিয়ে ওরা গোল হয়ে বসলো, শান্ত এবং পবিত্র ভঙ্গিতে খেতে শুরু করলো, কিন্তু মদের লোভ সংযত করতে না পারায় ওদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। বেলা শেষের পড়ন্ত আলোয় উঠোনে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে, বিদায়-সূর্যের শেষ রক্তিমাভাটুকু কাঁপছে ছাদের কিনারে। মৃদু হিমেল হাওয়া বইছে।

এক সময়ে কুভালদা হঠাৎ জিগেস করলেন, 'ফিলিপকে তো এখানে দেখছি না, তিন দিন আমি ওকে দেখিনি। তোমরা কেউ দেখেছো ?

'না !'

'কুছ পরোয়া নেই ! ওকে ছাড়াই চালিয়ে যাও,' মাঝখান থেকে কে যেন বললো। 'এসো, আমরা আরিসতিদ কুভালদার স্বাস্থ্য পান করি···উনিই একমাত্র বন্ধু যিনি জীবনে এক মুহূর্তের জন্যে আমাদের পরিত্যাগ করেননি। শয়তান ওঁর মঙ্গল করুক !'

হাড়ের থলে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলো : 'নাঃ, তোমার ঘটে বুদ্ধি আছে দেখছি !'

সেনাধ্যক্ষ গর্বিত চোখে সবার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না, কেননা উনি তখন খাওয়ায় রীতিমতো ব্যস্ত। প্রচুর পরিমাণে খাবার এবং দুবার মদ পেটে পড়ায় সবাই উল্লসিত হয়ে উঠলো। তারাসের দ্বিগুণ একটা গল্প শোনাবার মৃদু ইচ্ছা প্রকাশ করলো, কিন্তু ঘুরন্ত লাটিমের সঙ্গে স্থূলকায়া মেয়েদের চেয়ে শীর্ণকায়া মেয়েরা শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে ডিকনের তর্ক বাঁধায় সে আর কিছু বলতে পারলো না। কাছেই মাটির ওপর টান টান হয়ে শুয়ে উল্কা ডিকনের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলো আর মনে মনে একটা আনন্দ উপভোগ করছিলো। কারা-রক্ষক মার্তিয়ানভ তার প্রকাণ্ড লোমশ হাতে হাঁটুদুটো চেপে ভদকার বোতলের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আর গোঁফজোড়াটা জিভ দিয়ে চেপে দাঁত দিয়ে কাটবার চেষ্টা করছে। হাড়ের থলে ত্যাপাকে খোঁপাবার চেষ্টা করছে।

'তোমার টাকাগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছো, সেই জায়গাটা আমি জানি।'

'ভালোই তো।'

'ওগুলো আমি একদিন ঠিক হাতাবো।'

'স্বচ্ছন্দে।'

মনের মতো শ্রোতা না পেয়ে কুভালদা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। 'মাস্টারটা যে কোথায় গেলো আমি শুধু তাই ভাবছি।'

গোঁফজোড়াটা ছেড়ে দিয়ে মন্দ উপসংহার বললো, 'এসে পড়বে শিগগিরই।'

'তা তো বটেই, তোমার মতো ও তো আর জেলখানার বাস্তুঘুঘু নয় যে ডানা মেলে উড়ে আসবে, এলে হেঁটেই আসবে! ঠিক আছে, তাহলে বরং তোমারই স্বাস্থ্য পান করা যাক। বলা যায় না, যদি কখনও কোনো ধনীকে খুন করো, তাহলে আমাকে আধাআধি বখরা দিও ভাই, সোজা আমেরিকায় চলে যাবো। লিমপাস, পামপাস, কি সব যেন বলে? আমি সেইসব জায়গায় ঘুরে বেড়াবো আর যতদিন পর্যন্ত না যুক্তরাস্ট্রের রাষ্ট্রপতি হই, ততদিন পর্যন্ত খুব খাটবো। তারপর বিরাট একটা যুদ্ধে পৃথিবীর চেহারাটাকে পালটে দেবো। তখন আমি গোটা একটা সৈন্যবাহিনীকেই কিনে ফেলবো...ফরাসী, জার্মান, তুর্কীদের ডেকে বলবো তাদের আত্মীয়-স্বজনদের খুন করতে, ঠিক যেমন ইলিপ মরমেজ তাতাদের লাগিয়েছিলেন তাতাদের বিরুদ্ধে। টাকা দিয়ে ইউরোপকে ধ্বংস করে ফেলা আদৌ অসম্ভব নয়। তখন বিশ্বাসঘাতক পেতুনিকভটাকে আমার খানসামা বানাবো...মাসে মাসে একশো রুবল মাইনে দেবো...না, ও ব্যাটা তখন চুরি করতে শুরু করবে...'

'তাছাড়া মোটা বউয়ের চেয়ে রোগা বউয়ের আর একটা সুবিধে হচ্ছে, তার খরচ অনেক কম।' ডিকন তখনও ঘুরন্ত লাটিমকে তার স্বমতে আনার চেষ্টা করছে। 'আমার প্রথম বউয়ের জন্যে কাপড় লাগতো দশ হাত, আর দ্বিতীয় বউয়ের জন্য লাগতো আট হাত। খাবারের ব্যাপারটাও তাই।'

বণ-রক্ষক রেগে গেলো। 'আমারও বউ ছিলো রোগা, কিন্তু খেতো অনেক বেশি, আর মাগীটা মরলো ওই বেশি খেয়েই।'

'মিথ্যা কথা।' হাড়ের থলে প্রতিবাদ করলো। 'তুমি তাকে মেরেছো বিষ খাইয়ে।'

'মাইরি বলছি, ও মরছে স্টারজন মাছ খেয়ে।'

'না, বিষ খাইয়ে।' তীক্ষ্ণ স্বরে হাড়ের থলে হুঙ্কার ছাড়ালো।

হয়তো একটা লঙ্কাকাণ্ডই বেঁধে যেতো, যদি না ঠিক সেই সময়ে ডিকন ঘুরন্ত লাটিমের পক্ষ নিয়ে বলতো, আমি জানি ওকে ও বিষ খাওয়ায়নি। তা ছাড়া বিষ খাওয়ানোর কোনো কারণও ছিলো না।'

'আমি বলছি ওকে ও বিষ খাইয়েছিলো।' হাড়ের থলেও সহজে ছাড়লো না।

'চুপ!' তিরিক্ষি মেজাজে সেনাধ্যক্ষ এক ধমক লাগালেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে সঙ্গীদের আধ-মাতাল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে রাগের তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে উনি মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। উল্কা শুয়ে শুয়ে শসা চিবোচ্ছে, তার দু গাল বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে। মার্তিয়ানভ যেমন বসেছিল ঠিক তেমনি ভাবে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো বসে নির্নিমেষ

চোখে আধ-খালি বোতলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাটির দিকে তাকিয়ে ত্যাপ্স নড়বড়ে দাঁতে একমনে এক টুকরো মাংস চিবিয়ে চলেছে। হাড়ের থলে উপুড় হয়ে শুয়ে খক খক করে কাশছে, আর কাশির দমকে তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠছে। অবশিষ্ট ছেঁড়া পোশাক-পরা নীরব কালো কালো মূর্তিগুলোকে দেখাচ্ছে হিংস্র একপাল পশুর মতো, যেন ওরা মানুষ নয় মানুষের একটুকরো জ্বলন্ত বিদ্রূপ।

কারা-রক্ষককে জড়িয়ে ধরে ডিকন গুনগুন করে গান ধরলো। তারাসের দ্বিগুণ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। আকাশে জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র। পাহাড়ের মাথায় আর নিচে শহরের বুকে দুলছে লণ্ঠনের টিপটিপ আলো। নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে স্টীমারের বাঁশির করুণ শব্দ। মাথার ওপরে নিঃসঙ্গ ভারি মেঘগুলো একা একা ভেসে চলেছে। পাশ থেকে কে যেন ডিকনের বোতলটা ছিনিয়ে নিজের গলায় খানিকটা ঢক ঢক করে ঢেলে দিলো। কেননা ডিকন তখন বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে মৌজে সুর তুলছিলো : 'ও ন-দী-রে-এ-এ-এ...'

'একদিন যারা মানুষ ছিল' তাদের মধ্যে কেবল একজনই নাক ডাকাচ্ছে, বাকি সবাই তেমন মাতাল না হওয়ায় হয় পান করছে, নয়তো নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। এমনি কোনো উৎসবের দিনে এতখানি করে ভদকা নিয়ে ওদের পক্ষে মন-মরা হয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক, তবু কিসের যেন অভাবে আজকের মাইফেলটা ঠিক জমলো না।

'চুপ, চুপ কর তো সবাই।' ভালো করে কান পেতে সেনাধ্যক্ষ কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন। 'ভাড়াটে-ঘোড়ার গাড়ি করে কে যেন আসছে বলে মনে হচ্ছে...'

এত রাত্তিরে খানা-খন্দভরা এমন বিশ্রী পথে ভাড়াটে-ঘোড়ার গাড়ি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সবাই মাথা তুলে কান খাড়া করে রইলো। রাত্রির নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে চাকার ঘড়ঘড় শব্দ। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কে যেন ফিসফিস করে বললো, 'এই দিকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই পুলিস।'

'তুই থামতো।'

কুভলদা উঠে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'এটা কি পেতুনিকভের ভাড়াটে শোবার ঘর?' কে একজন জিগেস করলো।

'কেন, কি চাই কি?' সেনাধ্যক্ষ রুক্ষ স্বরে পালটা আক্রমণ চালালেন।

'টিটভ নামে কোনো সাংবাদিক কি এখানে থাকতেন?'

'কেন, আপনি কি তাকে এনেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'মাতাল?'

'না, অসুস্থ।'

'তার মানেই মদে চুর হয়ে আছে। কই, কোথায় দেখি।'

'দাঁড়ান, আপনি একা পারবেন না। উনি খুবই অসুস্থ। গত দুদিন আমার ওখানে

ছিলেন। না, আপনি বরং বগলের নিচে ধরুন···ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছেন।'

ত্যাপা ততক্ষণে ধীরে ধীরে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাড়ের থলে এই ফাঁকে আর এক গেলাস ভদকা হাতিয়ে নিলো।

সেনাধ্যক্ষ চিৎকার করে বললেন, 'একটা আলো নিয়ে এসো।'

উল্কা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে এলো। মুহূর্তের জন্য উঠোনটা আলোকিত হয়ে উঠলো। আগন্তুক, সেনাধ্যক্ষ আর ত্যাপা, তিনজনে মিলে শিক্ষককে কোনো রকমে শোবার ঘরে নিয়ে এলো। ওঁর মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে, পাদুটো আলতো করে লুটচ্ছে মাটিতে, হাতদুটো ভাঙা ডানার মতো ঝুলছে দুপাশে। তাকের ওপর শুইয়ে দিতেই কাঁপা কাঁপা গলায় উনি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

'আমরা একই পত্রিকায় কাজ করি। উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি বারবার অনুরোধ করলাম আপনি আমার এখানে থাকুন, একটু সুস্থ হয়ে উঠলে না হয় চলে যাবেন। কিন্তু উনি কিছুই শুনলেন না বাড়ির জন্যে এমন বিচলিত হয়ে উঠলেন যে বাধ্য হয়ে ওঁকে নিয়ে আসতে হলো, ভাবলাম যদি এতে ওঁর ভালো হয়! এটাই ওঁর বাড়ি তো?'

'আপনি কি মনে করেন এছাড়া আর অন্য কোথাও ওঁর বাড়ি আছে?' রুক্ষ স্বরে কথাটা বলে কুভলদা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 'ত্যাপা, আমাকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও তো।'

'আমার মনে হয় এখন আমাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

আগন্তুকের বিব্রত কণ্ঠস্বরে কুভালদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। গলা-পর্যন্ত বোতাম-আঁটা ঝকঝকে সার্ট, কয়েক দিন পরার ফলে পাজামাটা একটু কুঁচকে গেছে, শীর্ণ ক্ষুধার্ত মুখখানারই মতো মাথায় জীর্ণ দলামোচড়া একটা হলদে টুপি।

'না, আপনাকে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন হবে না। আপনার মতো আমাদের এখানে অনেকে আছে।' কুভলদা আবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

'তাহলে, বিদায়।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে কি ভেবে আগন্তুক আবার কোমল স্বরে বললো। 'ওঁর যদি কিছু হয়, আমার অফিসে একটা খবর পাঠাবেন···আমার নাম রিজলভ। আমি ছোট-খাট একটা মৃত্যু-সংবাদ লিখে দিতে পারি। হাজার হোক উনি সংবাদপত্রেরই একজন সক্রীয় কর্মী।'

'কি বললেন, মৃত্যু-সংবাদ? কুড়ি লাইনের জন্যে চল্লিশ কোপেক তো? আমি ওর চাইতে অনেক বেশি কিছু করবো। ও মরে গেলে ওর একটা ঠ্যাং কেটে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো, আপনারা তিন দিন ধরে বসে বসে চিবুতে পারবেন। বেঁচে থাকতে তো আপনারা সবাই মিলে ওকে খেয়েছেন, মরার পরেও তাই করবেন...'

অদ্ভুত ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগন্তুক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সেনাধ্যক্ষ শিক্ষকের পাশে কাঠের তাকের ওপর বসে ওঁর কপালে বুকে হাত দিয়ে দেখলেন।

'ফিলিপ?'

মৃদু স্বরে ডাকলেও শব্দটা প্রতিধ্বনি হলো নোংরা চার-দেওয়াল-ঘেরা ভাড়াটে-শোবার ঘরের বদ্ধ বাতাসে।

'ভারি অদ্ভুত তো!' শিক্ষকের এলোমেলো রুক্ষ চুলে হাত বোলাতে বোলাতে সেনাধ্যক্ষ ভ্রু কুঁচকে ওর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কি ভেবে ওঁর বুকে কান চেপে খানিকক্ষণ

চুপচাপ শুনলেন। অত্যন্ত দ্রুত তালে অসমান ভঙ্গিতে বুকটা ওঠা নামা করছে। লণ্ঠনের প্রকম্পিত ম্লান আলোয় দেওয়ালে কালো কালো ছায়াগুলো মৃদু কাঁপছে। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সেনাধ্যক্ষ সে-দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। ত্যাপা জল নিয়ে ফিরে এসে গেলাসটা শিক্ষকের মাথার দিকে রাখলো, তারপর ওঁর হাতদুখানা তুলে নিলো, যেন ভার আছে কিনা তা অনুমানে বোঝার চেষ্টা করছে।

'জলের আর দরকার হবে না।'

বৃদ্ধ কাগজ-কুড়নোওয়ালা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'হ্যাঁ, একজন পাদ্রীর দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'না, তারও কোনো নেই।' সেনাধ্যক্ষ চাপা স্বরে যেন গর্জে উঠলেন।

দু জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ শিক্ষককের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এক সময়ে কুভালদাই প্রথম নীরবতা ভাঙলেন। 'চলো বুড়ো শয়তান, আমরা পান করি।'

'আর ইনি ?'

'তুমি ওর কিচ্ছু ভালো করতে পারবে না।'

দুজনে ফিরে আসার পর হাড়ের থলে তীক্ষ্ণ নাক উঁচিয়ে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার ?'

'কিছু নয়, ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।' সেনাধ্যক্ষ ছোট্ট করে জবাব দিলেন। তারপর আর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে ভদকার গেলাসটা তুলে নিলেন। হাড়ের থলে একটা সিগারেট ধরিয়ে গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। 'উনি নিশ্চয়ই জানতেন মৃত্যুর পর ওঁকে স্মরণ করার জন্যে আমরা অবশ্যই কিছু একটা করবো !'

কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপরেই শোনা গেলো একটা চাপা হাসি। ডিকন সোজা ওঠে বসে একহাতে কানের কাছে চেপে অন্য হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও ন-দী-রে-এ-এ-এ...'

হাড়ের থলে ধমক দিলো, 'এই, চেঁচাচ্ছো কেন ?'

সেনাধ্যক্ষ বললেন, 'ওর চোয়ালে একটা ঘুঁষি দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে।'

ত্যাপা খ্যানখ্যানে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই বোকা, কেউ যখন মরে তখন চুপ করে থাকতে হয়।'

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে, পৃথিবীর বুকে জড়িয়ে রয়েছে ভীষণ অন্ধকার। নাক ডাকার উৎকট আওয়াজ আর গেলাসের মৃদু ঠুং ঠাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেঘগুলো এত নিচে দিয়ে ভেসে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন দোতলা বাড়ির নড়বড়ে ছাদটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে ওদের ঘাড়ের ওপর।

'বন্ধুদের মধ্যে কেউ যখন মরতে বসে, তখন সত্যিই খুব খারাপ লাগে !' অস্ফুট স্বরে সেনাধ্যক্ষ বললেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কোনো জবাব দিলো না। ওঁর মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। 'তোমাদের মধ্যে ও-ই ছিলো সব চেয়ে ভালো লোক...সব চেয়ে বুদ্ধিমান আর ভদ্র...অথচ ওকেই আজ হারাতে হচ্ছে !'

ডিকন স্খলিত স্বরে বলল, 'তার জন্যে গান-না গাওয়ার কোনো মানেই হয় না।'

হাড়ের থলে চমকে লাফিয়ে উঠলো। 'তুমি চুপ করবে কিনা আমি শুধু তাই জানতে চাই!'

কারা-রক্ষক এবার মাথা তুলে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকালো। 'আমি ওর মাথাটা সত্যিই ভেঙে দেবো।'

'তুমি ঘুমোওনি?' অপ্রত্যাশিত কোমল স্বরে কুভালদা জিগেস করলেন। 'আমাদের শিক্ষকের খবরট তুমি শুনেছো?'

ঘরের মধ্যে থেকে এক ফালি আলো পড়েছে উঠোনে, সে-দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে মার্তিয়ানভ ঘাড় নাড়লো, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো সেনাধ্যক্ষের পাশে।

কুভালদা প্রস্তাব করলেন, 'এসো, আর এক গেলাস করে হয়ে যাক!'

ত্যাপা উঠে পড়লো। 'দেখি, ওঁর কিছু লাগবে কিনা।'

'একটা কফিন লাগবে।' অন্ধকারে কে যেন বললো।

'ছিঃ, ওভাবে বলে না!' উল্কাও ত্যাপার পেছন পেছন চলে গেলো।

ওরা চলে যাবার পর সেনাধ্যক্ষ কারা-রক্ষকের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'মার্তিয়ানভ··· আর সবার চেয়ে তোমায় মনটাই ভালো···ফিলিপ চলে গেলে তোমার খারাপ লাগবে না?'

'না।' একটু নিস্তব্ধতার পর মন্দ উপসংহার ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আজকাল ওসব আমার আর কিছুই মনে হয় না। জীবনটা এমন বিশ্রী একঘেয়ে হয়ে গেছে, যখন মুখে বলি তখন আমি সত্যি সত্যিই কাউকে খুন করতে চাই।'

'তাই কি!' কুভলদার যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না। 'নাও, আর এক গেলাস খাও।'

'আমাদের কাজটা ভারি মজার। প্রথমে এক গেলাস, তারপর আর এক গেলাস...'

ঘুরন্ত লাটিম হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো, তারপর গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে বললো, 'এই বুড়োটাকে আর এক গেলাস দাও মা-ই-রি!'

ওরা তার গেলাসটা ভরে দিতেই বন-রক্ষক প্রায় এক চুমুকে সবটা মেরে দিলো, তারপর আবার মাটিতে ঢলে পড়লো। কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঘুরন্ত লাটিমের পাটা তার গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিলো। শরতের ভুতুড়ে রাত্রিরই মতো একএকটু করে নিতল নিস্তব্ধতার পর কে যেন জিগেস করলো, 'কি বলছো?'

অন্য একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিসিয়ে বললো, 'বলছি লোকটা সত্যিই ভালো ছিলো।'

'হ্যাঁ, দুহাতে যেমন রোজগার করতো, বন্ধুদের দিতেও তেমনি কুণ্ঠিত হতো না।'

আবার সেই নিটোল নিস্তব্ধতা।

একটু পরে ত্যাপা ফিরে এলো। 'আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না।'

সেনাধ্যক্ষ উঠে ভাড়াটে-শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। ত্যাপা বাঁধা দিলো, 'মাতাল অবস্থায় এভাবে যাবেন। এটা ঠিক নয়।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে সেনাধ্যক্ষ কি যেন ভাবলেন, তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'এ দুনিয়ায় কোনটে ঠিক শুনি? চুলোয় যাগ্‌গে! ত্যাপাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিলেন।

ঘরের দেওয়ালে কালো কালো ছায়াগুলো কাঁপছে, যেন একটা আর একটাকে ধরার জন্যে ছুটছে। কাঠের তক্তার ওপরে শিক্ষক টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছেন, মৃদু ঘড় ঘড় শব্দ

হচ্ছে। চোখদুটো বিস্ফারিত, নগ্ন বুকখানা উঠছে নামছে, ঠোঁটের কোল বেয়ে গড়িয়ে এসেছে নীলচে ফেনা। বিকৃত কঠিন মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছে যেন অত্যন্ত জরুরী একটা কিছু বলতে চাইছেন, অথচ পারছেন না, আর তার জন্যে ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছেন। পেছনে দুহাত রেখে কুভালদা খানিকক্ষণ নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বন্ধুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। 'ফিলিপ! ফিলিপ আমাকে তুমি কিছু বলো...বন্ধুকে বন্ধুর কোনো সান্ত্বনা...শোনো, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি! আমরা সবাই পশু, আমাদের মধ্যে তুমিই ছিলে একমাত্র মানুষ.. প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি বুঝি মাতাল হয়েছো সত্যিই বিশ্বাস করো...ফিলিপ, ফিলিপ তুমি কথা বলছো না কেন?'

মৃত্যু নামক আগ্রাসী রহস্যময় বস্তুটি, জীবনের সঙ্গে যার ঘোর দ্বন্দ্ব, সে যেন মাতাল এই মানুষটা, উপস্থিতিতে অপমানিত হয়ে তার কঠিন কাজটাকে দ্রুত শেষ করে নিতে মনস্থ করলো। শিক্ষক টেনে টেনে কয়েকটা গভীর দীর্ঘশ্বাস নিলেন, অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠলো সারা শরীর, তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে প্রসারিত করে দিলেন। সেই মুহূর্তে সবকিছুই যেন এক সঙ্গে স্থির হয়ে গেলো। কুভালদা কেঁপে উঠলেন, তাঁর বুকের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় করে উঠলো।

'তুমি···তুমি কেন আমাকে কিছু ভদকা আনতে বললে না, ফিলিপ? আমি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসতাম···অবশ্য। তুমি যদি ভদকা না খেয়ে ভালো হয়ে উঠতে পারতে খুবই ভালো হতো। মোটের ওপর···তুমি ঘুমচ্ছো, ফিলিপ? তাহলে ঘুমোও। শুভরাত্রি, বন্ধু। তোমাকে আমি কাল সব খুলে বলবো, তখন দেখবে কেউ তোমাকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি। যদি তুমি মরে না গিয়ে থাকো তাহলে এখন ঘুমোও...'

টলতে টলতে উনি উঠোনে ফিরে এলেন, সবাই উদগ্রীব হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। একটু নিস্তব্ধতার পর উনি বললেন, ও ঘুমোচ্ছে না মরে গ্যাছে, আমি ঠিক জানি না·· আমি···আমি বোধ হয় একটু মাতাল হয়ে পড়েছি।'

স্বাভাবিকের চেয়ে আরও ঝুঁকে পড়ে ত্যাপা বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো। কারা-রক্ষক চুপচাপ মাটিতে শুয়ে পড়ে রইলো। হাড়ের থলে দুএকবার নড়েচড়ে চাপা স্বরে বললো, 'মরে গ্যাছে তো আমাদের কি? আমরাও সবাই একদিন মরবো।'

'তা সত্যি,' সেনাধ্যক্ষ ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন। 'সময় এলে সবাইকেই একদিন অন্য আর পাঁচজনের মতো মরতে হবে। সত্যিই কি অদ্ভুত! আমরা বাঁচবো অন্যভাবে অথচ মরবো একই ভাবে! আর জীবনের মূল লক্ষ্যটাই তাই! মানুষ বাঁচে মরার জন্যে .. আর তাই-ই যদি হয়, তাহলে আমরা কেমন ভাবে বাঁচলাম তাতে কিছুই এসে যায় না। কি মার্তিয়ানভ, তাই কিনা বলো? এসো, এখনও যখন বেঁচে আছি, আর এক গেলাস করে হয়ে যাক।'

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। উঠোনে ছড়ানো-ছিটোনো মদে আর ঘুমে অসাড় মূর্তিগুলো জমাট অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। ম্লান যে আলোর শিখাটা এতক্ষণ কাঁপছিলো, হয় বাতাসে নয়তো তেলের অভাবে সেটা নিভে গেছে। টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটার চড়বড় শব্দ হচ্ছে। অন্ধকার পাহাড়ের চূড়া থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে বিষণ্ণ ঘণ্টাধ্বনি। দূরে কোথাও যেন চৌকিদারের হাঁক শোনা গেলো। শব্দটা কেঁপে কেঁপে বাতাসে হারিয়ে যেতেই রাত্রির

নৈঃশব্দ আবার ভরে উঠলো করুণ বিষণ্ণতায়।

পরের দিন ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ত্যাপার ঘুম ভাঙলো সবার আগে। সূর্যকে ঘিরে আকাশে জড়িয়ে রয়েছে আর্দ্র হিমেল কুয়াশা, যেন সীমাহীন নীলিমার অতল থেকে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে একটা গভীর হতাশা। বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে ত্যাপা কনুইয়ের ওপর ভর রেখে চারদিকে তাকালো, দেখলো বোতলগুলো সব খালি। তখন হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্গীদের দেহ ডিঙিয়ে সে গেলাসগুলো পরীক্ষা করে দেখলো। সবকটাই খালি, কেবল একটা তখনও পরিপূর্ণ রয়েছে। চোখের নিমেষে সেটা সাবাড় করে দিয়ে সে জামার হাতায় মুখ মুছলো, তারপর সেনাধ্যক্ষকে নাড়া দিতে শুরু করলো।' 'উঠুন, উঠুন… আমাদের পুলিসে একটা খবর দিতে হবে।'

'কেন ? কিসের জন্যে ?' ঘুমটা হঠাৎ চটে যাওয়ায় কুভালদা রেগে উঠলেন।

'কেন, ওঁর মৃত্যুর খবরটা জানাতে হবে না ?'

'কার ?'

'মাস্টারের।'

'কে, ফিলিপ ? ও, হ্যাঁ।'

'হা ভগবান ! আপনি এর মধ্যেই সব ভুলে গ্যাছেন ?'

কথা না বাড়িয়ে সেনাধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর হাই তুলে নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। হাড়গুলো থেকে মট মট শব্দ হলো।

'যাও, থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে এসো।'

'আমি যাবো না, আমি ওদের একটুও পছন্দ করি না।'

'বেশ, তাহলে ডিকনকে জাগিয়ে দাও। আমি বরং ফিলিপকে একবার দেখে আসি।'

ভাড়াটে শোবার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে সেনাধ্যক্ষ শিক্ষকের পায়ের দিকে এসে দাঁড়ালেন। মৃত মানুষটা টান টান হয়ে পড়ে রয়েছে। বাঁ হাতটা রয়েছে বুকের ওপর, ডান হাতটা মাথার দিকে ঘোরানো। সেনাধ্যক্ষ ভাবলেন ফিলিপ যদি এখন উঠে দাঁড়ায় তাহলে সে ডিকন তারাসেরই মতো লম্বা হবে। দুজনে তিন বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছেন কথাটা মনে পড়তেই ওঁর বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

ত্যাপা ভেতরে ঢুকলো। 'উনি তাহলে মরে গ্যাছেন ? আমিও একদিন মরবো।'

'নিশ্চয়ই। এইটেই তার উপযুক্ত সময়।' সেনাধ্যক্ষ বিষণ্ণস্বরে বললেন।

'এবং আপনারও মরা উচিত, তাতে এর চাইতে ভালো কিছু…'

'হয়তো এর চাইতে মন্দও কিছু হতে পারে।'

'না, পারে না। মরে গেলে ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, কিন্তু এখানে বোঝাপড়া করতে হয় মানুষের সঙ্গে। আর এ পৃথিবীতে তাদের কোন মূল্যটা আছে বলুন ?'

'থামো, খুব হয়েছে !' ক্রুদ্ধ স্বরে ধমক দিলেন কুভালদা।

আধো অন্ধকারে এক-বুক গভীর নির্জনতা নিয়ে ভাড়াটে শোবার ঘরটা চুপচাপ পড়ে রইলো। আর ওরা দুজন মৃতের পায়ের কাছে নীরবে বসে মাঝে মাঝে মৃতের মুখের দিকে

তাকাচ্ছে, তারপরই আবার গভীর মগ্নতায় ডুবে যাচ্ছে।

হঠাৎ একসময়ে ত্যাপা জিগেস করলো, 'আপনি ও'কে কবর দেবেন তো ?'

'আমি ? না না। বরং পুলিসই ওকে কবর দিক।'

'কিন্তু আপনি দিলেই ভালো হতো। আর্জি লেখার জন্যে ভাভিলভের কাছ থেকে আপনিই ও'র টাকাটা নিয়েছেন। আপনার কাছে যথেষ্ট না থাকলে আমি কিছু দিতে পারি ..'

যদিও ওর টাকা আমার কাছেই আছে, তবু আমি ওকে কবর দেবো না।'

'এটা কিন্তু ঠিক নয়। মৃতের টাকাটা আপনি মেরে দিচ্ছেন, একথা আমি সবাইকে বলে দেবো।' ত্যাপা ভয় দেখালো।

কুভালদা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'আচ্ছা বুড়ো শয়তান তো তুমি !'

'না, শয়তান আমি নই। আপনিই বরং বন্ধুর মতো কাজ করছেন না।'

'খুব হয়েছে ! এবার কেটে পড়ো তো।'

'কত টাকা পেয়েছেন ?'

'পাঁচিশ রুবল।'

'তাহলে ওর থেকে পাঁচ রুবল আমাকে দিয়ে দিন।'

'ওরে ধেড়ে শয়তান, তুই তো বদমাস কম নয় !'

'বেশ, তাহলে আপনি টাকাট্টা দেবেন না ?'

'তুমি জাহান্নামে যাও। টাকাটা আমি ও'র স্মৃতিস্তম্ভের জন্যে খরচ করবো।'

'তার আর কি দরকার ?'

'আমি একখানা পাথরের ফলক আর একটা নোঙর কিনবো। কবরের পাথরের সঙ্গে ওটা শেকল দিয়ে আটকানো থাকবে। তখন সেটা ভারি হবে।'

'কিন্তু তাতে লাভটা কি হবে ?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'আমি কিন্তু সবাইকে বলে দেবো।'

সেনাধ্যক্ষ কটমট করে ওর দিকে তাকালেন, মুখে কিছু বললেন না।

'ওই, ওরা আসছে বলে মনে হচ্ছে !' ত্যাপা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এর কয়েক মিনিট বাদেই দরজার সামনে দেখা গেলো একজন তরুণ ডাক্তার, থানার দারোগা আর মৃত্যুর কারণ তদন্তকারী একজন বিচারককে। তিনজনেই এক সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে প্রথমে মৃতদেহটাকে দেখলো, তারপর সন্দিগ্ধ চোখে কুভলদার মুখের দিকে তাকালো। কুভালদা কোনো ভ্রূক্ষেপই করলেন না। দারোগা জিগেস করলেন, 'উনি কিসে মারা গ্যাছেন ?'

'সে-কথা ওঁকেই জিগেস করুন, তবে আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় অনভ্যাসের ফলেই মারা গ্যাছেন।'

বিচারক অবাক হয়ে জিগেস করলেন, 'কিসে মারা গ্যাছেন বললেন ?'

'আমি বলছি যে-অসুখে উনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তার সঙ্গে অভ্যস্ত ছিলেন না বলেই মারা গ্যাছেন।'

'উনি কি অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ?'

'ওঁকে বরং বাইরে বার করে নিয়ে আসুন, এত অল্প আলোয় আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।' এতক্ষণ পর এই প্রথম ডাক্তারের থমথমে ভরাট কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।' 'বলা যায় না, হয়তো শরীরে কোথাও আঘাতের চিহ্নও থাকতে পারে।'

'আপনি বরং বাইরে গিয়ে কাউকে বলুন এঁকে বার করে নিয়ে আসতে।' দারোগা কুভালদাকে হুকুম করলেন।

সেনাধ্যক্ষ নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'আপনার প্রয়োজন থাকে আপনি বলুন।'

ভয়ঙ্কর মুখ ভঙ্গি করে দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি যান !'

নাক কুঁচকে কুভালদা থুতু ফেললেন। 'আমার ভারি বয়েই গ্যাছে।'

'জানো. ···এর জন্যে তোমাকে আমি···' ক্রোধে দারোগার মাথার রক্ত তখন চড়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বরে সবাই ঘুরে তাকালো। দরজার সামনে দেখা গেলো পেতুনিকভের হাসি-হাসি মুখখানা। 'সুপ্রভাত, ভদ্রমহোদয়গন !' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে উনি যেন ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে সেনাধ্যক্ষের দিকে সোজা তাকিয়ে জিগেস করলেন, 'কি ব্যাপার, এখানে কোনো খুন-টুন হয়েছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, ওই ধরনের কিছু।' বিচারক জবাব দিলেন।

'হা, ঈশ্বর ! আমি যা ভয় করেছিলাম, তাই।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেতুনিক বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। 'যতবারই আমি এদের দিকে তাকিয়েছি, ভয়ে আমার বুক দুরদুর করে উঠেছে। প্রতিবারেই বাড়ি গিয়ে প্রার্থনা করেছি, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। অসংখ্যবার আমি এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বাড়িভাড়া নিতে অস্বীকার করেছি, কিন্তু পাছের ওই গোদাটার ভয়ে পারিনি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন···ওরা এমনই উৎশৃঙ্খল··· মনে মনে ভেবেছি, ওদের কথায় রাজি হওয়াই ভালো ··' দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে উনি আবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এরা সব ভয়ঙ্কর লোক, মশাই···ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি হলেন এই ডাকাত দলের সর্দার।'

'আমরাও ওকে চিনি,' হিংস্র চোখে তাকিয়ে দারোগা দাঁতে দাঁত ঘষলো। 'এবার ওকে শায়েস্তা করবো !'

কুভালদা সহজ গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে ঘোড়েল, কতবার তোর চোয়ালে ঘুঁষি মেরে মুখ বন্ধ করে দিয়েছি বলতো ?'

'শুনলেন, শুনলেন তো আপনারা সব ?' আহত বন্য পশুর মতো দারোগা চিৎকার করে উঠলেন।' 'ঠিক আছে, তোমায় সায়েস্তা কি করে করতে হয় আমি দেখছি !'

কুভালদা শান্ত স্বরে জিগেস করলেন, 'ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার আগে গোনাটা কি ঠিক হবে ?'

চশমা-চোখে তরুন ডাক্তার অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন। বিচারকটিও তাকিয়ে ছিলেন সতর্ক দৃষ্টিতে। পেতুনিকভ যেন বিজয়গর্বে চলকে উঠলেন। দারোগা ঘুঁষি পাকিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে ছুটে গেলেন ওঁর দিকে। ঠিক সেই সময় কারা-রক্ষক মার্তিয়ানভের ভয়ঙ্কর মূর্তিটাকে দেখা গেলো দরজার সামনে। নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়ালো

পেতুনিকভের পেছনে, ওঁর মাথাটা রইলো তার বুকের সমান্তরালে। তারপরেই বেঁটে গুড়গুড়ে চেহারা নিয়ে প্রবেশ করলো ডিকন তারাস, ফুলো কুতকুতে চোখদুটো তার জবা-ফুলের মতো টকটকে লাল।

এইসব দেখে সম্ভবত ঘাবড়ে গিয়ে ডাক্তার প্রস্তাব করলেন, 'আসুন, বরং কিছু একটা করা যাক।' হঠাৎ বিভৎস মুখভঙ্গি করে মার্তিয়ানভ পেতুনিকভের ঠিক মাথার ওপরে দিলো এক প্রকাণ্ড হাঁচি আর সঙ্গে সঙ্গে পেতুনিকভ ভয়ে আঁতকে উঠে লাফাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়লেন দারোগার গায়ে। 'দেখলেন, দেখলেন তো আপনারা,' কারা-রক্ষককে দেখিয়ে পেতুনিকভ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এরা সব কি ধরনের লোক?'

ঘর কাঁপিয়ে কুভালদা হা হা করে হেসে উঠলেন। ডাক্তার আর বিচারকটিও হাসি চাপতে পারলেন না। দেখতে দেখতে এলোমেলো রুক্ষ চুল, জীর্ণ বাস, ঘুম-জড়ানো লাল চোখ, অদ্ভুত সব মূর্তিতে দরজার সামনে ভিড় জমে উঠলো। আর তারা রুক্ষ কঠিন চোখে ডাক্তার, বিচারক ও দারোগার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

'হটো, হটো সব! দরজার সামনে পাহারারত সেপাইটি ওদের ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে সে কি করবে, তাছাড়া তার কথায় ওরা কর্ণপাতই করলো না। ভেতরে ঢুকে ওরা নিশ্চল পাথরের দেওয়ালের মতো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলো, গা থেকে ভুরভুর করে ভদকার গন্ধ বেরুচ্ছে।

কুভালদা প্রথমে ওদের মুখের দিকে, পরে সরকারী কর্মচারীদের মুখের দিকে তাকালেন। রিক্ত জীর্ণ পোশাক-পরা এই সব নোংরা মাতালগুলোর উপস্থিতে ওঁরাও কম বিস্মিত হননি। কুভালদা বাঁকা-ঠোঁটে হাসলেন। 'ভদ্রমহোদয়গন, আপনারা নিশ্চয়ই আমার এইসব সহবাসী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করতে চান? চান কি? যাইহোক, আপনারা চান বা না চান, খুব শিগগিরই এদের পরিচয় পাবেন।'

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করলেন, বিচারকটি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসলেন। অহেতুক এখানে অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই দেখে দারোগাসাহেব পিলে-চমকানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সিদোরভ, বাঁশি বাজাও। গাড়িটাকে এই দরজার সামনে নিয়ে আসতে বলো।'

'আমি তাহলে এখন যাই।' ঘরের অন্ধকার এক কোণ থেকে এবার পেতুনিকভ সামনে এগিয়ে এলেন, তারপর কুভালদার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আপনারা দয়া করে বরং এই ঘরটা আজই ছেড়ে দিন, আমি এটা ভেঙে ফেলতে চাই। দেখবেন যেন এর অন্যথা না হয়, নাহলে কিন্তু আমি পুলিসের সাহায্য নেবো।'

উঠোন থেকে ভেসে এলো বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ। দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়ানো বাসিন্দারা কেউ অলস ভঙ্গিতে হাই তুলতে, কেউ বা গা চুলকোতে লাগলো। আরিসতিদ ফোমিচ হেসে উঠলেন। 'তাহলে আপনারা এদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান না? এটা কিন্তু আপনাদের খুবই অন্যায়।'

পকেট থেকে টাকা পয়সা রাখার পেটমোটা বটুয়াটা বার করে তার মধ্যে থেকে হাতড়ে হাতড়ে পেতুনিকভ দুটো পাঁচ-কোপেক বার করলেন, তারপর সে-দুটো মৃতের পায়ের কাছে রেখে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। 'ঈশ্বর ওঁর মঙ্গল করুন...এই পাপীটার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্যে...'

'কি বল্লিরে শয়তান !' সেনাধ্যক্ষ বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন। পাপীটা ? অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে ? তোল, তুলে নে তোর পয়সা ! একজন সৎ মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে চুরির পয়সা দিস, তোর সাহস তো কম নয়। শিগগির তুলে নে বলছি, নইলে তোর ঠ্যাং আমি ছিঁড়ে ফেলবো।'

দারোগার একটা হাত জড়িয়ে ধরে পেত্তুনিকভ ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। 'হুজুর, আমাকে বাঁচান !' ডাক্তার এবং বিচারক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দারোগা সাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন, 'সিদোরভ, এখানে এসো !'

'একদিন যারা মানুষ ছিলো' দরজার সামনে অরণ্য-প্রাচীরের মতো স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তারা নীরবে শুনছে আর মনে মনে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। ঘুঁষি বাগিয়ে বন্যপশুর মতো রক্তচক্ষু পাকিয়ে কুভালদা আবার গর্জে উঠলেন, 'কিরে তুলবি না ? চোর বদমাস নরকের কীট কোথাকার। শিগগির তুলে নে বলছি, না হলে ওই তামার চাকতিদুটো তোর গলাতেই ঠেসে দেবো।'

কুভালদার ঘুঁষির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এক হাত তুলে অন্যে হাতে দানটা তুলে নিতে নিতে পেত্তুনিকভ বললেন, 'আপনিই আমার সাক্ষী, দারোগাসাহেব ·· আপনারা সব ভালো মানুষ···'

'ওরে ভালোমানুষের বাচ্ছা ! দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি !'

কথাটা বলেই কুভালদা দারোগার পেটের আড়াল থেকে পেত্তুনিকভকে টেনে বার করলেন, তারপর একটা বেড়াল ছানার মতো ওঁর ঘাড় ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দরজার দিকে। আর একদিন যারা মানুষ ছিলো তারা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বণিকটাকে পড়বার জায়গা করে দিলো। তাদের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে পেত্তুনিকভ অস্বাভিক আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুন ! খুন করে ফেললো ! বাঁচাও ! বাঁচাও !'

মার্তিয়ানভ বণিকের মাথা লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে পা তুললো, হাড়ের থলে মুখ বিকৃতি করে ওঁর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলো। পেত্তুনিকভ কিন্তু সবার হাসির উদ্রেক করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিজের শরীরটাকে তালগোল পাকিয়ে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে গেলেন। এই সময়ে দুজন সেপাই এসে হাজির হলো। দারোগা কুভালদাকে দেখিয়ে ওদের বললেন, 'একে গ্রেফতার করো।'

পেত্তুনিকভ উঠোন থেকেই অনুনয়ের সুরে বললেন, 'না না, তার আগে ওকে বেঁধে ফেলুন।'

এক ঝটকায় সেপাই দুজনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সেনাধ্যক্ষ চাপা স্বরে গর্জে উঠলেন, 'বাঁধতে হবে না ! ভয় নেই, পালাবো না।'

একটু পরেই দরজার সামনে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো ! জীর্ণ পোশাক পরা মূর্তিগুলো এবার একপাশে সরে দাঁড়াল, কয়েকজন মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেলো। দারোগা সেনাধ্যক্ষের দিকে কটমট করে তাকিয়ে হুমকি ছাড়লেন, 'একটু সবুর করো, তোমার মজা আমি দেখাচ্ছি।'

পেত্তুনিকভও তাঁর সঙ্গে সায় দিলেন, 'ডাকাতটা তাহলে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো ! অ্যাঁ !' স্পষ্টই বোঝা গেলো শত্রুকে বন্দী অবস্থায় দেখে উনি আর কিছুতেই নিজের আনন্দকে চেপে রাখতে পারছেন না। 'এবার ওটাকে আচ্ছাসে টিট করে দিন, দারোগাসাহেব।'

কুভালদা শান্ত স্থির ঋজু ভঙ্গিতে সেপাই দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষকের

মৃতদেহ তোলা দেখছেন। যে লোকটা সামনের দিক থেকে মৃতের বগলদুটো ধরছে, সে খুব দুর্বল, মাথাটা গাড়ির মধ্যে ঠিক কায়দা করে রাখতে পারছে না। তাছাড়া অন্য দিকে পাদুটো আগেই তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে কাঁধের কাছে মাথাটা হঠাৎ এমন ভাবে নিচে ঝুলে পড়লো যেন শান্তি-ভঙ্গকারী এইসব পাজী বদমাইসগুলো হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মাটির নিচে লুকতে চাইছে।

মৃতদেহটা কোনোরকমে তুলে দেওয়ার পর গাড়ি ছেড়ে দিলো। দারোগা সেপাইদের হুকুম দিলেন 'একে নিয়ে চলো!'

কুভালদা কোনো কথা বললেন না, কেবল ভ্রূ কুঁচকে একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। তারপর নিজেই গাড়িটার পাশে পাশে এগিয়ে চললেন। পাথরের মতো থমথমে মুখে মার্তিয়ানভ নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করলো। দেখতে দেখতে ভাড়াটে-শোবার-ঘরের উঠোনটা খালি হয়ে গেলো।

'হ্যাট-হ্যাট।' মুখে বিচিত্র শব্দ করে কোচোয়ান চাবুক ঘোরালো। উঠোনের কঠিন প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে চাকার ঘড়ঘড় শব্দ। নোংরা কাঁথায়-ঢাকা শিক্ষকের টান-টান প্রসারিত দেহটা মৃদু নড়ছে। ওঁর খোলা মুখটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এই ভাড়াটে-শোবার ঘরটা অবশেষে ছাড়তে পেরে খুশিতে মুচকি মুচকি হাসছেন।

পেতুনিক এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার ধীরে ধীরে বুকে ক্রশচিহ্ন আঁকলেন, তারপর সন্তর্পণে গা থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করলেন। ধুলোগুলোকে নিঃশব্দে ঝরে যেতে দেখে যেন ওঁর দু ঠোঁটে ফুটে উঠলো আত্মতৃপ্তির হাসি। তখনও উনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন পাহাড়ী পথের ঢাল বেয়ে নেমে চলা সেনাধ্যক্ষের দীর্ঘ ধূসর মূর্তিটাকে, মাথায় লাল ফিতে দেওয়া টুপিটাকে রোদ্দুরে মনে হচ্ছে ঠিক যেন রক্তের কয়েকটা ধারা। এবার ওঁর মুখটা বিজয়ীর অবাধ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো, উনি ফিরে চললেন ভাড়াটে শোবার ঘরের দিকে। হঠাৎ প্রবেশ পথের সামনে, ঠিক তাঁর মুখোমুখি, লাঠি হাতে পিঠে প্রকাণ্ড থলে নিয়ে এক বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি চমকে উঠলেন। বোঝার ভারে নুয়ে পড়া ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ঢাকা কঙ্কালসার ভয়ঙ্কর মূর্তিটাকে দেখে ওঁর মনে হলো এখুনি সে বুঝি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভয়ে আঁতকে উঠে পেতুনিকভ চিৎকার করে উঠলেন। 'কে? কে তুমি?'

কর্কশ খ্যানখ্যানে গলায় জবাব এলো, 'একজন মানুষ।'

'মানুষ!' লোকটার যাবার পথ ছেড়ে দিয়ে পেতুনিকভ একপাশে সরে দাঁড়ালেন। 'এ রকম মানুষ আবার আছে নাকি?'

ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে ও মৃদু গলায় বললো, 'মানুষ অনেক রকমের আছে ··ভগবান যাকে যেমন করেছেন···কেউ আমার চাইতেই খারাপ, কেউ আবার·· হ্যাঁ ঠিক তাই···'

নোংরা উঠোনের ওপর পা ফেলে ফেলে মাপজোখে ব্যস্ত ছুঁচলো পাকা দাড়ি, পরিপাটি পোশাক-পরা ছোটখাটো মানুষটার ওপর মেঘলা আকাশখানা একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। পুরনো বাড়ির ছাদের কার্নিশে বসে একটা কাক একা একাই গলা বাড়িয়ে কর্কশ স্বরে ডেকে চলেছে। আর নিষ্করুণ ধূসর আকাশে গুরুভার সজল মেঘগুলো পরস্পরে এমনভাবে এসে জমছে যেন ব্যথাতুর হতভাগ্য এই পৃথিবীর বুক থেকে যাকিছু জঞ্জাল নিঃশেষে ধারাস্নানে মুছে দেবে বলে পন করেছে।

১৮৯৭